পারের আলো

১

"মা, একবার আমার কাছে এসো তো, আমার কপালটায় হাতখানা একটু বুলিয়ে দাও। মাথার মধ্যে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, কি রকম করছে বুঝতে পারছিনে।"

পরিশ্রান্তা স্বপন সেইমাত্র পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া খোলা জানালাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত দিনটা জানকীনাথ বড় ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বড় ভয় পাইয়া গিয়াছিল, দুজন চিকিৎসক তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সারাদিনই প্রায় বসিয়াছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে তাঁহার ঘুমটা আসিয়াছে, রোগীর অবস্থা [illegible]াল দেখিয়া ডাক্তারেরা চলিয়া গিয়াছেন, ম্যানেজার হরেনবাবুও [illegible] হইতে এতক্ষণ এখানেই ছিলেন, এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। [illegible] অবস্থা একটু ভাল দেখাইলেও স্বপন পিতার পার্শ্ব ত্যাগ করে [illegible] নিদ্রিত পিতার মুখের পানে জলভরা চোখের দৃষ্টি রাখিয়া সে [illegible]ভাবে বিছানার পার্শ্বে বসিয়াছিল। নার্স তাহাকে এইমাত্র [illegible]র করিয়া উঠাইয়া দিয়াছে, খানিকটা বাহিরে ঘুরিয়া আসা যে

তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহার সে উপদেশ স্বপন পালন করিতে পারে নাই, সে পিতার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে নাই।

জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সে সান্ধ্য আকাশখানার পানে চাহিয়াছিল। আকাশে তখন অপূর্ব্ব দৃশ্য, পশ্চিমে একখানা মেঘ অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের লাল আলোয় রঞ্জিত হইয়া জ্বলিতেছিল, সেই লাল আভা ঠিকরাইয়া আসিয়া সব বাড়ীগুলির গায়ে লাল ছোপ ধরাইয়া দিয়াছে। নীচে পথে তখন ট্রাম মোটর ঘোড়াগাড়ী প্রভৃতির ঠেলাঠেলি, আকাশের এই অপূর্ব্ব শোভার পানে কাহারও দৃষ্টি পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ।

স্বপন আকাশের পানে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে কেবল চাহিয়াই থাকা মাত্র, এই অনন্ত অতুল সৌন্দর্য্য অনুভব করার মত শক্তি তখন তাহার আদৌ ছিল না। প্রাণে তখন কেবল হারাই হারাই জাগিতেছে, সৌন্দর্য্য দেখার শক্তি তাহার কোথায়?

সংসারে একমাত্র আশ্রয় তাহার এই পিতা, মা কবে মারা গিয়াছেন তাহা সে আজ ঠিক মনে করিতে পারে না। পিতার বুকের মধ্যে সে সযত্নে লালিতা পালিতা হইয়াছে, এতখানি বয়স হইয়াছে এখনও সে পিতা বই কাহারেও জানে না। ভয় পাইয়া এখনও সে পিতার কোলে ছুটিয়া আসে, বেদনা পাইলে এখনও সে পিতার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকায়। আপনার বলিতে, নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে যে পিতা ছাড়া তাহার কেহ নাই, সেই পিতা আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, বুকটা তাহার নিশ্চিত হারানোর ভয়ে কতদূর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। ডাক্তারেরা মৌখিক তাহাকে অভয় দিন, ম্যানেজার বাবু যাহাই বলুন, সে বেশই বুঝিতেছিল, তাহার পিতার এই শেষ-শয্যা,

তিনি আর উঠিবেন না, আর ভাল হইয়া তাহার মুখখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে সজল-চোখে তাহার পানে চাহিবেন না।

পিতা গেলে তাহার পর—এই কথাটা ভাবিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসীম সম্পত্তি পিতার, সে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে—কি জানে সে, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কতটাই বা তাহার লাভ হইয়াছে, তাহার যে এ জগতে আপনার বলিতে আর কেহই নাই। এই কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছে তাহার, সংসার যে কাহাকে বলে তাহা তাহাকে এখনও চিনাইয়া দেওয়া হয় নাই, লেখাপড়া করিতেই তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে। এইবার সে বি-এ পরীক্ষা দিয়াছে, ফল বাহির হইতে এখনও একমাস দেরী আছে।

পিতা এতকাল তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত কোন কার্য্যই শুনিতে দেন নাই, পাছে তাহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত পড়ে তাই। তাঁহার মনে একান্ত ইচ্ছা ছিল আগে সে বি-এ পাস করিয়া বাহির হোক্, তারপর তাহাকে জমিদারীর কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিবেন, সংসারকে চিনাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না, পরীক্ষার ফল শুনিয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ডাক আসিয়াছে। এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসর স্বপন হাসিয়া খেলিয়াই বেড়াইয়াছে, আজ পিতার আসন্ন মৃত্যু-সম্ভাবনায় সে তাই বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

"মা স্বপন—"

এই আহ্বানটী তাহার কানে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পিতার কাছে আসিল, মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডাক্‌চো বাবা ? এই যে আমি, কি বল্‌বে বল।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "আমার মাথায় বুকে একটু হাত বুলিয়ে দে মা, মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে, বুক তার চেয়ে বেশী যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে যে স্বপন আমার!"

কন্যার স্নেহময় করস্পর্শে পিতার বুকের অসহনীয় যন্ত্রণা যেন জুড়াইয়া আসিল। হায়রে, তাঁহার সোণার স্বপনকে সংসারে একা ভাসাইয়া রাখিয়া তিনি মহাপ্রয়াণ করিতেছেন কোথায়—কোন্ দেশে? জগতে স্বপনের যে আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না; সে যে সংসারের কিছুই জানে না, কি রকম ভাবে লোকের সহিত মিশিতে হয়, কথা কহিতে হয়, সে যে কিছুই শিক্ষা করে নাই। সংসারে অনভিজ্ঞা যে, তাহার মাথায় গুরুতর দায়িত্বভার চাপাইয়া আজ তিনি চলিতেছেন কোথায়?

জানকীনাথের দুইচোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, স্বপনের চোখে তাহা এড়াইল না; পিতা কম্পিত দুর্ব্বল হস্তে অশ্রু মুছিবার অনেক আগেই সে তাহা দেখিয়া ফেলিল।

"বাবা, তুমি কাঁদছো? কেন, তুমি অমন করছো বাবা!"

বলিতে বলিতে সে নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখনই শান্ত হইয়া গেল, অতিকষ্টে কান্নাটাকে আবার বুকের মধ্যেই ফেরৎ পাঠাইল।

সস্নেহে পিতার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সে বলিল, "ছিঃ বাবা, তুমি কাঁদছো কেন? কখনও তো তুমি এ রকম অধীর হওনি? এতবার এত ব্যারাম হয়েছে, তুমি নিজেই জোরের সঙ্গে সব কষ্ট উপেক্ষা করেগেছ। ডাক্তারেরা বলছেন, তুমি ভাল হয়ে উঠবে, ডাক্তার কাকা জোর করে বলেছেন, কোন ভয় নেই। ডাক্তার কাকা

তো কক্ষনো মিথ্যে কথা বলেন না বাবা, তিনি যে বড় সত্যবাদী, তুমি তাঁকে বিশ্বাস কর যে।”

“পাগলী মা আমার,” চোখে জল, পিতার মুখে মলিন হাসি ফুটিয়া উঠিল—“ওরে—ডাক্তারেরা বল্‌লেই কি হলো, আমি কি নিজের অবস্থা কিছু বুঝতে পারিনে? আমার চোখের সামনে আলোময় বিশ্ব-আগার ’পরে ঘন-অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা জেগে উঠছে, ওই রকম ধড়ফড় কর্‌তে কর্‌তেই কোন্ সময়ে প্রাণটা এ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তা কে জানে! পাগলী মা আমার, গড়্‌তে অনেক দেরী হয়, ভাঙ্‌তে একমুহূর্ত্ত দেরী হয় না। এই দেহটা গড়ে তুলতে অনেক দেরী হয়েছে, অনেক দিন অনেক মাস অনেক বছরে এর এতটুকু দৈন্যতা পূর্ণ করতে পেরেছি, কিন্তু যাবে যখন শূন্য হয়েই যাবে, এই পূর্ণতার মূল্য এতটুকু থাক্‌বে না, তখন তাড়াতাড়ি একে বিদায় করতে পারলেই মানুষ বাঁচবে। এখন এই সময়টাতে তোর চোখে আমি ধূলো দেবার চেষ্টা করব না, আজন্ম তোর চোখের সামনে গোপন হয়ে আছি, যাবার সময় গোপন কর্‌ব না। আমি জানি তুই আমার ’পরে নির্ভর করে বেঁচে আছিস্, কিন্তু ওরে—আর তো নির্ভর করা চলবে না, তোর ভালবাসা, তোর দাবী সব ভুলে এখন আমার মরণের ডাকে সাড়া দিতেই হবে যে, এই জগতের চিরন্তনী প্রথা।”

কন্যার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া স্নেহময় পিতার বুকের উপর পড়িতে লাগিল। পিতা তাহার মুখখানা বুকের ’পরে চাপিয়া ধরিলেন। বুকটা বড় ধড়ফড় করিয়া উঠিল, চোখের কোণে একটা অসহনীয় যাতনার রেখা ফুটিয়া উঠিল, অসহ্য যন্ত্রণায় মুখখানা

বিকৃত হইয়া উঠিতেই নার্স তাড়াতাড়ি চামচ করিয়া ঔষধ মুখে ঢালিয়া দিল।

দশ পনের মিনিট পরে জানকীনাথ সে ধাক্কাটা সামলাইয়া লইলেন, একটু দম লইয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "স্বপন, সোণার স্বপন আমার—"

বুকের মধ্যে দারুণ আগুন জ্বলিতেছিল, চোখের জলও তাহার তাপে শুকাইয়া উঠিয়াছিল, স্বপন ব্যথাভরা স্বরে উত্তর দিল, "কেন বাবা, এই যে আমি তোমার পাশে রয়েছি।"

"মা, তোর মাথায় আমি সব চাপিয়ে চল্লুম, শুধু জমিদারী নয় মা, আরও আছে, জানিনে এত গুরুভার তুই সইতে পার্বি কিনা। ভেঙ্গে পড়িস্ নে মা, যত শক্ত আঘাতই হোক না, তোকে সয়ে যেতেই হবে। শিক্ষিতা করে গড়ে তুলেছি তোকে, সে শুধু এই সব আঘাত সইবার জন্যেই মা। পৃথিবী তোর কাছে সুন্দর বলে ঠেক্‌বে না। কিন্তু সেই কদর্য্য পৃথিবীকেই তোর সুন্দর করে নিতে হবে। যদি বড় ব্যথা পেয়ে হৃদয় ভেঙ্গে পড়তে চায়, তখন মনে কর্‌বি তুই শুধু তোরই, আমার ন'স, তোর মায়ের ন'স, তুই পৃথিবীর কারও ন'স। আমার এই জমিদারী রক্ষণ করবি তু-ই, তোকে তেমনি বল আনতে হবে বুকে, তেমনি অশঙ্কিত পায়ে দাঁড়াতে হবে। মা, দেশ ছেড়ে চিরকাল এখানেই আছিস্ তোর ডাক্তার কাকার কাছে, আমিই সেখানকার সব ভার মাথায় নিয়ে সেখানে পড়ে থাক্‌তুম, পাছে তোর পড়ার ক্ষতি হয় বলে ছুটির সময়ও কখনও তোকে সেখানে নিয়ে যাইনি। কিন্তু আর তো এখানে থাকলে তোর চলবে না মা, একুশ বছরের আগে সব না দেখে শুনে নিলে এ দায়িত্ব তুই মাথায় নিবি কেমন করে? তুই এখন

রাণী, হাজার হাজার লোকের শুভাশুভ তোর 'পরে নির্ভর করছে, তাদের জন্যেই তোকে সেখানে গিয়ে থাকতেই হবে মা। পরের 'পরে প্রজাদের ভার ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বসে থাকিস্‌নে, তা'দের সঙ্গে মিলে তাদেরই একজন হয়ে তা'দের মুখে হাসি ফুটিয়ে দে, তা'দের চোখের জল তোর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নে, তবে তুই তা'দের রাণী, তবে তুই তা'দের মা। আর কেউ কি তেমন করে দেখ্‌বে মা—যেমন করে তুই তাদের দেখ্‌বি? এতদিন আমি তাদের দেখেছি, তাদের অভাব প্রাণপণে দূর করবার চেষ্টা করেছি, এখন তোর মাথায় সে দায়িত্ব-ভার চাপিয়ে দিয়ে আমি ছুটি নিচ্ছি। মনে রাখিস্‌ মা আমার, জমিদারীর বল প্রজা, প্রজাদের না দেখ্‌লে জমিদারী থাক্‌বে না।"

একটু দম লইয়া তিনি বলিলেন, "প্রভাত বিলাতে গেছে, আমিই তাকে খরচ দিয়ে পাঠিয়েছি, কথা আছে সে এসে তোকে বিয়ে কর্‌বে। সে বড় উদার স্বভাবের, মনটা তার খুবই উন্নত, সেইজন্যে আমি তাকে পছন্দ করেছিলুম। এখন ভাব্‌ছি যদি তোর মতের সঙ্গে তার মতের মিল না হয়, তা'হলে এ বিয়ে দুজনকেই সমান দুঃখ দেবে। দেখ্‌ মা, যদি সে ফিরে এলেও তার আগেকার ভাবটা দেখতে পাস্‌, যদি সে আমার মতানুযায়ী চলে, আমারই কথামত তোকে বিয়ে করতে চায়, তা'হলে তারে বিয়ে করিস্‌, নচেৎ—নচেৎ মা, তুই চিরকুমারী থাকিস্‌, সে বিবাহিত হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি বড় আশা ক'রেছিলুম আরও কিছুদিন বাঁচব, সে ফিরে এলে তাকে বেশ করে পরীক্ষা করব, যদি ঠিকমত চলে তবে বিয়েটা দিয়ে যাব, নচেৎ—কিন্তু মা, বড় শীগ্‌গিরই ডাক এসেছে, আর দুটো বছর অপেক্ষা করতে পারলুম না মা।"

"বাবা"—স্বপনের আর্ত্তকণ্ঠ চিরিয়া একটী শব্দ বাহির হইয়া পড়িল।

"না, আগে আমার কথাগুলো শেষ করে নিতে দে মা, তারপর যা তোর ইচ্ছে তাই তুই বলিস্, আমি তখন নির্ব্বাকে শুনে যাব। মা, বড় ভাবনা আমার— তুই যে লোক চিনিস্ নে। আমি এই যাওয়ার বেলায় ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করে যাচ্ছি—যেন কাউকে বিশ্বাস করে আপনার ভার পর্য্যন্ত তার হাতে না ফেলে দিস্। আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তোর বিয়ে হয়, কেবল হরেনবাবুর জন্যেই সত্যবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি জানি তুই দেবতার উদ্দেশে ফুটেছিস্, দেবতার পায়েই পড়বি, যে লোভী তাকে কখনই ডালা সাজিয়ে দিবিনে। এ সংসার স্তাবকে ভরা, তোর জন্যে নয়—তোর বিপুল অর্থের জন্যেই অনেকে তোর স্তুতিগান গাইবে, কিন্তু তাতে যেন ভুলে যাস্‌নে মা। এ সংসার স্বার্থে ভরা, কেউ চাইবে না তোর ভাল হোক্ ; মনে রাখিস্ তোকে নষ্ট করতে অনেকেই আছে, ভাল করতে কেউ নেই। এই যে দেখছিস্ যারা আমার জন্যে আজ এই মুহূর্ত্তে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, এ সব মৌখিক মা, কেউ মাথার একগাছি চুল খসাতে সমর্থও হবে না। অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছি দেখে শুনে, একমাত্র গুরুদেব ছাড়া কারও কথা কানে নেইনি—তোর শিক্ষাও তাঁরই কথায় হয়েছে। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কাউকেই বিশ্বাস করিস্‌নে মা, বড় স্বার্থপর সংসার—বড় স্বার্থপর সংসারের লোক সব।"

তিনি চোখ বুজিয়া খানিকটা হাঁফাইয়া লইলেন, স্বপন নিঃশব্দে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া জানকীনাথ বলিলেন, "মা, আমি জানি তুই এমনি ফুলের মতই পবিত্র থাক্‌বি, আমার মেয়েকে—আমার গুরুদেবের মানসীকে কেউ অপবিত্র কর্‌তে পার্‌বে না। এতটুকু

নিজেকে শিথিল করিস্‌নে স্বপন, সংযমের 'পরে রেখে তোকে গড়ে তুলেছি, সে সংযম যেন এতটুকু শিথিল না হয়। তুই হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত, দেখিস্ যেন জাতি ধর্ম্ম তোর না যায়। এই ধর্ম্মকেই আঁক্‌ড়ে পড়ে থাক্‌বি স্বপন, যে ধর্ম্মে তোর বাপ জীবন কাটিয়ে গেল। মা আমার, সেই যে আমার বিষম ভাবনা, একে তরুণ-বয়স্কা তুই, হাতে অগাধ সম্পত্তি তোর, যদিও শিক্ষিতা তুই তবু—" রুদ্ধশ্বাসে স্বপন বলিয়া উঠিল, "বাবা, স্বপন তোমারই মেয়ে। তুমি স্বর্গ হতে আশীর্ব্বাদ কোরো, তোমার স্বপন অটুট থাক্‌বে, তোমার আশীর্ব্বাদে তার সোজা চলার পথে বিঘ্ন সব দূরে যাবে।"

"সে তো কর্‌বই মা—"

পিতার মুখে মলিন হাসি ফুটিল, "আমি কি মরেও শান্তি পাব পাগলী, অদৃশ্য থেকে নিয়ত তোকে দেখব। যদি প্রভাতকে গুরুদেব পছন্দ করেন, তবে তোর বিয়ে হবে নচেৎ কুমারী হয়েই থাকতে হবে তোকে, পারবি মা?"

"পারব বাবা, তোমার আশীর্ব্বাদে, জ্যেঠামশাইয়ের আশীর্ব্বাদে আমি সব পারব। তোমরা দুইজনই যে আমার কাছে দেবতা বাবা; আমি দেবতা কখনও দেখিনি, অদৃশ্য দেবতাকে কখনও ধারণা করতে পারিনি, তোমাদের তো ধারণা করেছি বাবা, প্রার্থনা করেছি তোমাদেরই কাছে। তোমাদের দুজনের আশীর্ব্বাদ আমায় সকল বিপদ হতে উদ্ধার করবে।"

পিতা সজল চোখ দুটি তুলিয়া কন্যার উপর রাখিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভাবনা কি মা, ভয় কি? আমি যাচ্ছি, আর একজন—যাকে ভক্তি কর, ভালবাসো, তোমার জ্যেঠামশায়—আমার গুরুদেব

রয়েছেন, তাঁকে খবর দিয়ো, তিনি তোমায় সকল বিপদ হতে রক্ষা করবেন।”

সেই রাত্রি শেষে প্রভাতের অরুণ আলো যখন অল্পে অল্পে ধরা-বক্ষকে উজল করিয়া দিতে নামিয়া আসিতেছিল, সেই সময় জানকীনাথ তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বপন মূৰ্চ্ছিত হইয়া পিতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

২

এই ভীষণ দুর্ঘটনার পরে নিজেকে সামলাইতে স্বপনের অনেকটা সময় লাগিয়া গেল।

ইহার পরই সে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল, মুখের উপর তাহার শান্ত গাম্ভীর্য্যের ভাব জাগিয়া উঠিল, তাহার সেই কারণে অকারণে বৃথা কলহাসি মুখ হইতে বিদায় লইল।

একটা দিন সে মোটেই কথা বলে নাই, কাহারও সহিত দেখাও করে নাই, মুহ্যমানা ভাবে নিজের গৃহতলে পড়িয়াছিল। পরদিন সংবাদটা রাষ্ট্র হইবামাত্র তাহার সহপাঠিনী মেয়েরা, কলেজের শিক্ষয়িত্রীরা আসিলেন, তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, সে কথা কহিতে পারে নাই, মুহ্যমানার মত কেবল চাহিয়াই রহিল।

সে আজ জগতে একা—নিতান্তই একা। যে তাহার যথার্থ ব্যথার ব্যথী ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে। তেমন আত্মীয় আর কেহ নাই যে হৃদয় দিয়া তাহার হৃদয় অনুভব করিবে। এই যে চারিদিকে শোকের স্রোত এ সবই প্রহসন মাত্র, আন্তরিকতা কাহারও নাই। ম্যানেজার

হরেন বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সেই যে হঠাৎ কণ্ঠরুদ্ধ ভাবে চোখে চাদরখানা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, সেও একটা মস্ত বড় অভিনয়। জগতের রঙ্গমঞ্চে এইরূপ কত অভিনয় অহরহঃ চলিতেছে কে তাহার সংবাদ রাখে। চোখে ধূলা দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে এখানে সকলেই চায় যে।

তাহার মনে, পিতার শেষ কথাই জাগিতেছিল—জগতে সকলেই অবিশ্বাসী, ঠকাইতে চায় সকলেই, বুঝিয়া চলিতে না জানিলে সম্পত্তি তো যাইবেই, তাহা ছাড়া নিজেকেও হারাইবে। স্বপন তাই আজ দিব্যচক্ষু পাইয়াছিল, সকলের দিকেই সে আজ তাকাইয়া দেখিতেছিল; মনে সন্দেহ ছিল, এ সবই ছদ্মবেশী, কোন সময়ে বাহিরের মুখোস খসিয়া পড়িলেই অন্তরের আসল ভাবটা বাহির হইয়া পড়িবে। চির-চপলা চির-চঞ্চলা স্বপনরাণী পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে দেখিতেছিল কোথায় ছিল সে, কোথায় আজ আসিয়া পড়িয়াছে, খেলা-ধূলা চপলতার রাজ্য ছাড়িয়া সে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সংসারের ছলনা-প্রবঞ্চনার মধ্যে। এই অসীম মিথ্যার মাঝে কোথায় সেই সত্যটুকু জাগিয়া আছে; সে এই ধূলার মাঝে স্বর্ণ-রেণুটুকু চিনিয়া সংগ্রহ করিবে কিরূপে?

"বাবা গো—"

হঠাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াই সে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। না, পিতা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছেন, আত্মহারা হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন; সে তো অশিক্ষিতা নারী নয় যে আত্মহারা হইয়া পড়িবে। পিতার আশীর্ব্বাদ তাহার অভেদ্য বর্ম্ম, এই বর্ম্মে ঠেকিয়া স্বার্থপরের স্বার্থপরতা ধূলি হইয়া ধূলিতে মিশাইয়া যাইবে, সেই ধূলার মাঝে সত্য

স্বর্ণরেণু খুঁজিতে সে বিরত হইবে না, যতদিন বাঁচিবে খুঁজিয়া একটী দুটি করিয়া স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করিতে পারিবে না কি ?

হৃদয়কে শক্ত করিয়া সে উঠিয়া বসিল, এলোমেলো চুলগুলা দুই হাতে জড়াইয়া মাথার কাছে জানালাটা খুলিয়া দিতেই প্রভাতের নবোদিত সূর্য্যের লাল আলো ঠিক্‌রাইয়া কক্ষতলে পড়িয়া কক্ষটীকে দীপ্ত করিয়া তুলিল।

হায়রে, কাল এমন সময়ে ওই উঠানের মাঝখানটীতে চিরবিশ্বাসী আস্থাবান্ পিতা ওই তুলসীমঞ্চের তলে মাথা দিয়া শুইয়াছিলেন, কাল এমনই সময়ে সে পিতাকে সাজাইয়া দিতেছিল তাঁহার যাত্রার উপযুক্ত সাজে।

চোখে আবার জল আসিতেছিল, স্বপন অতি কষ্টে সে জল সামলাইয়া লইল। দাসী দরজার পার্শ্বে তাহার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার দিকে চাহিতেই সে সসম্ভ্রমে আগাইয়া আসিল ; স্বপন তাহাকে আদেশ দিল, "হরেন বাবুকে ডেকে নিয়ে এসো, বল গিয়ে এখনি যেন আসেন।"

দাসী চলিয়া গেল, স্বপন শ্রান্তভাবে চোখ ফিরাইয়া জানালাপথে বাহিরের পানে চাহিল। কাল সমস্ত দিনটা তাহার অনাহারে কাটিয়া গিয়াছে, সে জলও খাইতে চায় নাই, কিন্তু কলেজের মাননীয়া বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ রায় জোর করিয়া তাহার হাতে ধরিয়া শুধু তাহাকে একটু জল খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাল দুপুরে সেই সে এক নিঃশ্বাসে এক গ্লাস জল খাইয়াছিল—আর না।

আজ অসহ্য তৃষ্ণায় তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতেছিল। গতকল্যকার মন-কষ্টে—শারীরিক কষ্টে তাহার প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখখানি বিবর্ণ

হইয়া উঠিয়াছিল। বালিশটার উপর কনুয়ের ভর দিয়া দুই করতলে মুখ রাখিয়া সে উদাসভাবে কোন্ দিকে চাহিয়া রহিল কে জানে।

দরজার পর্দ্দা একটু কাঁপিয়া উঠিল, বাহির হইতে ম্যানেজার বাবুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"আমায় ডাক্‌ছো মা ?"

তাঁহার কথা কানে আসিবামাত্র স্বপন যেন সজাগ হইয়া উঠিল, তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে ভাল হইয়া উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আসুন কাকাবাবু।"

সবুজ পর্দ্দা সরাইয়া হরেন বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া স্বপন বলিল, "ওইখানা টেনে নিয়ে বসুন কাকা, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

হরেনবাবু চেয়ারখানা সরাইয়া আনিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কথা যত জরুরীই থাক্ এর পরে বল্‌লে কি হতো না মা ? তুমি আগে স্নান করে জল খেয়ে নাও, আমি এখানে ততক্ষণ তোমার অপেক্ষায় বসে থাক্‌ছি। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও, তার পরে যা তোমার কথা থাকে বলো। কাল সমস্ত দিনটা কিছু খেলে না, তোমার কাকিমা, তোমার কলেজের শিক্ষয়িত্রীরা, আমি তোমায় এত বল্‌লুম তবু তুমি কিছুতেই খেলে না। এ রকম অবাধ্যতা তোমার—"

মৃদুকণ্ঠে স্বপন বলিল, "কাল কিছু খেতে ছিল না কাকা, বাপ মা মারা গেলে সে দিন কিছু খেতে নেই।"

হরেন বাবু দৃপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে নিয়ম সাধারণ হিন্দু-সমাজভুক্ত লোকে পালন করবে ব'লে তোমাকেও যে তাই মেনে চলতে হবে, পালন করতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। ওই সব কুসংস্কারই যদি মেনে চলবে, তবে এতখানি লেখাপড়া শিখেছ কেন ? লেখাপড়া

শিখানোর উদ্দেশ্যই এই যে ভালমন্দ বিচার করতে পারবে, মন্দটাকে ফেলে ভালটাকে নেবে; যদি এ দুটো বিচার কর্‌বার শক্তিই না রইলো তবে লেখাপড়া শেখার অর্থ কি ?”

বেদনাপূর্ণ দুইটী চোখের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া, তেমনই বেদনাভরা সুরে স্বপন বলিল, “আমার বাবা তো সাধারণ হিন্দুসমাজ ছাড়া ছিলেন না কাকা, তিনি যে গোঁড়া হিন্দুই ছিলেন। আমার এতখানি বিদ্যাশিক্ষার মূলেও কি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উদারতা ছিল না ? হিন্দুর মেয়ে আমি, চিরাগত যে সংস্কার হিন্দুর, তা আমি ত্যাগ কর্‌তে কোন দিন পারিনি, কোনও দিন পারব না, কেন না আমি হিন্দুসমাজ ছাড়া নই। আমার এই শিক্ষার মূলে আমার বাবার কতখানি লক্ষ্য ছিল, হিন্দুর কি সত্যাদর্শ তাঁর চোখের সামনে জল্‌জল্‌ করে ফুটে উঠেছিল, তা তো আপনিও জানেন কাকা, চিরকাল তাঁর মনের কথা তিনি আপনার কাছে প্রকাশ করেই তো গেছেন।”

লজ্জিত হইয়া হরেনবাবু বলিলেন, “আমার মতে তাঁর সবটাই বাড়াবাড়ি ছিল। এ কথা যে আজ তোমারই সামনে তিনি নেই বলেই বল্‌ছি তা নয়, কতদিন তাঁর সামনেও বলেছি, তাঁকে ফিরাবার অনেক চেষ্টাও করেছি, কিন্তু কথাই আছে, বাঁশ কাঁচা থাক্‌লে তাকে নোয়ানো যায়, পাক্‌লে কিছুতেই এতটুকু নোয়াতে পারা যায় না। তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যে মিল করে তোমায় শিক্ষিতা করতে গেছলেন, কিন্তু এ কি কখনই সম্ভব হতে পারে ? উত্তর দক্ষিণের, পূর্ব্ব পশ্চিমের দূরত্ব আবহমানকাল যতটা আছে, ঠিক ততটাই থাক্‌বে, পূর্ব্ব কখনও পশ্চিমের পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না। তোমায় তিনি শিক্ষা দিয়েছেন এক, আদর্শ দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ আলাদা, খেয়ালী লোক ছিলেন

তিনি, খেয়ালের জন্যে ঠিক করতে পারেননি তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ফল কি রকম দাঁড়াবে, এ শিক্ষা সার্থক হতে পারবে কি না। সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো স্রোত আস্‌ছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি দুই হাতে দুটোকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে, সে শক্তি তোমার আছে কিনা তা আমি জানিনে। যাক, সে বিষয় নিয়ে আজ আমি কোন কথা বল্‌তে চাইনে, তবে ভবিষ্যতে একদিন তোমায় এই বিষয়টা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা আমি করব, আর তা করাও আমার উচিত। এখনকার উপযুক্ত যা তাই কর, তুমি ওঠো, স্নানটা করে এসো, একটু চা খাও, শরীরের অবসাদ তাতে অনেকটা ঘুচে যাবে।"

মলিন হাসিয়া স্বপন বলিল, "আপনার কথা কোন দিন অবহেলা করিনি কালকের দিন ছাড়া, আজও করব না, আমি উঠছি, কিন্তু সত্যি কাকা, আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা একটুও নেই।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেন বাবু বলিলেন, "তা কি আর থাকে মা? কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিতে হয়—এ তো তোমার নতুন নয়, জগতে এ রকম ঘট্‌চেই, পুরানো কিছু থাকে না, সে ঝরে পড়বার আগেই তার গোড়ায় নতুনের জন্ম হয়, পুরানো ঝরে পড়ে, নতুন বেড়ে ওঠে। এটা বিশেষ করে দেখতে পাবে গাছের পানে তাকিয়ে, তারই সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণের সম্পর্ক ধরে নাও মা। এক যায়, আর আসে—এমনই ধারা নিত্যই চলছে। ওঠো মা, এ রকমভাবে আর বসে থেকো না, বেলা কতখানি হয়েছে ঘড়ির পানে চেয়ে দেখ।"

দাসীকে ডাকিয়া তিনি স্বপনকে স্নান করাইয়া দিবার আদেশ দিলেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বপন চলিয়া গেল।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে সে আবার কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন

তাহার স্নান সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, চুলগুলা অসংযতভাবে পৃষ্ঠের উপর লুটাইতেছে। তীব্রকণ্ঠে হরেন বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ঝিগুলো সব গেল কোথায়, চুলটা তারা আঁচড়িয়ে দিতেও পারে না নাকি?"

তাঁহার তীব্র কণ্ঠস্বর দাসীমহলে একটা বিপ্লব আনিয়া দিল, দ্বারের বাহিরে আসিয়া তাহারা সকলে জমা হইল, একজন মাত্র সাহস করিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইল।

স্বপন বলিল, "না কাকা, এ কয়দিন আমার মাথা আঁচড়াতে নেই।"

"না নেই—" হরেন বাবু উষ্ণভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের কোন্ দেশী শাস্ত্র তাই জিজ্ঞাসা করি? রুক্ষ স্নান করেছ দেখছি, তেলও মাখোনি। তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে তেল মাখতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই?"

স্বপন একটু হাসিল, ধীরস্বরে বলিল, "আরও অনেক আছে কাকা, যে শ্রাদ্ধাধিকারী তাকে এই সব নিয়ম যথাযথ পালন করে যেতে হবেই —এই হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম। বাবার মুখে শুনেছি, তাঁর বাপ মারা গেলে তিনি এই সব নিয়ম ঠিক মতই পালন করে গেছেন, শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত হবিষ্য করেছেন। বলতে পারিনে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত আমি —কতদূর নিয়ম প্রতিপালন করতে পারব, তবে যতটুকু পারি ততটুকুই বা করব না কেন কাকা? আমার হাতের অন্নজল যে বাবা নেবেন, আমায় তেমনি ভাবেই চলতে হবে যে কাকা।"

আদর্শ খৃষ্টান হরেন বাবু এই গোঁড়া হিন্দুয়ানীপূর্ণ কথা শুনিয়া মনে মনে বিলক্ষণ জ্বলিতেছিলেন, গম্ভীর মুখে বলিলেন, "শাস্ত্র বটে, এটা শুধু তোমাদের মত হিন্দুর জন্যেই যে সৃষ্টি হয়েছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। পুরুষ হলে সত্য জ্ঞানটাই পেতে, কিন্তু মেয়ে বলে যে ভিত্তির পরে গড়ে,

উঠেছ কিছুতেই তা আর বদ্‌লাতে পারছ না, যথার্থ সত্যটাকে চিনেও চিন্‌তে পারছ না। শাস্ত্র কি জানো—সব মিথ্যে, যে বিশ্বাস করে সে মূর্খ বই আর কিছু নয়। তুমি এগুলো পড়ে দেখেছ না কেবল শুনেই মন প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করে আস্‌ছ?"

স্বপন বলিল, "পড়েছি কাকা, কিন্তু সে ভারি কম, সেটুকু পড়ে কেউ নিজেকে জ্ঞানী বলে পরিচয় দিতে পারে না। ধরে নিন আমার সবই শোনা কথা, কিন্তু—"

"কিন্তু ভাল করে যদি পড়্‌তে, তবে জানতে পারতে এ সবই মিথ্যে। এটা করতে নেই, ওটা করতে আছে, এই সব আইন কানুন—এগুলো মেনে চলবে অশিক্ষিত মূর্খ লোকে। যাক্, চা খাবে কি, না চা খেতেও নিষেধ আছে?"

লজ্জিতা স্বপন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বেশী বাড়াবাড়ি কিছু ভাল নয় তা জানো স্বপন! তোমার বাপের যে আত্মার তৃপ্তির জন্যে তুমি এতটা ত্যাগ করছো, এ রকমভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো, এতে তোমার বাপের সেই আত্মা কি তৃপ্তিলাভ করবেন বলে মনে কর?"

স্বপন কুণ্ঠিতভাবে কি বলিতে গেল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া হরেন বাবু বলিলেন,—"থাক্, তোমাকে যতটা ছেড়ে দেব তুমি ততটা নিজেকে নষ্ট করবে তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি থাক্‌তে আমার সামনে অতটা বাড়াবাড়ি তুমি করতে পারবে না, তা আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। ঝি, দু কাপ চা নিয়ে এসো।"

দাসী আদেশমাত্র চলিয়া গেল। হরেন বাবু স্বপনের পানে চাহিয়া আবার বলিলেন, "আমার দোষ নিয়ো না মা, তোমাদের হিন্দুয়ানীর এই

ভণ্ডামীগুলো আমি আদতেই সহ্য করতে পারিনে, সেই জন্যেই হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে আমি খৃষ্টান ধর্ম্ম নিয়েছি ; কেন না আমি সত্যকে চিনেছি, হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে গলদ কত তা আমি দেখেছি। মরা গরু ঘাস খায় না এ কথা সবাই জানে, তবু জেনে শুনে যদি কেউ সেই মরা গরুটাকে ঘাস খাওয়াবার জন্যে একগোছা ঘাস নিয়ে সারা দিনটা চেষ্টা করে, লোকে তাকে কি বলবে জিজ্ঞাসা করি ? তুমি বি-এ পাশ করে' সব জেনে শুনেও ওই কুসংস্কারগুলো আঁক্‌ড়ে ধরে' পড়ে' আছ, এতে লোকে তোমায় কি বল্‌বে বল দেখি ?"

স্বপন মুখ ফিরাইয়া চাপা সুরে বলিল, "না হয় পাগলই বল্‌বে কাকা, এ ছাড়া আর কিছুই বল্‌বে না।"

দাসী দুই কাপ চা আনিয়া টেবলের উপর রাখিল। হরেনবাবু নিজেরটা টানিয়া লইয়া কাপে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "সে কথা ঠিকই। যাক্‌ অনেক বাজে কথা এসে পড়েছে, কি কথা বল্‌বার জন্যে ডাক্‌ছিলে আমায় তাই বল।"

স্বপন বলিল, "দেশে যাওয়ার কথা বল্‌তে ডেকেছি। কবে যাওয়া হবে ঠিক করেছেন ?"

হাতের কাপ টেবলে নামাইয়া রাখিয়া হরেনবাবু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন "তুমি কি এখনই যেতে চাও নাকি ?"

স্বপন বলিল "এখানে আর কি কাজ আছে কাকা, এ বাড়ীতে থাকতে আর আমার মোটে ইচ্ছা করছে না। আরও একটা কথা, বাবা নেই, এ কথাটা সেখানে রাষ্ট্র হয়ে গেলে যদি কোনও গোলমাল হয়—"

পরিত্যক্ত কাপটা তুলিয়া লইয়া মাথাটা একটু দুলাইয়া সহাস্য মুখে

চায়ে চুমুক দিতে দিতে হরেনবাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছ মা, গোলমাল করবে কে সেটা ভেবে দেখেছ? এই জমিদারির কাজে মাথার চুল পাকালুম মা, তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি, বুঝি, সেটা তো জানো? গোলমাল করবে এমন সাহস কারও নেই। তোমায় জমিদারীর জন্যে একটু ভাবনা করতে হবে না, যেমন নিশ্চিন্তভাবে তোমার বাপ থাক্‌তে হেসে খেলে বেড়াতে তেমনি হেসে খেলে বেড়াও। দেশের অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়ার কথা জানো না মা, তাই সাহস করে সেখানে যেতে চাচ্ছো। সে জায়গা তোমার আদতে সহ্য হবে না, আর ম্যালেরিয়া একবার ধরলে আর ছাড়াতেও পারবে না এমনিই তার দস্তুর। পল্লী-গ্রামে থাক্‌তে তোমরা পারবে না, সেখানে চারিদিকে জঙ্গল, পথ ঘাট অপরিষ্কার, আলো নেই, গাড়ী ঘোড়া কিছু নেই, তারপর লোকগুলোও অশিক্ষিত নোংরা, তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে তোমার প্রবৃত্তি হবে না। এতটুকু বেলা হতে সহরে বাস করে, এখন পল্লীগ্রাম তোমার চোখে নরক বলেই ঠেক্‌বে।"

একটু জেদের সঙ্গে স্বপন বলিল, "কিন্তু এ গুলো হয়ই বা কেন কাকা, দেশের পথ ঘাট এত অপরিচ্ছন্নই বা থাকে কেন, পথ অন্ধকার থাকে কেন, জঙ্গলই বা এত বাড়তে পায় কেন? ম্যালেরিয়া বাংলার পল্লীকে উজাড় করে দিতে বসেছে, তাই বা হবে কেন? যদি জমিদার দেশেই বাস করে, দেশে রোগ দমনের উপায় করে, জঙ্গল কাটায়? কয়টী গ্রামে জমিদার বাস করছে, সেটা একবার ভাবুন। প্রজারা জমিদারকে খাজনা গুণে দেবে, জমিদারের মাটীতে তারা বাস করবে, তাদের ইষ্টানিষ্টের ভার জমিদারের হাতে; কিন্তু জমীদার তাদের সবটা নিচ্ছে, কতটুকু দিচ্ছে বলুন দেখি? আমি দেশে যাব, জঙ্গল কাটাব, পথ ঘাট পরিষ্কার

করার, সেই অসভ্য অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের সভ্য করে' শিক্ষিত করে' তাদেরই সঙ্গে মিশে যাব। সে একটা উদ্দেশ্য থাকবে তাতে আমি খুব ভাল থাকব কাকা, কিন্তু এখানে—এই মিথ্যে জীবন কাটানো আমার পক্ষে বড় দুঃসহ হয়ে উঠছে।"

তাহার স্বরটা কান্নায় ভিজিয়া আসিল।

"ওই যা, চা টা জুড়িয়ে গেলো যে মা, ছি ছি, আগেই অনর্থক তোমায় বকাতে সুরু করে' দিয়েছি। ঝি, আর এক কাপ চা তৈরি করে এনে দাও তো শীগ্‌গির।"

স্বপন কাপটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, "না, আর তৈরি করতে হবে না, চা বেশ গরম আছে। আমি খুব গরম চা খেতে পছন্দ করিনে কাকা, এই রকম গরমই খাই।"

সে একচুমুকে কাপ শূন্য করিয়া ফেলিল।

রুষ্টভাবে হরেনবাবু বলিলেন, "ও যে জল খাওয়া হল।"

স্বপন অঞ্চলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "এই রকমই আমি খাই কাকা।"

বিস্মিত হরেনবাবু বলিলেন, "ও আবার কি, আঁচলে মুখ মুচছো কেন, রুমালখানা—"

কথা শেষ না হইতেই স্বপন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "সে সব যাক এখন কাকা, অমোর দেশে যাওয়া আপনার মতে এখন উচিত নয় না ?"

হরেনবাবু ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার এখনি সেখানে যাওয়ার বিশেষ দরকার তো আমি দেখছি নে মা, কেন না আমি সেখানে নিজেই রয়েছি। তোমার বাবা আমায় বিশ্বাস করতেন তা জান তো ? আমার 'পরে এই বিশাল জমিদারীর সব ভার ফেলে দিয়ে তিনি দেশে দেশে

বেড়াতেন, আমি যতক্ষণে যা করতুম তাই হতো। যাবে বই কি মা, এখন জমিদারীর মালিক তুমি, প্রজারা তোমায় দেখবার জন্যে—তোমায় কাছে পাওয়ার জন্যে কতটা ব্যগ্র হয়ে রয়েছে। আর কিছুদিন যাক্ তারপর আমি তোমায় নিজেই সেখানে নিয়ে যাব। একজামিনের খবরটা বার হোক, একুশ বছর পূর্ণ হয়ে যাক, তোমার ঘরে তুমি ফিরবে, আমিই সব প্রজাদের সামনে তাদের জমিদারকে বার করব পরিচয় করিয়ে দেব। তোমার বাপের শ্রাদ্ধটা মিটে যাক্, তত-দিনে নিজেকে একটু সংযত করে তোলো।"

"আমি তো একটুও অসংযত হইনি কাকা।"

একটু হাসিয়া হরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সে তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি মা; তোমার সে কথা মুখে বলবার কোনও দরকার নেই।"

একটু নীরব থাকিয়া স্বপন বলিল, "বাবার শ্রাদ্ধ দশদিনে হবে কাকা, আজ তো দুদিন হয়ে গেল।"

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, পিতা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেন—"আজ মলে কাল দুদিন হবে তারা।" সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

হরেনবাবু বলিলেন, "শ্রাদ্ধের যোগাড় করবার ভাবনা তোমায় করতে হবে না মা, আমি সব ঠিক করছি।"

উদ্বিগ্ন হইয়া স্বপন বলিল, "বাবার গুরুদেব, আমার জ্যেঠা-মশাই কাশীতে সম্প্রতি এসেছেন, তাঁকে খবর দিতে হবে, খবর পেলেই তিনি এখানে চলে আসবেন। একখানা টেলিগ্রাফ করে দিন আমার নাম করে, যেন আসতে একটি মুহূর্ত দেরী না করেন, সব কাজ ফেলে তাঁর এখানে আসা চাই-ই।"

হরেনবাবু বলিলেন, "তিনি এসে কি করবেন ?"

স্বপন বলিল, "বাবা বলে গেছেন।"

গুরু মনে করিতেই যে শ্রেণীর জীবের কথা মনে পড়ে, হরেনবাবু তাহাই মনে করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। এই হিন্দুধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসী খামখেয়ালী জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন, তিনি কিছুতেই প্রভুর মনের এই সব কুসংস্কার ত্যাগ করাইতে সমর্থ হন নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের অনুদারতা লইয়া তিনি অনেক দিনই প্রভু ও বন্ধুর সহিত তর্ক করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু জানকীনাথ নীরবে একটু হাসিয়াই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দিতেন। গুরুদেবের নাম হরেনবাবু অনেক-দিন হইতেই শুনিতেছেন বটে, কখনও তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই।

স্বপন তাঁহার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিল, সে প্রসঙ্গ আর সে তুলিল না।

হরেনবাবু বলিলেন, "তোমার কথানুসারেই কাজ হবে, আমি এখন উঠছি। একটা কথা বলি মা, এ রকম করে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থেকো না, বাইরে বিকেলে খানিক বেড়াতে যেয়ো। আজ কি খাবে ?"

স্বপন বলিল, "এ কয়দিন হবিষ্য খেতে হয়।"

হরেনবাবু বলিলেন, "অর্থাৎ শরীরটাকে একেবারেই নষ্ট করিতে চাও, কেমন ? জিজ্ঞাসা করি, এতে স্বাস্থ্য থাকবে ?"

ভাঙ্গা সুরে স্বপন বলিল, "যদি নাও থাকে কাকা, তাও আমায় করতে হবে, কেন না আমি হিন্দু-নিয়মানুসারে চলছি। আপনি আমায় বারণ করবেন না কাকা, এ আমার বাপেরাজন্যে করা, প্রচলিত

নিয়ম পালন করে যাওয়া ; জগতে বাপ মায়ের চেয়ে আপনার আর কেউ নেই ; মায়ের বেলা কিছু করি নি, কবে মা চলে গেছেন তা জানিনে ; বাপের বেলা আমায় বাধা দেবেন না, সন্তানের কর্ত্তব্য কাজ কর্‌তে দিন।”

তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না, বড় বড় চোখ ছুটী জলে ভরিয়া উঠিল, উপ্‌ছাইয়া তাহার আরক্ত গণ্ডছুটি ভাসাইয়া দিল।

অপ্রস্তুত হরেন বাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, “না মা, আমি তেমায় বারণ করব না, তোমার মন যাতে শান্তি পায় তাই কর। তোমায় হয়তো এমন অনেক কথা বলেছি যাতে তোমার অন্তরে ঘা লেগেছে, আমায় মাপ কর স্বপন, বুঝতে পারিনি।”

স্বপন তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, “কাকা, আমি তাতে তত ব্যথা পাই নি। আমার ভয় হচ্ছিল পাছে আপনি জোর করে আমায় কোন নিয়ম প্রতিপালন করতে না দেন তাই।”

হরেনবাবু উঠিলেন।

৩

স্বপনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বাড়ীর সকলের চোখেই বিশেষভাবে পড়িয়া গেল।

স্বপন বিশ্বাস করিতে পারে নাই, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সব ফুরাইয়া গিয়াছে। পিতার গত জীবনের কথা সে বিশেষ জানিত না, সম্মুখে সে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহার কিছুদিন আগে সে জোর করিয়া প্রমাণ করিয়াছে, মরিলেই

মানুষের সব ফুরাইয়া যায়, কিন্তু আজ সে নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

হরেন বাবু স্বপনের এতটা বাড়াবাড়ি কিছুতেই পছন্দ করিতে পারেন নাই, সহ্য করিতেও পারিতেছিলেন না। কিন্তু স্বপনকে তিনি এ কঠোর ব্রতপালন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না,—স্বপন চারিদিক হইতে যত বাধা পাইতে লাগিল, ততই তাহার নিষ্ঠাকে আঁকড়িয়া ধরিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল, বন্ধু-বান্ধবেরা দিনরাত আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন, সুপরামর্শ দিতে লাগিলেন; স্বপন সে সব উপদেশ নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিল, কাহারও কথার কোন উত্তর দিল না।

হরেন বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "মরা গোরু কখনও ঘাস খায় না মা; যে মানুষ ম'রে গেছে—সে এখন কিছু তোমার কর্ম্মফলে স্বর্গে উঠবে না বা নরকে নাম্‌বে না। টাকা খরচ ক'রবে কর, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়া কোন মতে যুক্তিযুক্ত নয়। দেহটাকে একবার খারাপ হ'তে দিলে আর যে সহজে শুধরে উঠতে পার্‌বে সে আশা করো না। আর এতটা নিয়ম পালন ক'রে যাওয়া কি তোমার সাজে স্বপন?"

রুদ্ধকণ্ঠে স্বপন উত্তর দিল, "কেন সাজ্‌বে না কাকা? আমার বাবা যে ব'লে গেছেন—হিন্দুধর্ম্মানুসারে যেন কাজ হয়।"

নরম সুরে হরেন বাবু বলিলেন, "তাতে তো আমি আপত্তি কর্‌ছি না স্বপন, তবে এতটা বাড়াবাড়ি—"

স্বপন বাধা দিয়া বলিল, "বাড়াবাড়ি একটুও করিনি কাকা, যা ঠিক

তাই কর্‌ছি। আপনি বুঝতে পার্‌বেন না, কেননা আপনি হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধে হয় তো বিশেষ কিছু খবর রাখেন না।"

একটু উষ্ণভাবে হরেন বাবু বলিলেন, "আমি খৃষ্টান, এই কথাটাই তুমি আমার মনের মধ্যে বিশেষ করে জানিয়ে দিতে চাও স্বপন,—কিন্তু এ কথা মনে রেখো আমি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরই ছেলে, আমার বাপকে না চেনে এমন লোক খুবই কম আছে। জীবনের প্রায় অর্দ্ধেক দিন আমার হিন্দুর সংসারেই কেটেছে, কাজেই হিন্দুর আচার-ব্যবহার জান্‌তে আমার কিছুই বাকি নেই।"

নরম-সুরে স্বপন বলিল, "আপনি রাগ করবেন না কাকা, আমি রাগ কর্‌বার কথা বলিনি। আর যদিই সে রকম কোন অন্যায় কথা ব'লে থাকি, দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা করুন। আমার মাথার ঠিক নেই, কা'কে কি বল্‌ছি, কি ক'র্‌ছি, নিজেই ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিনে।"

হরেন বাবু জল হইয়া গেলেন, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আমিই কি রাগ কর্‌তে পারি মা? আমি খৃষ্টান, তুমি হিন্দু, আমাদের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'লেও আমি হিন্দু-ঘরের ছেলে ব'লে সবই জানি। তুমি যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়ম পালন কর্‌ছো, তা হিন্দুরই উপযুক্ত; অনেকেই এ রকম ক'রে থাকে তবু এতটা করতে বারণ কর্‌ছি, কেন না কখনও তুমি এতটুকু কষ্ট সওনি এত কষ্ট তোমার সইবে না—সেই জন্যে। আজ তোমাদের যিনি শিক্ষা-দীক্ষাদাতা—তিনি আসছেন, এলে দেখো—তিনিও তোমায় এ জন্যে অনুযোগ কর্‌বেন।"

স্বপন একটু হাসিল মাত্র।

হরেন বাবু ভবানীপ্রসাদকে কখনও দেখেন নাই, কেবল তাঁহার নামই শুনিয়া আসিতেছেন। জানকীনাথ গুরুর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ

যখন বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিতেন, নীরবে শুনিয়া যাইতেন মাত্র, প্রতিবাদ করিতেন না। শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল এ লোকটা প্রকৃতই জুয়াচোর ধাপ্পাবাজ—মেস্‌মেরাইজে সিদ্ধহস্ত, জানকীনাথকে ঠকাইয়া ভক্তি লইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ভবানীপ্রসাদ যখন কাশী হইতে আসিয়া পৌছাইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া হরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। প্রথমে তাঁহার মনে হইয়াছিল, একটা গেরুয়াপরা জটা-জুটধারী, চিম্‌টা-কমণ্ডলু-হাতে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইবেন, তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাইলেন একটা সাদাসিধা সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধকে। তাঁহার পরণে একখানি সাদা থান, পায়ে সাদা জুতা, চোখে চশমা, মুখে সৌম্য হাসি, মাথার সম্মুখে টাক পড়িয়াছে, চুল যাহা আছে তাহাও সাদা হইয়া গিয়াছে।

হরেন্দ্রনাথ অভিবাদন করিলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি লইয়া স্বামীজির আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন, তাহারপর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে স্বপনের নিকট গেলেন।

"এই নাও স্বপন, তোমার জ্যেঠামশাই এসেছেন।"

স্বপন তখন স্নানান্তে গরদের কাপড়খানা পরিয়া সবে মাত্র স্নানের ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। ভবানীপ্রসাদকে দেখিয়াই সানন্দে বলিয়া উঠিল, "এই যে জ্যেঠামশাই—"

সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল।

বৃদ্ধ ভবানীপ্রসাদ তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বলিলেন, "বড় রোগা হ'য়ে গেছ মা, শুন্‌লুম আমার জন্যে নাকি ভারি অস্থির হ'য়ে উঠেছ ?"

স্বপন উঠিল, বলিল, "না জ্যেঠামশাই, অস্থির বড় বেশী হইনি, তবে

শ্রাদ্ধের আর বেশী দেরী নেই, মাঝে আর দুটো দিন আছে মাত্র, মনে ভাবছিলুম যদি না আসেন, তবে কি উপায় হবে?”

একটু হাসিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “আস্‌ব না মা? তোমার বাপ যে আমার কতখানি আপনার ছিল সে কথা যদি জানতে তবে—থাক্ সে কথা। আমি তো এসেছি, আর তোমায় কিছু ভাবতে হবে না যা করবার তা আমিই করব এখন, কি বলুন হরেন বাবু?”

হরেন বাবু শুধু মাথাটা কাৎ করিলেন, কিন্তু আত্মপ্রসন্নতা কিছুতেই লাভ করিতে পারিলেন না। এই লোকটীর উপর এতটা বিশ্বাস করা স্বপনের পক্ষে কোন মতেই উপযুক্ত নহে।

বাহিরে কে ডাকিল, হরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, স্বপন ভবানীপ্রসাদের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতেছে।

স্বপন যে এমন ভাবে কাঁদিতে পারে ইহা যেন একেবারেই অসম্ভব। পিতা মারা যাওয়ার পর একটা দিনও তাহার চোখে কেহ জল দেখিতে পায় নাই। বাহিরে সে শান্ত স্থির, কিন্তু অন্তরে যে তাহার কান্না ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল তাহা কেহ জানে নাই। কতবার কান্না আসিয়া পড়িত, স্বপন নিজেকে অতিকষ্টে সামলাইয়া লইত। ইহাদের কাহার নিকটে সে কাঁদিবে, কাহার নিকটে নিজের দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করিবে?

হরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহারপর ডাকিলেন,—“স্বপন—”

একটু হাসিয়া স্বপনের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “ডাকবেন না হরেন বাবু। ওর বুকে অনেকখানি

ব্যথা জমে উঠেছে, চোখের জল ও ফেলতে পায়নি ; একটু কাঁদুক, বুকটা ওর হাল্‌কা হয়ে থাক্।”

হরেন্দ্রনাথ একটু উষ্ণভাবেই বলিলেন, “না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না, কেউ যদি এ-রকম দুর্ব্বলতা দেখতে পায়, কি মনে করবে ? অন্ততঃ পক্ষে দাসদাসীদের চোখের সামনে ওকে আমি এত ছোট হতে দেব না। 'ওঠ স্বপন, অমন করে' কেঁদ না।”

মাথা দুলাইয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “একটা নূতন কথা শুনালেন হরেন বাবু! শোক কি বাবা লজ্জা ভয় করে' চলে ? শোককে আপনি কতক্ষণ সামলে রেখে চলতে পারেন বলুন দেখি ? যে ছিল স্বপনের একমাত্র আপনার, সে চলে গেছে, তার জন্যে ও কাঁদতে পাবে না, পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়,—একি অন্যায় চাপ বলুন দেখি ?”

রুদ্ধরোষে হরেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন। এতটা আনু-গত্য তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না,—এ যেন অসহ্য বোধ হয়।

স্বপন অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “বুকের মধ্যে কান্না চেপে রেখে আমি আর তো বেড়াতে পারিনে জ্যেঠামশাই, বুক ছাপিয়ে কান্না বা'র হতে চায়, পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয় এই ভয়ে কত কষ্টে চোখের জল সাম্‌লে রাখি। জ্যেঠামশাই, শোক দরিদ্রেরও যেমন, ধনীরও তেমনি, এ কথাটা ভাবতে কাকা ভুলে যাচ্ছেন, আপনি তো ভুলবেন না। আমায় একবার ছেড়ে দিন, আমি একবার প্রাণভরে কেঁদে নেই।”

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “কাঁদ মা, কেঁদে বুকের ভার হাল্‌কা কর। বুঝতে পারছি—বড় ব্যথা পেয়েছ, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না মা, অনেক ব্যথা সইতে হবে যে।

সংসারে এই তো সবে পা দিয়েছ স্বপন, এখনও অনেক ঝড় আসবে, সব সইতে হবে। তোমায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে শিক্ষা কি তোমার মধ্যে ব্যথা সইবার শক্তি দিতে পারবে না স্বপন ?"

স্বপন নীরবে চোখ মুছিতে লাগিল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "তোমায় শক্ত হ'তে হবে স্বপন। পুরুষের দার্ঢ্য, নারীর কোমলতা, সহনশীলতা, এই সব দিয়ে তোমায় তৈরী করেছি। এখন তোমার ঘাড়ে দায়িত্ব এসে পড়েছে, কোমলতাকে আশ্রয় দিলে তো চলবে না, দার্ঢ্য নিয়ে এসো, সহনশীলতা নিয়ে এসো, দাঁড়াও মা আদর্শ নারী, সাম্‌নে দাঁড়াও। তোমার বাপ চলে গেছে, তাই কাতর হয়ে পড়েছ, কিন্তু মা, জানই তো ;—নশ্বর জীবন, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একের লয় হচ্ছে, আর একের সৃষ্টি হচ্ছে, এমনি করে' কত বংশের সৃষ্টি হচ্ছে। বাপ যায়, ছেলে থাকে, সে যখন বাপ হয়, তার ছেলে তখন থাকে, একই রক্ত সমান বয়ে আসছে। দেহ চলে যায়, কারণ সেটা নশ্বর—কিন্তু রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রাণগুলোই বংশ-ধারায় ছড়িয়ে পড়ে।"

কাতরকণ্ঠে স্বপন বলিল, "সব শিক্ষাই তো দিয়েছেন জ্যেঠামশাই। বাবার শোকে আমি যতটা কাতর না হয়েছি, সংসারের ব্যবহারে তার চেয়ে বেশী অধীর, বেশী ব্যথিত হয়েছি।"

ভবানীপ্রসাদ কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া স্বপন বলিল, "আপনি বলবেন সবই বুঝেছেন, কিন্তু যথার্থই সবটা বুঝতে পারেননি জ্যেঠামশাই। আমার মনে হয়, আমার এই বাইরের শিক্ষাটা না দিলেই ভাল হতো। এই সব বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে থেকে ছদ্মবেশের আড়ালে আমার সত্যকার প্রাণটা এমন করে আছড়ে এসে বাধা পেয়ে

ফিরত না জ্যেঠামশাই, আমার প্রাণ যা চাইত আমি তাই করতে পারতুম। আমার আমিত্বটা প্রকাশের পথ পায় না; স্বাধীনতার মাঝখানে থেকে এর মত পরাধীন আর কেউ নেই, ভেতরে আমিত্বটাকে চেপে রেখে বাইরে অহরহঃ লোকের সম্ভ্রম আকর্ষণ করবার জন্যে আমায় চেষ্টা করতে হবে, যেন কেউ আমার নাগাল না পায়। এ যে অভিশপ্ত জীবন জ্যেঠামশাই, এ জীবনের শেষ হবে কোথায়,—কবে?"

হরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন, যাওয়ার সময় একটা কথাও বলিয়া গেলেন না।

স্বপন একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, বলিল,—"উঠুন জ্যেঠামশাই, কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে একটু জল খেয়ে নেবেন চলুন।"

ভবানীপ্রসাদ উঠিলেন।

৪

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেল।

ভবানীপ্রসাদ নিজেই পুরোহিত হইয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিলেন, পিতার আত্মার তৃপ্তি কল্পনা করিয়া স্বপনের হৃদয় অতবড় শোকের মধ্যেও অনেকখানি শান্তি পাইল।

ভবানীপ্রসাদের উপর হরেন্দ্রনাথ একেবারেই চটিয়া গিয়াছিলেন। জানকীনাথের মুখে তিনি গুরুদেবের অনেক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাইতেন, কিন্তু সেরূপ প্রশংসার যোগ্য কিছুই ইহার মধ্যে দেখিতে পাইলেন না। ভবানীপ্রসাদের শান্ত-সৌম্য-মূর্ত্তিখানা যতই তাঁহার চোখে পড়িতেছিল,

ততই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। তিনি তাঁহার সত্যপূর্ণ চোখ দিয়া দেখিতেছিলেন, লোকটার আগাগোড়া সবই ভণ্ডামী, সে এই ভণ্ডামীর মুখোস পরিয়া সকলের চোখে ধূলা দিয়া বেশ বেড়াইতেছে। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, বুদ্ধিমান জমিদার জানকীনাথের চোখে যে ব্যক্তি ধূলা দিতে সমর্থ হইয়াছে, সে তাঁহার কন্যাকেও পুতুলের মত টানিয়া বেড়াইবে, ইহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই। এই যে খেলা সে সুরু করিল, কে জানে কত কালে এ খেলার নিবৃত্তি হইবে। জানকীনাথ বুদ্ধিমান হইয়াও অনেক সম্পত্তি ঘুচাইয়া গিয়াছেন, অনেক বাধা পড়িয়া আছে, স্বপন তাহার কিছু কিছু জানিলেও সব জানে না। তাঁহার শ্যালক প্রভাত, সে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই,—তাহার সহিত স্বপনের বিবাহের কথা পাকা হইয়া আছে। সে বিলাত হইতে ফিরিলে কোনক্রমে তাহার সহিত স্বপনের বিবাহটা দিয়া দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। হোন না তিনি বিধর্ম্মী, তাঁহার স্ত্রীও খৃষ্টান, তবু তিনি প্রভাতের ভগিনী, হরেন্দ্রনাথ ভগিনীপতি, ধর্ম্মান্তর রক্তের সম্বন্ধ দূর করিতে পারে না,—বিশেষ প্রভাতের মধ্যে সে গোঁড়ামী আদৌ নাই। সে দিদির হাতেও খায়, দিদির বাড়ীতে থাকিয়াও দিন কাটায়।

শ্রাদ্ধ শেষে তিনি এ বাড়ীতে আসা একেবারেই কমাইয়া ফেলিলেন। সকালে অথবা বৈকালে মিনিট দশ-পোনরর জন্য আসিয়া স্বপনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ লইয়া চলিয়া যাইতেন ; ভবানীপ্রসাদ নামে একটি লোক, তাঁহার মনিব ও বন্ধুর গুরুদেব যে সেখানে আছে, তাহা যেন তাঁহার চোখেও পড়িত না, কানেও সে কথা যাইত না।

তাঁহার এই তাচ্ছিল্য-ভাবটা স্বপন লক্ষ্য করিয়াছিল, ভবানীপ্রসাদও

যে লক্ষ্য করেন নাই এমন নয়। তাঁহার চিরশান্তমুখে ক্ষমাপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সেদিন বৈকালে ডাক্তার বিকাশ গুপ্ত ভবানীপ্রসাদকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার পর তিনি ফিরিয়া আসিবেন। স্বপন একা ত্রিতলের মুক্তছাদে বেড়াইতেছিল। এই এক মাসের মধ্যে তাহার মুখ-চোখের স্বাভাবিক ভাব আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল, পিতৃ-বিয়োগ-কাতর হৃদয় অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়াছে।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, ম্যানেজার বাবু আসিয়াছেন।

স্বপন বলিল, "তাঁকে হল-ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও, এখনি আমি যাচ্ছি।"

খানিকটা বাদে সে দ্বিতলে নামিয়া আসিল। প্রকাণ্ড বড় হলটার মাঝামাঝি গোলাকার বড় একখানি টেবল, তাহার চারিদিকে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের চেয়ার, এদিক ওদিকেও চেয়ারের অপ্রতুল ছিল না। অভ্যাগতগণ এইখানেই বসিয়া থাকেন।

হরেন্দ্রনাথ টেবলের কাছে বসেন নাই, এক কোণে একখানি ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় পড়িয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে একদিকে তাকাইয়া ছিলেন।

বিস্ময়ের সুরে স্বপন বলিল, "আপনি বেছে বেছে একটি কোণ পছন্দ করে বসেছেন যে কাকা?"

গম্ভীর নীরস-কণ্ঠে হরেনবাবু বলিলেন, "এখানে বসলেও যা, ওখানে বসলেও তাই। তুমি এখানে এসো স্বপন, এই চেয়ারখানায় বসো, তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে গোটা কত কথা বল্‌তে চাই। কোনও সময় তোমায় একা দেখতে পাইনে, আমার কথা বলাও হয়ে উঠে না।"

তাঁহার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরটা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তাহা স্বপন চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে সে-বিষয় লইয়া তর্ক করিতে যাওয়া অনাবশ্যক বোধ করিল; কেন না ইহাতে যে ফলটা হইবে, তাহা কখনই শুভ হইবে না।

স্বপন অগ্রসর হইয়া হরেন বাবুর সম্মুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল, শান্ত-কণ্ঠে বলিল, "এমন কি কথা আছে কাকা, যা নির্জ্জনে না হ'লে বল্‌তে পারেন না? আমি তো সে রকম গোপনীয় কথা একটাও খুঁজে পাচ্ছি নে।"

হরেন্দ্রনাথের ললাটের মাঝামাঝি যে শিরাটা স্ফীতভাবে মাথার দিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেটা বেশী রকম স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি চোখের চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া কাঁচ দুই-খানা ঘসিতে ঘসিতে একটু উষ্ণ সুরেই বলিলেন,—"কথা না থাক্‌লে নির্জ্জনে তোমায় পেতে চাইব কেন? গোপনীয় কথা তোমার বিবেচনায় না থাক্‌লেও আমার মতে অনেক আছে, সে সব কথা আমি আর কারও সাম্‌নে বল্‌তে ইচ্ছে করি নে।"

স্বপন বিস্ময়ে বড় বড় চক্ষু দুইটী বিস্তারিত করিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কথা বলিল না।

হরেন্দ্রনাথ একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছ না স্বপন?"

স্বপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না কাকা, আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। এমন কি কথা থাকতে পারে যা আর কারও সাম্‌নে আপনি আমায় বল্‌তে পারেন না? আমার কাছে তো আর কেউ-ই থাকে না এক জ্যেঠামশাই ছাড়া—আর—"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি যদি বলি সেই জন্যেই আমি বল্‌তে পারি নে স্বপন! আজ কুড়ি-বাইশ দিন ধ'রে তোমার নাগালই তো পাচ্ছি নে।"

কিন্তু তাঁহারই যে নাগাল পাওয়া যায় না, এ কথা স্বপনের মুখে আসিয়া ফিরিয়া গেল, শান্ত-সংযত কণ্ঠে সে বলিল, "হ্যাঁ, কিছুদিন হ'তে ভারি ব্যস্ত হ'য়ে আছি, জ্যেঠামশাই থাক্‌তে আমার এতটুকু ছুটি পাওয়ার যো নেই। আপনি তাঁর সাম্‌নে বল্‌তে পারেন না, এমন কি কথা আছে তা তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। যাই হোক্‌ আজ তো তিনি নেই, আপনার গোপন কথা বল্‌বার অবকাশ আজ যথেষ্ট আছে।"

হরেন্দ্রনাথ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "আমায় কালই জমীদারিতে যেতে হচ্ছে।"

স্বপন বলিল, "কালই যাবেন? এই যে শুনেছিলুম কিছুদিন পরে যাবেন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার কাজ তো সেই খানেই মা, এখানে বাধ্য হ'য়ে এই কতদিন থাক্‌তে হ'য়েছে, এতে যে সেখানে কতখানি ক্ষতি হ'য়ে গেল তা কি ক'রে বল্‌ব। সে ক্ষতিগুলো সার্‌তে আবার কতদিন লাগ্‌বে। হ্যাঁ, যাওয়ার আগে তোমায় একটা কথা ব'লে যাই—" বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

স্বপন বলিল, "বলুন।"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখ' মা, আজ কতদিন হ'তে কথাটা তোমায় ব'ল্‌ব ভেবেছিলুম, কিন্তু সময়াভাবে বল্‌তে পারিনি। আমার কথায় রাগ বা দুঃখ করো না স্বপন, কথাগুলো আগে বুঝে দেখো। এই যে অসম্ভব রকম গোঁড়ামী কর্‌ছ, এটা কি ভাল হচ্ছে, এতে কি

সকলে তোমায় নিন্দে কর্‌ছে না? গ্র্যাজুয়েট মেয়ে তুমি, তুমিও ওই সব কুসংস্কার মেনে চল্‌বে? তোমার শিক্ষা তোমার মনের অন্ধকার দূর কর্‌তে তো সমর্থ হয়নি স্বপন, অন্তর তোমার যেমন চাপা তেমনিই থেকে গেছে। এই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বপন? তুমি নিজে কুসংস্কারান্ধ, তাই কুসংস্কারের ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিয়েই চ'লেছ, এ গুলো ঠেকাবার শক্তি তোমার নেই।"

একটু তীব্র সুরেই স্বপন বলিল, "আপনি ভণ্ডামী বা কুসংস্কার কাকে ব'লতে চান্ কাকা? আমার বাবা উপদেশ দিতেন—যাই কেন হোক্ না, নিজের মনে বিচার ক'রে নেবে, বিনা বিচারে কিছু নিয়ো না, মানুষ ঠকে তাইতেই। আমি যা নিয়েছি কাকা, বিনা বিচারে নিইনি, বিচার ক'রে ভাল ব'লে যা বুঝেছি তাই নিয়েছি। আর সংস্কারের কথা বল্‌ছেন, বলুন দেখি আপনি কতখানি সংস্কার ত্যাগ কর্‌তে পেরেছেন? আসল কথা কি জানেন, মানুষের যেখানে দুর্ব্বলতা সেইখানেই সে শক্ত হ'তে চায় বেশী, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শক্ত সে কিছুতেই হ'তে পারে না। মানুষ নিজের দোষ কোন দিন দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু পরের দোষটা চট্ ক'রে দেখ্‌তে পায়। সংস্কার নেই কার? কেউ কোন দিন জোর ক'রে বল্‌তে পারে আমি সংস্কার ত্যাগ করেছি? জন্মগত সংস্কারের দুর্ব্বলতা চাপ্‌বার জন্যে আপনি আর একটা সংস্কারের বোঝা তার 'পরে চাপাবার চেষ্টা কর্‌ছেন, কিন্তু তা কি চেপে রাখা যায়, সে ভেতর হতে উঁকি দেবেই। আপনি চাপ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, আমি করিনি, কারণ এ রকম গোপনতা আমি ঘৃণা করি; আমি জানি আমি বাস্তবিক যা সেই পরিচয়ই লোকে পাক্, মুখে একটা মুখোস প'রে শেষে লোককেই শুধু

ঠকাব না, নিজেকে পর্য্যন্ত ঠকাব। কাকা, কথামালায় ময়ূরের পালকে ঢাকা কাক ময়ূর হ'তে পারেনি, সে কাকই ছিল, আমি জানি—আমি লক্ষবার চেষ্টা কর্‌লেও মনের সংস্কার ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না, আমি যা তাই থেকে যাব, কাজে কাজেই মুখোসটা মুখে দিতে পারিনি এই তো আমার অপরাধ।"

হরেন্দ্রনাথের মুখখানা কালো হইয়া উঠিল, তিনি খানিক কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

স্বপন বলিল, "ভণ্ডামীর প্রশ্রয় আমি কোন দিন দিইনি কাকা, ভণ্ডামী শুধু লোককে ঠকানো নয়, রীতিমত আত্ম-প্রবঞ্চনাও বটে। কিন্তু সে কথা এখন ছেড়ে দিন্ কাকা, ছনিয়ায় কে ভণ্ড, কে সৎ, সে বিচার কর্‌তে আমি চাইনে, কেননা সে বিচারের ভার ভগবান্ আমায় দেননি। আর এ রকম ক'রে লোক বেছে বেড়াতে গেলে মনটাও বড় ছোট হ'য়ে যায়, কারও 'পরে বিশ্বাস আর রাখা যায় না। এমন সুন্দর পৃথিবীতে এসে যদি কাউকে বিশ্বাসই না কর্‌তে পার্‌লুম, যদি সকলকে এড়িয়েই চল্‌ব কাকা, তবে পৃথিবীতে বাস করার চেয়ে না করাই ভাল।"

হরেন্দ্রনাথ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন, শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তোমার মনের ভাব বুঝ্‌তে আমার একটুও বাকি নেই স্বপন। অবশ্য তুমি যা বল্‌ছো তা অলৌকিক নয়, তা আমি স্বীকার কর্‌ছি, কিন্তু এও বল্‌ছি, এই অতিরিক্ত বিশ্বাসই তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে। মানুষকে চিন্‌তে শেখ'নি, পৃথিবীকে চেননি, কিন্তু যেদিন চিন্‌বে সেদিন কতখানি আঘাত পাবে তা কি ভেবে দেখেছ স্বপন?"

শান্তস্বরে স্বপন বলিল, "না কাকা, এখনও ভাবিনি, ভাব্‌বার

সময় পাইনি। কিন্তু স্বপনকে এমন শক্তিহীনা ভাব্‌বেন না কাকা, যে সে আঘাত সইতে পার্‌বে না। স্বপনের বুকে ভগবান্ এতটুকু বল দিয়েছেন যাতে ক'রে অনেক আঘাতের বেদনা সে সইতে পার্‌বে, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে না। আপনি উঠ্‌ছেন কেন কাকা, বসুন।"

দৃপ্তভাবে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার এই শান্ত কথায় আমি শান্ত হ'তে পার্‌ছি নে স্বপন, দুর্ভাগ্য এইটুকুই, আর কিছু নয়। আমি জানি বিপদকে বরণ ক'রে নিয়ে তখন সাহস না দেখানোর চেয়ে, যাতে বিপদ না আসে সেই চেষ্টাটুকুই করা ভাল। দেখ স্বপন, একটা কথা আছে, সব ক্ষেত্রেই সমান ফসল উৎপন্ন হয় না; কোন ক্ষেত্রে আবার বেশী ফসল জন্মায়, কোন ক্ষেত্রে কিছুই হয় না, অদৃষ্টদোষে সেই বীজের গোড়া হ'তে কতকগুলো আগাছাই জন্মায়। শিক্ষার সম্বন্ধে এই কথাটা ঠিক বলা চলে।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম?"

হরেন্দ্রনাথ আবার বসিলেন, বলিলেন, "শিক্ষা কারও হৃদয়কে মার্জ্জিত ক'রে তোলে, শিক্ষার উপকার বেশ বোঝা যায়, কিন্তু এই শিক্ষাই আবার কোন হৃদয়কে ক্লেদপূর্ণ ক'রে তোলে, তার দ্বারা উপকার কিছুই হয় না, অনুপকারই হ'য়ে থাকে।"

স্বপন বলিল, "অর্থাৎ আপনি বল্‌তে চান, শিক্ষার যা উদ্দেশ্য তা আমার মধ্যে সফল হ'য়ে উঠ্‌তে পারেনি?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বাস্তবিকই তাই। আমার কথায় রাগ বা দুঃখ ক'রো না স্বপন, আমি তোমায় এতটুকু বেলা হ'তে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, তোমার দু'কথা বল্‌বার অধিকার আমার যথেষ্ট আছে, তার জন্যেই তোমায় দু'কথা বলি। হিন্দুর মেয়েদের মধ্যে

উচ্চশিক্ষা দিতে হিন্দু শাস্ত্রকারেরাই নিষেধ ক'রে গেছেন, কেন জানো? কেননা তারা হাজারই শিক্ষা পাক্ না কেন, তাদের মনের মলিনতা দূর হবে না, তারা যে আঁধারে সেই আঁধারেই থেকে যায়। তাদের ভুল ধরিয়ে দিতে গেলে তারা তর্ক করতে আসে—অথচ নিজেদের ভুল সুধরে নেওয়ার দিক তাদের লক্ষ্য থাকে না। হিন্দুশাস্ত্র সেই জন্যেই বলেছে, মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।"

স্বপন হাসিল, বলিল, "না কাকা, এটা আপনার ভুল ধারণা। হিন্দুশাস্ত্র এ কথা যদি কোনদিন বল্‌ত, তবে আমরা আজ খনা, গার্গী, লীলাবতী, বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মেয়েদের নাম শুন্‌তে পেতুম না। হিন্দুশাস্ত্র যদি এতটা অনুদারই হতো, ভারতের সে সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌তে পার্‌তেন না। আজ ভারতের যে অবরোধ-প্রথা দেখে আপনারা সকলে শিউরে ওঠেন, ভাবেন ভারত চিরকালই এমনই ভাবে মেয়েদের চেপে পিষে মার্‌ছে, ভারতের সে যুগে এ প্রথা ছিল না, মেয়েরাও সমানভাবে ছেলেদের মত লেখাপড়া শিখ্‌তে পার্‌ত, মেয়েদের জন্যে স্বতন্ত্র একটা স্থান তৈরী হয়নি। অনেক মেয়ে রীতিমত শাস্ত্রালোচনাও করেছেন, আপনি যদি ঘৃণা না ক'রে সে যুগের পুরাণ-ইতিহাসগুলো খুঁজে দেখেন দেখ্‌তে পাবেন। মৈত্রেয়ী রাজা জনকের রাজসভায় দাঁড়িয়েছিলেন, শঙ্করাচার্য্য একটি নারীর সঙ্গে তর্ক ক'রে হেরে গিয়েছিলেন। এ সব মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা অসংযমের মধ্যে দিয়ে নয় ব'লেই ত সমাজের, দেশের ও দশের পক্ষে কল্যাণকর হ'য়েছিল। হিন্দুকে আপনি ঘৃণা করেন, অবশ্য আমি আপনার পূর্ব্ব-

জীবনের কথা আজ বল্‌তে চাইনি, কিন্তু হিন্দু কিসে ঘৃণিত আমি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি? হিন্দু আজ অনেককাল পরে বুঝেছে মেয়েদের এগিয়ে দিতে হবে, তাদের আগের আদর্শ আবার ফিরিয়ে আন্‌তে হবে, তাই তারা নিজেদের হাতে ঘরের আগল ভেঙ্গেছে, তাদের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিচ্ছে, কিন্তু সে শিক্ষা অসংযমের মধ্যে দিয়ে নয়, সংযমের মধ্যে দিয়ে। আপনি শিক্ষিত, আপনাকে এ কথা বল্‌তে হবে না কাকা, যে শিক্ষা কাকে বলে। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে না, তাকে একটা অদ্ভুত জীবরূপে পরিণত করে, তার ভিত্তির উচ্ছেদ ক'রে দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয় কাকা, তেমন অসার শিক্ষা আমি কোনদিনই পেতে চাইনি, কাউকে চাইতে বল্‌ব না। যে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলে, তার বহুমুখী ইচ্ছা গুটিয়ে এনে একই কেন্দ্রে স্থাপন করে, সেই প্রকৃত শিক্ষা। সেই শিক্ষায় যিনি শিক্ষিত হয়েছেন, তিনি আপনার মূল দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পেরেছেন, জীবন-যুদ্ধে তাঁর জয় অনিবার্য্য। সেই শিক্ষায় যিনি শিক্ষিত, তাঁর দ্বারাতেই দেশের প্রকৃত কুসংস্কার দূর হবে, দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল তাঁর দ্বারাই সাধিত হবে, আর কারও দ্বারা হ'তে পার্‌বে না। একটা খাঁটি জিনিষে কালক্রমে অনেক ভেজাল মিশে জিনিষটাকে বিকৃত করে দেয় কাকা। হিন্দুধর্ম্ম মেঘে চাপা প'ড়ে আছে, মাঝে মাঝে সূর্য্য ফুট্‌ছে, আলো ছুট্‌ছে, আবার মেঘ আস্‌ছে। কিন্তু ঝড় উঠ্‌ছে কাকা, এ মেঘ কেটে যাবে, সূর্য্য যে স্বপ্রকাশ, কতক্ষণ ঢাকা থাক্‌তে পারে? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, ভিন্নধর্ম্মী হ'লেও আপনি আমায় আপনার মেয়ের মতই ভালবাসেন, অসঙ্কোচে

আপনার কাছে সব কথাই ব'লে ফেল্লুম, কিছু মনে কর্বেন না কাকা।”

হরেন বাবু শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, “কি মনে কর্ব মা, তুমি যা বল্ছো এর বিরুদ্ধে তর্ক করবার মত অনেক কথাই আছে, কিন্তু থাক্ সে সব কথা, আমি তর্ক কর্তে চাই নে—সে জন্যে আসিনি। তবে আমি কেবল এই ভাব্ছি—তোমার দিন দিন ধর্ম্মের 'পরে যে রকম নিষ্ঠা বাড়্ছে, তাতে এর পরে প্রভাতকে বিয়ে না ক'রে হয় তো কোন ব্রাহ্মণকে—”

হাসিয়া স্বপন বলিল, “তার সঙ্গে এ কথা কেন কাকা, কথাটা ঠিক হ'ল না যে। বাবা সত্যবদ্ধ হ'য়ে গেছেন, তাঁকে সে সত্য হ'তে মুক্তি দিতে হবে আমায়, এ কথাটা কি আমি ভুলে যাব? বাবার আত্মাকে মুক্ত কর্তে আমায় যে বিয়ে কর্তেই হবে কাকা! সন্তান হ'য়ে এই সামান্য ত্যাগটুকু তাঁর জন্যে কর্তে পার্ব না?”

হরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। স্বপন পিতাকে সত্যমুক্ত করিবার জন্যই বিবাহ করিতে চায়, নিজের জন্য নয়, প্রভাতের জন্য নয়। তাহাই হোক্, যে কোন রকমে প্রভাতের সহিত তাহার বিবাহ দিতেই হইবে।

৫

ভবানীপ্রসাদের সহিত দেখা না করিয়া হরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন।

স্বপন যখন ভবানীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিল, হরেন্দ্রনাথ দেখা করিয়া গিয়াছেন কি না, তখন তিনি একটু হাসিলেন মাত্র, সেই হাসিই স্বপনের প্রশ্নের উত্তর দিল, কুণ্ঠিতা স্বপন মাথা নত করিল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "তিনি যে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চুপি চুপি চলে যাবেন, তা আমি ভাবিনি মা, আমি আশা করেছিলুম, কোন্‌দিন তিনি আস্তিন গুটিয়ে আমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবেন।"

হাসিমুখে স্বপন বলিল, "সেটা করলেই কিন্তু ভালো হতো, না জ্যেঠামশাই?"

ভবানীপ্রসাদ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অমন কথা বলো না মা, তা হ'লে এই হাড় ক'খানার অস্তিত্বও আর থাকৃত না। হরেনবাবুর বয়েস হ'লেও চেহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট, আর আমার উপবাসে দেহ ক্রমেই জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছে, বয়েসও তাঁর চেয়ে ঢের বেশী হয়েছে।"

"দেখি জ্যেঠামশাই, আপনার হাতখানা—"

তাঁহার শীর্ণ হাতখানা নিজের কোমল পেলব হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে স্বপন বলিল, "আমার বেশ মনে পড়ছে জ্যেঠা-মশাই, আজ আট-নয় বছর আগে ট্রেণে একটা লোক একটী দুর্ব্বলা নারীর 'পরে অত্যাচার করতে গিয়েছিল; মেয়েটীর চীৎকারে আপনি ছুটে সেখানে গিয়েছিলেন, সেই অসুরটার হাতখানা ধরে এমন এক ঝাঁকানি দিয়েছিলেন যাতে ক'রে সে বুঝতে পেরেছিল, এই রোগা

মানুষটীর মধ্যে কতখানি শক্তি আছে। আর একবার এই কয়েক মাসের কথা—হরিদ্বারের পথে অমরনাথ—”

“পাগ্‌লি, চুপ কর, আমায় অতটা বাড়িও না। সে কি আমি রে, সে আমি নই। আমার মধ্যে এমন কি শক্তি আছে মা, যে অমন সব দুর্দ্দান্ত বলশালী লোকদের আমি ঠেকাতে পারি? দুর্ব্বলের ’পরে অত্যাচার যিনি সইতে পারেন না, তিনিই তখন সাম্‌নে অত্যাচার ঘটতে দেখে চেতন পান, সে তাঁরই কাজ মা, শীর্ণ মানুষের কাজ নয়। বিশ্বাস কর, যাঁর নামে শুক্‌নো গাছ মুঞ্জরিত হয়ে উঠতে পারে, ক্ষীণ দুর্ব্বলের বুকে তিনিই তখন জেগে ওঠেন, তাকে দিয়ে ও কাজ করিয়ে নেন।”

হাত দু’খানা তিনি কপালে রাখিলেন, তাঁহার উজ্জ্বল মুখখানা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বপন নির্ব্বাকে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল। এই মানুষটী বড় ক্ষীণ, দুর্ব্বল, কিন্তু এই কয়খানা হাড়ের মধ্যে যে কতখানি শক্তি আছে তাহা সে শুধু শোনে নাই, অনেক সময় চাক্ষুষ পরিচয়ও পাইয়াছিল।

স্বপনের পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, “তাঁকেই প্রণাম কর স্বপন, যিনি অন্ধকারে আলোর বিকাশ করেন, জড়কে কার্য্যদক্ষ করতে পারেন, মরার বুকে জীবন দিতে পারেন। তিনিই সত্য আর সবই মিথ্যা, সব ছায়াময়, মায়াময়।”

স্বপন প্রণাম করিল, তাহার পর ভবানীপ্রসাদের পায়ের ধূলা লইল। ভবানীপ্রসাদ আশীর্ব্বাদ করিলেন, “সত্যপথের পথিক হও।”

রুদ্ধকণ্ঠে স্বপন বলিল, “জ্যেঠামশাই, আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে গিয়েও নির্ভর করতে পারিনে, বিশ্বাস করতে যাই, বিশ্বাস করতে পারিনে,

কোথা হতে কোন্ ফাঁকে অবিশ্বাস আসে—মনটা তাতেই ভরে ওঠে। আমি জোর করে মুখে বল্‌তে চাই বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্তর তো তত সহজে সে কথা মেনে নিতে চায় না জ্যেঠামশাই! কেন তেমনভাবে বিশ্বাস করতে পারিনে, কেন অবিশ্বাস আসে বলুন দেখি?"

শান্তসুরে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "এইটুকুই শিক্ষার ফল স্বপন। অনেকে এই দ্বিধাভাবকে কুফল ব'লে থাকেন, কিন্তু আমি বলি এই সুফল। যেটা নেবে, সেটা বিচার ক'রে—বেশ ক'রে যাচাই ক'রে নাও, কেননা সত্য ও মিথ্যা দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে আছে; গিল্টিও যাচাই ক'রে না নিলে সোনা বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। যাচাই কর,—বিচার কর, মিথ্যা বুঝ্‌তে পারবে, তাকে সযত্নে সরিয়ে ফেলে আসল জিনিস তুলে নাও। যা পেলুম,—বিচার না ক'রে, যাচাই না ক'রে তাই যদি দু'হাতে কুড়িয়ে ঝুলিতে রাখি, ক্ষুদ্র ঝোলা সত্যমিথ্যার ভার বইতে অক্ষম হ'য়ে একদিন পথের মাঝখানে বাস্তবিকই যখন ছিঁড়ে পড়্‌বে, তখন তাকিয়ে দেখবে, রাশি রাশি মিথ্যাই সঞ্চয় ক'রে এসেছ মাত্র; এর মাঝে সত্য যা পেয়েছ তা অতি সামান্য—কিছুই নয় বললেই চলে। সত্য তার মাঝে এত ক্ষুদ্র আর এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে, তাকে চিনে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই—এ সংসারে মিথ্যেই যে সব পনের আনা, আর সত্য মাত্র এক আনা, কিন্তু ওই এক আনা সত্য এত ভারি যে তাকে নিক্তিতে বসালে সে ওই পনের আনার সমান হয়ে যাবে। এ পনের আনা মিথ্যের মধ্যে এক আনা সত্য কত সূক্ষ্ম হ'য়ে মিশে তাদের প্রত্যেক অংশকে ভারি ক'রে তুলেছে সেটা মনে মনে একবার হিসাব ক'রে দেখ। মা, দেবাসুর সুধার লোভে সমুদ্রমন্থন করেছিল, সে গল্পটা পড়েছ কি? হয় তো পড়নি, কিন্তু তোমার

বাপের মুখে গল্পটা শুনে থাকবে। এ একটা রূপক হ'লেও হতে পারে ; আমার মনে হয় মানুষের অন্তরটাই সমুদ্র, সুমতি ও কুমতি দেবাসুর। তোমার শিক্ষা-সংস্কার মিলে মনসাগর মন্থন করছে, এতে সুধাই উঠবে, —গরল উঠবে না। এই বিচার করার ফলে তুমি যা পাবে, জেনো সেইটুকুই খাঁটি জিনিস, সেইটুকুই সত্য—পনের আনা মিথ্যাকে বাদ দিয়ে এই সাগরমন্থনের ফলে সেই এক আনা সত্য কুড়িয়ে পাবে। যারা ষোল আনা দিয়ে ঝুলি ভরেছে, তারা তোমার ঝুলির পানে চেয়ে হাস্‌বে, কেননা ফাঁকা মিথ্যে দিয়ে ভরা ঝুলি তাদের ফেটে পড়তে চায়, তোমার ঝুলি একেবারেই খালি, এক আনা সোনা কোন্ এক কোণে মিলিয়ে থাকলেও ভারিত্বে সে সেই মিথ্যের চেয়ে বেশী বই কম নয়। হাসে তারা—হাসুক, তুমি যা পেয়েছ, সেই খাঁটি জিনিষ। হ্যাঁ, কাউকে নির্ভর ক'রে দাঁড়াতে যেয়ো না, কাউকেই বিশ্বাস করো না। আগে বিচার কর, তর্ক কর, মন যখন সায় দেবে, তখন তাকে বিশ্বাস করবে —সায় দেবে। এই যে তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাস, শিক্ষা ও সংস্কার, এই দুই বস্তু তোমার হৃদয় মন্থন করছে, এরপর একদিন কুড়িয়ে পাবে আসল জিনিসটা, সেই সত্য—সেইদিনে চিনবে। নির্ভরতা আসবে বই কি মা! চির নাস্তিক, চির অবিশ্বাসীও আস্তিক হয়, বিশ্বাসী হয়, তুমি হ'তে পারবে না এমন কি কথা আছে? যখন আসল জিনিষ পাবে বুক যখন পাওয়ার আনন্দে ভ'রে উঠবে—নির্ভরতা আসবে তখন। এখনই তা পাওয়ার জন্যে কেন মা তোমার এত ব্যাকুলতা? এখন শুধু দেখে যাও, বিচার ক'রে যাও, অনেক আসবে—অনেক যাবে, শুধু দেখ —তর্ক কর, তার পর নিয়ো।"

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে স্বপনের মুখখানা তৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ভবানীপ্রসাদের কথা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সে কথাগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া নূতন হইয়া তাহার কানে বাজিতেছিল।

তাহার চিন্তাপূর্ণ মুখের পানে তাকাইয়া ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাবছ কি স্বপন?"

স্বপন বলিল, "ভাবছি জ্যেঠামশায়, ভগবান্ তো একই, সবাই সেই একই বলে, কাকাও তাই বলেন। তিনি এই পুতল-পূজাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, মুখে বলতেও ভয় পান না। আপনিও বলেন, ভগবান্ একই, তবে নানা আকারে মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা করা হয় কেন? মুখে আমি যাই বলি না জ্যেঠামশায়, মনে বাস্তবিকই দ্বিধা জাগে। মনে ভাবি, ভগবান্ কেবল মাটির পুতুলের মধ্যেই এসে থাকেন না, তবে এই নানা রকম মূর্ত্তি গড়িয়ে স্বতন্ত্র মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কেন পূজা করা হয়?"

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আরও একদিন এ প্রশ্ন করেছিলে, কিন্তু সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজে পাইনি। কি করে উত্তর দেব মা—বিন্দু আকারে ভগবান্‌কে দেখতে গিয়ে দেখি, বিশ্বময় তাঁর রূপ, ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে তিনি বদ্ধ হয়ে নেই, অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। ক্ষুদ্র আমি, সে অসীম রূপকে ধারণা করা কি আমার ক্ষমতায় কুলায় মা? আমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তখন দেখ্‌ছিলুম, সেই অসীমের অসীম অনন্ত রূপ। পূজো করতে পারিনি,—কথা বলতে পারিনি,—প্রার্থনা করতে পারিনি, শুধু নিষ্পলকে চেয়েছিলুম,—শুধু দেখছিলুম। রাণী আমার, ক্ষুদ্র মানুষ হঠাৎ কি অসীমকে ধারণা করতে পারে? আগে এতটুকুকে আয়ত্ব করতে হয়;—আগে শিশুকে বর্ণশিক্ষা দিতে হয়, তারপর তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। ইউনিভার্সিটীর

ডিগ্রি যেমন কেউ লাফিয়ে পড়ে নিতে পারে না, ভগবানের অসীম রূপকেও তেমনি কেউ ধারণা ক'রে উঠতে পারে না। বিশ্বজোড়া রূপের ধারণা করা বড় কঠিন মা, কেউ কি লাফিয়ে তেতালার ছাদে উঠতে পারে? এক দুই ধাপ করে কতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে তবে লোকে তেতালায় গিয়ে পৌছায়,—কেমন? সকলেই কি প্রথমে আত্মজ্ঞানী হতে পারে স্বপন, অথচ প্রায় সকলেই জানে আত্মামাত্রই শিব,—তবু তারা বাইরে পূজার আড়ম্বর করে। স্নেহময়ী মায়ের মূর্ত্তি সন্তানের কাছে বড় পরিচিত, তাই সে মায়ের মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা করে। তারপর ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে সে উঠ্‌তে আরম্ভ করে, শেষটায় অসীমের রূপ ধারণা কর্‌বার শক্তি তার হয়, নিজের মধ্যেই অসীমের সত্ত্বা সে অনুভব কর্‌তে পারে। এই পুতুলপূজার মধ্যে দিয়েই তারা পথের সন্ধান পায় মা, বুকের মধ্যে আলোর রেখা দেখ্‌তে পায়, সেই আলোয় তারা বাইরে অনেকদূর দেখ্‌তে পায়। তারাও জানে মা, এ পুতুল শুধু খড়-মাটি দিয়ে তৈরী, তবু সব বুঝেও আনন্দে ভরে উঠে। একভাবে সন্তানকে সাজিয়ে মা তৃপ্তি পান না, নানা ভাবে সাজিয়ে দেখে চোখের তৃপ্তি লাভ করেন। ভক্তও একভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে সাজিয়ে তৃপ্তি পায় না, নানা ভাবে নানা রকম ক'রে গড়ে' পূজা করে, এতেই তৃপ্তি পায়। মা, ভগবান্ যদি প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, মাটির মধ্যেই বা না আস্‌তে পার্‌বেন কেন?"

স্বপন একটুখানি নীরব রহিল, তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু জ্যেঠামশাই, এই যে পূজায় বলি দেওয়া—"

ভবানীপ্রসাদ উৎসাহভরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এই আর একটা কথা বলছে বটে। চণ্ডী পড়েছ কি?"

স্বপন মাথা নাড়িল,—"না, জ্যেঠামশাই।"

ক্ষুব্ধভাবে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "দেশের যা—তা পড়ে, থাকে মা, তোমারা বিদেশের ইতিহাস মুখস্থ ক'রে মর। চণ্ডী যে তোমাদেরই দেশের বই মা, অন্ততঃ পক্ষে পড়ে দেখাও দরকার, এতে পুরাকালের অনেক কিছুই জানা যায়। চণ্ডীর মধ্যে বলির দরকার হয়েছিল, সুরথরাজা বলি দিয়েছিলেন। কিন্তু মা, বলি বলাতে কতকগুলি নির্দোষী জীবকে যে দেবতার সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে কেটে সেই রক্ত দেবতাকে দিতে হবে একথা আমি বুঝিনে। আমি বুঝি—মানুষের মনের ছয়টা রিপুকে মায়ের চরণে বলি দেওয়ার কথা, যাতে আমাদের মধ্যে রিপুর দৌরাত্ম্য বাড়তে না পায় সে চেষ্টা করা। বলিপ্রথা শাস্ত্রে আছে বটে, কিন্তু সে—সে বলি নয় মা, আমাদের রিপু বলি দেওয়া।"

ভাবাবেশে তিনি খানিক নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার এই জ্যেঠামশাই কিন্তু বরাবরই এমনি ছিল না মা, একদিন এই জ্যেঠামশাইও কসাইয়ের অধম ছিল, জীবের কষ্ট দেখে এতটুকু কষ্ট পাওয়া দূরে থাক্, অসীম আনন্দই পেত। কিন্তু থাক্ সে অতীত কাল, সময় হ'লে সবই জানতে পারবে। আমায় আর কতদিন এখানে আটক করে রাখতে চাও মা?"

ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বপন বলিল, "বেশীদিন আপনি তো আসেন নি জ্যেঠামশাই?"

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "সেও তো মা দেড়মাস হয়ে গেছে। আমার কত কাজ পড়ে আছে, কিছুই যে শেষ হ'ল না। দিনও সংক্ষিপ্ত হয়ে আস্‌ছে, এখন যত তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে পারি, ততই ভাল।"

স্বপন রাগ করিয়া বলিল, "তা যান্ না আপনি, আপনার যখন ইচ্ছে হবে তখনই চলে যাবেন।"

গম্ভীরভাবে ভবনীপ্রসাদ বলিলেন "এটা মা তোমার অভিমানের কথা। বুড়োর চোখে ধুলো দিতে পারবে না মা, বুড়ো সব দেখতে পায়। তোমায় তোমার আসনে বসিয়ে আমি নিশ্চিন্তভাবে চলে যাব।"

স্বপন কি ভাবিল, বলিল, "চলুন না জ্যেঠামশাই, একবার দেশে যাই?"

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আমিও তাই ভাবছি মা, চল, তোমায় তোমার আসনে বসিয়ে দিয়ে যাই, তারপর আমার ছুটি।"

স্বপন বলিল, "ছুটি বলতে পারবেন না জ্যেঠামশাই, আপনাকে আবার আস্‌তেই হবে, কোথাও টিকে বেশীদিন থাকতে হবে না।"

ভবানীপ্রসাদ একটু হাসিলেন।

৬

হঠাৎ টেলিগ্রাফখানা পাইয়া হরেন্দ্রনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

টেলিগ্রাফ করিয়াছে স্বপন, সে আজ সন্ধ্যার ট্রেণে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে, হরেনবাবু যেন ষ্টেশনে থাকেন।

"ভাল বিপদ হয়েছে এই খামখেয়ালী মেয়েটাকে নিয়ে।"

বিরক্তভাবে হাতের কাজ সব ফেলিয়া হরেনবাবু উঠিয়া পড়িলেন। আর বিলম্ব করা চলে না,—অবিলম্বে আদেশ প্রচার হইয়া গেল—আজ

জমিদার বাবুর একমাত্র কন্যা, এই জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী আসিবেন, বাড়ী ঘর, পথ ঘাট সব পরিষ্কার করা চাই।

বাড়ীর ব্যবস্থা ঠিক করিয়া, সন্ধ্যার সময় হরেনবাবু কয়েকজন আমলা, পেয়াদা ও পাল্কী-সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

শুক্লা-দশমীর শুভ্র চাঁদখানা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, দুলিতে দুলিতে অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের শুভ্রতাও বাড়িয়া উঠিতেছিল, সমস্ত গ্রামখানার বুকে সে শুভ্র আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আকাশে তখন একটী দুইটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চাঁদের শুভ্র আলোয় তাহাদের দীপ্তি নিষ্প্রভ মলিন।

কলিকাতার ট্রেণখানি হস্ হস্ করিয়া আসিয়া পড়িল। ব্যস্তভাবে হরেন্দ্রনাথ সঙ্গীগণ-সহ অগ্রসর হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সাহায্য করিবার অনেক আগেই স্বপন নামিয়া পড়িল, তাহার পিছনে নামিলেন ভবানীপ্রসাদ। আর কাহাকেও সে সঙ্গে আনেনাই।

সকলকে অভিবাদন করিয়া স্বপন হাসিমুখে বলিল, "আপনি হঠাৎ আমার টেলিগ্রাফখানা পেয়ে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন, না কাকা? হঠাৎ এমন ভাবে কেবল মাত্র জ্যেঠামশাইকে সঙ্গে ক'রে আস্‌তে দেখে আপনি কোন কারণ ঠিক করতে পারেননি বোধ হয়।"

হরেন্দ্রনাথ শুধু হাসিয়া বলিলেন, "জানি এ পাগলীর একটা খেয়াল মাত্র, তাই আশ্চর্য্য হইনি। আসুন ভবানীবাবু,—নমস্কার।"

ভবানীপ্রসাদও নমস্কার করিলেন,—"নমস্কার।"

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ আলোকদীপ্ত নিস্তব্ধ শান্ত পল্লীখানির পানে তাকাইয়া উৎফুল্লকণ্ঠে স্বপন বলিয়া উঠিল, "বাঃ, কি সুন্দর! জ্যোৎস্নার শাদা

আলো এই পল্লীগ্রামের খোলা মাঠে, গাছের পাতায়, ঝোপের 'পরে পড়ে' কিরূপই না ফুটিয়ে তুলেছে। হাজার ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিয়ে দিলেও কি স্বভাবের এমন রমণীয় সৌন্দর্য্যের তুলনীয় হ'তে পারে? সেটা যে কৃত্রিম, তাতে যে প্রাণ নেই। কৃত্রিম কোন কালেই অকৃত্রিমের সৌন্দর্য্য লাভ কর্‌তে পারে না, তা সে যতই কেন না সুন্দর হোক। আপনি বলেছিলেন না কাকা, পল্লী ভারি জঘন্য স্থান, দেখবার মত সেখানে কিছু নেই? এমন জিনিষ সহরে কখনও দেখতে পাওয়া যায় বলুন দেখি?"

হরেনবাবু বলিলেন, "সে কথা এখনও বল্‌ছি মা, এ নূতন কথা তো নয়। হঠাৎ চাঁদের আলোয় ধোয়া পল্লীর মাঝখানে এসে পড়েছ, যতদিন চাঁদের আলো থাক্‌বে এর নূতনত্বের মোহও ততদিন থাকবে, তারপর যখন অন্ধকার নেমে আসবে মা, দেখবে তখন কি নিবিড় অন্ধকারই মিশে থাকবে এর বুকে। একঘেয়ে এই পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য কিছুই তখন তুমি পাবে না, এখানে বাস করাই তখন দুঃসহ হ'য়ে উঠবে। চাঁদের আলো কয়েকটা দিন পরেই মিলিয়ে যাবে, তখন জমাট বাঁধা সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বুকের রক্ত তোমার জমাট বেঁধে যাবে; সে অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর দীপ্তি দেখ্‌তে পাবে না।

ভবনীপ্রসাদ ধীর স্বরে বলিলেন, "অন্ধকারের বুকে আলোর রোশনাই আছে হরেনবাবু, ভগবানের সৃষ্ট জোনাকী পোকাগুলা সেই অন্ধকারের বুকে লক্ষ লক্ষ আলোর বিকাশ করে তোলে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু সে আলো এত অল্প ভবানীবাবু, যে সে আলো তাকে পর্য্যন্ত আলোকিত করতে পারে না, সীমার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতাটুকু নেই। সে আলো কোনদিন কোন

প্রাণীকে পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারেনি, দিশেহারাই করে দেয়। এস মা, এই পাল্কীতে ওঠ।"

পাল্কীর আকৃতি দেখিয়া স্বপনের হাসি আর চাপা থাকে না, মুখে রুমাল চাপা দিয়া কোনমতে হাসিটাকে চাপা দিয়া সে বলিল, "আমি এতে উঠ্‌তে পারব না কাকা, আপনাদের সঙ্গে হেঁটেই যাব।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা কি হয় মা, এক মাইল পথ—হাঁটা যতটা সোজা মনে করছ ততটা সোজা নয়।"

স্বপন জোর করিয়া বলিল, "মাত্র একমাইল পথ বই তো নয় কাকা, খুব হাঁট্‌তে পারব। এমন জ্যোৎস্না মাখা রাত, হাঁট্‌তেই বড় সুন্দর। পাল্কীর মধ্যে যেতে গেলে আমি কিছু দেখ্‌তে পাব না, আমি হেঁটেই যাব।"

হরেন্দ্রনাথ বলিতে গেলেন, "পথ ভাল নয়—"

বাধা দিয়া স্বপন বলিল, "তা হোক্ না, আমার তো খালি পা নয় কাকা, যে পায়ে লাগবে। কি বলুন জ্যেঠামশাই, পায়ে যখন জুতো রয়েছে, তখন আর কি!"

উদাসভাবে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বেশ, চল।"

তিনি একটু অগ্রসর হইয়া পথ-প্রদর্শকরূপে চলিলেন, মাঝে ভবানী-প্রসাদের পার্শ্বে স্বপন চলিল, পশ্চাতে অন্য সকলে চলিল।

দূরে কোন গাছের আড়ালে গা লুকাইয়া একটা পাপিয়া সেই জ্যোৎস্না-বিকসিত রজনীকে আরও মধুময় করিয়া তুলিতে ডাকিতেছিল—"চোখ গেল, চোখ গেল।" নিস্তব্ধ পল্লীর বুকে পাখীটির গান বড় সুন্দর শুনাইতেছিল, আনন্দে স্বপনের বুক পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। আজ পিতার জন্মভূমি, নিজের জন্মভূমি এই পল্লীবক্ষে পদার্পণ করিয়া

মুগ্ধনেত্রে এই অপূর্ব্ব অনতীত সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া তাহার মনে হইতেছিল—তাহার জন্ম সার্থক হইয়াছে, সে জননী—জন্মভূমির কোলে ফিরিতে পাইয়াছে। এখানে তাহার মা ঘুমাইয়া আছেন, তাহার পিতার আত্মা এইখানেই আসিয়াছে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথের মাঝে মাঝে পথের পার্শ্বস্থ গাছের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; বাতাসে গাছ কাঁপার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও কাঁপিতেছে।

জ্যৈষ্ঠমাসের অসহ্য গরমে সহরবাসী এ সময়ে অতিষ্ঠ, পল্লীগ্রাম শান্ত-শীতল। ঝর্ ঝর্ করিয়া মৃদু বাতাস বহিয়া যাইতেছিল, তাহার শীতল স্পর্শে স্বপনের কপালের ঘাম কখন শুকাইয়া গিয়াছিল। পথে চলিতে চলিতে অদূরবর্ত্তী ঘন ঝোপের মধ্যে শৃগালদের উগ্র চীৎকার কানে আসিল। অপরিচিত জন্মস্থান; নিজেদেরই বাড়ীতে সেই সময় রাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিতেছিল, পল্লীর নিস্তব্ধ জড়ভাব এই শব্দে কতকটা দূর হইয়া গিয়াছিল।

বাড়ীতে ছিলেন স্বপনেরই দূর-সম্পর্কীয়া এক মাসিমা। আপনার সন্তান-সন্ততি লইয়া তিনি একা এই বাড়ীতে এতকাল অবধি কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। আজ স্বপন আসিতেছে, পাছে তাঁহার কর্ত্তৃত্বপদটা নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জানকীনাথ এখানে আসিয়া বাস করিতেন বটে, কিন্তু তিনি পুরুষ, তাঁহার সম্পর্ক ছিল বাহিরে, ভিতরের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। স্বপন তো সেরূপ থাকিবে না। সে যাহাই হোক—মেয়ে তো বটে, ভিতরের দিকে সে চাহিতে ভুলিবে না। তখন কি হইবে, ইহাই ভাবিয়া মাসিমা মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।

স্বপন ভিতরে আসিল। দাসী মাসিমার পরিচয় দিবার সঙ্গে সে

যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, তখন তিনি আড়ষ্ট হইয়া এই অপরিচিতা বোন্‌ঝিটীর পানে তাকাইয়া রহিলেন।

এই মেয়েটির নামই তিনি শুনিয়াছেন, চাক্ষুষ ইহাকে কখনও দেখিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। আজ দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হইয়া গেলেন। সর্ব্বনাশ,—এত বড় মেয়ে, এখনও বিবাহ হয় নাই? ইহারই মধ্যে তিনি চকিতে মনে মনে তাহার বয়সের হিসাবটাও করিয়া লইলেন। বয়সও তো বড় কম নয়, একুশ-বাইশ হইল যে! তাঁহার বড় মেয়েটির বয়সও একুশ-বাইশ, সে চারিটী সন্তানের জননী।

স্বপনের পায়ের জুতার দিকে দৃষ্টি পড়িতে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল,—ছি ছি, একি খৃশ্চান নাকি? হিন্দুঘরের মেয়ে কখনও জুতা পায়ে দেয়, এতো তিনি শুনেন নাই। খৃশ্চানদের স্কুলে থাকিত বলিয়াই জানকীনাথ তাহাকে কোনদিন দেশে আনেন নাই।

শুদ্ধাচারিণী বিধবা তিনি, হতাচারিণী বোন্‌ঝির স্পর্শে তিনি যেন অপবিত্রা হইয়া গেলেন, তিনি অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে একপাশে সরিয়া বসিলেন। মনের ভাব মনে রাখিয়া চোখের জল ফেলিয়া তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দুই চারিটী কথার মধ্য দিয়াই তিনি স্বপনকে বুঝাইয়া দিলেন, জানকীনাথ অনেক করিয়া তাঁহাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার হাতে সংসারের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি যখনই এখানে আসিয়াছেন, তখনই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—কেননা মাসিমা না থাকিলে সংসার কখনই এমন সুশৃঙ্খলার সহিত চলিত না, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

স্বপন আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "এখনও আপনি তেমনিই থাক্‌বেন মাসিমা! বাবা নেই বলে যে আপনি চলে যাবেন তা হবে না। আমি আপনার মেয়ের মত, আমার ভারও আপনাকে নিতে হবে। আপনি যতটা ভার বইতে পার্‌বেন, আমরা তার শতাংশের এক অংশও বইতে পারব না।"

মেয়েটীর বিনয়নম্র কথাবার্ত্তায় মাসিমা খুসী হইয়া উঠিলেন,—কেবল একটু খোঁচা রহিয়া গেল—জুতা পায়ে দেওয়া।

পিতা দ্বিতলে যে কক্ষটীতে এখানে আসিয়া থাকিতেন, স্বপনের জন্য সেই কক্ষটী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। হরেনবাবুর এ বাড়ীর সদরে-অন্দরে অবাধগতি ছিল,—স্বপনকে চারিদিক দেখাইয়া শুনাইয়া অবশেষে তাহাকে যখন সেই কক্ষের সম্মুখে আনিলেন, তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রান্ত ভবানীপ্রসাদ পার্শ্বের গৃহে শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হরেনবাবু বলিলেন, "এই ঘরটীতে তোমার বাবা থাক্‌তেন স্বপন, কখনও এ ঘর ছেড়ে অন্য কোন ঘরে থাকতে পারতেন না। সাত আট মাস আগে পূজার সময় তিনি এই ঘরটীতে শেষ শুয়ে গেছেন, আজ তাঁরই এখানে ফিরে আসার কথা ছিল।"

স্বপনের হু'টী চোখ ধীরে ধীরে জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, সে অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া চাপাস্থরে বলিল, "বাবা সব চেয়ে তাঁর দেশকেই ভালবাসতেন কাকা। তিনি বলেছিলেন, আমার বি-এ একজামিনেশান্ শেষ হ'য়ে গেলে আমায় সঙ্গে ক'রে দেশে আসবেন। একজামিনও দিলুম, বাবাকেও হারালুম। বড় আশা ছিল, বাবার সঙ্গে এসে দেশের সঙ্গে পরিচিত হব, তা আর হ'ল না।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেনবাবু বলিলেন, "এখন সে সব কথা তুলে আর লাভ নেই। আজ তুমি নিজের জন্মভূমিতে এসেছ, এই ভেবে মন প্রফুল্ল কর্‌বার চেষ্টা কর। এগারটা বেজে গেছে, আর রাত জেগো না, শুয়ে পড়। কাল সকালে আরও ঢের কাজ আছে, সকাল সকাল উঠ্‌তে হবে।"

তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। দাসী দরজার কাছে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে একসময়ে ঢিপ্‌ করিয়া কাৎ হইয়া পড়িল, অন্যমনস্কা স্বপন সেই শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিল।

দেয়ালের আলো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল, সমস্ত গৃহখানি সেই উজ্জ্বল আলোয় দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একপাশে একটী মার্ব্বল-পাথরের গোল টেবল, তাহার উপর একখানি বড় অয়েলপেণ্টিং। দুধারে দুইটী ফুলদানীতে সাত আট মাস পূর্ব্বের শুষ্কফুলগুলি এখনও পড়িয়া আছে। প্রতিমূর্ত্তির পদতলে সাত আট মাস পূর্ব্বে যে বসরাই গোলাপের মালাগাছি অনুপমেয় সৌন্দর্য্য ও গন্ধ লইয়া শোভা পাইয়াছিল, কালের পরশে তাহা আজ সৌন্দর্য্যহীন ও গন্ধহীন হইয়া গিয়াছে।

এ তাহার স্বর্গগতা জননীর মূর্ত্তি। স্বচক্ষে সে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই, ফটোতে দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছে, মায়ের বিবাহের সময়কালে একখানি ফটো তাহার কাছে আছে, তাহার পরের ফটো সে পায় নাই।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস স্বপনের বক্ষভেদ করিয়া উঠিল। কাল সে মায়ের এই আয়ুষ্মতী মূর্ত্তির পাশে পিতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বহস্তে ফুল দিয়া সাজাইবে, ফুলের মালা গাঁথিয়া দুলাইয়া দিবে। সে পিতা-মাতার চরণে অর্ঘ্য দিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে, শান্তি পাইবে।

স্বপন নতজানু হইয়া বসিয়া পিতামাতাকে প্রণাম করিল, শক্তি প্রার্থনা করিল, তাহার পর উঠিল।

দেয়ালের আলো যখন সে নিভাইয়া দিতেছিল, তখন দাসীর নিদ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল, সভয়ে শশব্যস্তে সে উঠিয়া পড়িল,—"আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি।"

মিষ্ট সুরে স্বপন বলিল, "তুমি ঘুমোও বাছা, আমি নিভিয়ে দিচ্ছি।"

আলো নিভাইয়া দিয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। এতক্ষণ গৃহ-মধ্যে উজ্জ্বল আলো থাকায় চাঁদের শুভ্র আলো যে মেঝের কতটা স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় নাই; আলো নিভাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের উপর চাঁদের আলো হাসিয়া উঠিল। খোলা জানালা-পথে নীচের বাগান হইতে প্রস্ফুটিত হেনার গন্ধ বাতাসে গৃহমধ্যে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। প্রাসাদপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা শীর্ণা নদীর সুমিষ্ট কুল্ কুল্ সুর নিস্তব্ধ রাত্রিতে অতি স্পষ্টভাবে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সকল মধুর মৃদুশব্দ ডুবাইয়া পাপিয়ার কলগীতি আজিকার এই জ্যোৎস্নাসিক্ত সুন্দর যামিনীকে আরও তৃপ্তিদায়ক, মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল।

কান ভরিয়া নদীর কুল্ কুল্ গান, পাপিয়ার ঝঙ্কার শুনিতে শুনিতে, হেনার গন্ধ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে করিতে স্বপন কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর চাঁদ দোলা খাইতে খাইতে পশ্চিমে নামিয়া গেল, পাপিয়ার কলগান থামিয়া গেল, বুঝি সে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল একটানা সুরে গাহিয়া চলিল নদী, আলো বা অন্ধকারে এ সুরের বিরাম ছিল না।

৭

পূর্ণিমা আসিয়া পড়িল।

ভবানীপ্রসাদ বিদায় চাহিলেন, স্বপন আর বাধা দিতে পারিল না, বিমর্ষভাবে শুধু তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর আসবেন না জ্যেঠামশাই?"

একটু হাসিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "এমন কথা কি বল্‌তে পারি মা? আবার আসব বই কি, তুমি ডাকলেই হয় তো আমায় ছুটে আসতে হবে। একটা কথা ব'লে যাই মা! বিপদে প'ড়ে যেন আত্ম-হারা হ'য়ো না, মূল হারিয়ো না। অনেক ঝড় আসবে, তুমি অটল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকো, যেন ভেঙ্গে পড়ো না। যা আসছে আসুক, যাচ্ছে যাক, তার জন্যে অনর্থক নিজেকে চঞ্চল করো না, মনে রেখো—শূন্য হাতে এসেছ, শূন্য হাতে ফিরে যাবে। এ পরীক্ষার জায়গা, এ পরীক্ষায় জয়ী হওয়ারই চেষ্টা কোরো, সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যেন হার স্বীকার ক'রো না। আমার উপর অতটা নির্ভর করো না, মানুষ আমি, কত-টুকু ক্ষমতা আছে আমার? ভগবানের উপর নির্ভর করো। মনে রেখো,—বিপদ আসে মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তুলবার জন্যে,—তার খাদটুকু পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলে তাকে খাঁটি সোণা করে দেয়।

স্বপনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভবানীপ্রসাদ চলিয়া গেলেন, হরেন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বপনের অগোচরে বলিলেন, "যাক্ বাঁচা গেল। ভণ্ডামী করবার উপযুক্ত স্থান পেয়েছিল বলেই না—"

বৃদ্ধ বাস্তবিকই বড় চতুর, তাহার চোখে ধূলা দেওয়া বড় শক্ত।

স্বপন যদিও শিক্ষিতা, তথাপি জমীদারী সংক্রান্ত কাজ সে কিছুই বুঝে না, হরেন্দ্রনাথ তাহাকে যাহাই বুঝাইবেন সে তাহাই বুঝিবে। ভবানী-প্রসাদকে বুঝান বড় কঠিন। তিনি সম্মুখে আসিলেই হরেন্দ্রনাথ থতমত খাইয়া যাইতেন, কথা যেন যথেষ্টরূপে তাহার মুখে ফুটিতে চাহিত না। এরূপ হইবার কারণ তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। ভবানীপ্রসাদকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না, সকলের সম্মুখে খুব দৃঢ়তার সহিত এই কথাই তিনি বলিয়া আসিতেন, কিন্তু সম্মুখে তাঁহাকে দেখিলেই তিনি মুস্ড়াইয়া পড়িতেন।

স্বপনের একজামিনের ফল বাহির হইল, দেখা গেল সে বিশেষ প্রশংসার সহিত বি-এ পাশ করিয়াছে। এ সংবাদ পাইয়া স্বপন যতটা খুসি হইবে ভাবিয়াছিল ততটা খুসি হইতে পারিল না। আজ তাহার মনে হইতেছিল, সবই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, এই একজামিনে পাস হওয়ার মধ্যে সার্থকতা সে এতটুকু লাভ করিতে পারে নাই। এতদিন সে মিথ্যা লইয়াই কাল কাটাইয়া দিয়াছে, সত্য কাজ কিছু করে নাই। দূর অতীতের পানে সে ফিরিয়া চাহিল। রাশি রাশি বই সুধু পড়িয়াই গিয়াছে, নোট করিয়াছে, কিন্তু কত ডাক যে আসিয়া তাহার রুদ্ধদ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছে,—সে শুনে নাই।

হরেন্দ্রনাথ মহা আনন্দে একটী ভোজ দিবার প্রস্তাব করিলেন; ইহাতে শুধু গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরাই নিমন্ত্রিত হইবেন, তাঁহাদের নাম তিনি একখানা কাগজে ইতিমধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে লিখিয়াও ফেলিলেন।

স্বপন কিছুতেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিল না। হরেন্দ্র-নাথ এই নিমন্ত্রণ ব্যাপার লইয়া যখন উন্মত্ত হইয়াছেন, তখন সে তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিল, "একি ছেলেমানুষি কাজ করেছেন কাকা?"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি ছেলেমানুষি দেখ্‌লে?"

গম্ভীরভাবে স্বপন বলিল, "এই কতকগুলো লোক খাওয়ানো?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "একে কি তুমি ছেলেমানুষি বল স্বপন? এ দেশের রাণী তুমি, অথচ কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় এখনো হয়নি। তুমি একজামিনে পাস হয়েছ—এই উপলক্ষে এখানকার ভদ্রলোকদের একদিন নিমন্ত্রণ করে তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিই—এই আমার উদ্দেশ্য। প্রজা ও জমীদারের নিকটতম সম্পর্ক—বিশেষ যখন তুমি ওদের কাছে এসেছ।"

শান্তমুখে স্বপন বলিল, "আপনার কথা আমি সবই মেনে নিচ্চি কাকা, কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার মত আছে। আপনি যে তালিকা তৈরী করেছেন, এঁরা ছাড়া আমার আর কি প্রজা নেই?"

হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আছে বই কি মা! এঁরা কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক বলেই—"

বাধা দিয়া স্বপন বলিল, "ওই খানেই তো বুঝতে ভুল করলেন কাকা! প্রজা বলতে শুধু এঁরাই তো নন্, যারা অশিক্ষিত ছোটলোক, তারাও আমার প্রজা, আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা তারাও করে। আমি এদের সবারই সঙ্গে কথা বলতে চাই কাকা, সকলকেই সামনে দেখতে চাই, আপনি যাঁদের নিমন্ত্রণ করেছেন এঁরা সবই বিদেশবাসী, দেশের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কতটুকু বলুন দেখি, দেশের কথা এঁরা কতটুকু জানেন? আমি চাই তাদের—যারা দেশের মানুষ, দেশেরই যারা রয়ে গেছে, প্রজা আমি তাদেরকেই বলি। যারা দেশের এতটুকু উপকারের জন্যে একটা আঙ্গুল কখনই তোলে না, উপরন্তু নির্দ্দয়ভাবে পা

ফেলে বুক ডলে' দিয়ে যায়, তাদের আপনি দেশবাসী ভাবতে পারেন কাকা, কেননা তাদের অর্থ আছে। আমি কিন্তু অর্থের পানে চেয়ে তাদের দেশবাসী ব'লে ভাবতে পারব না। আমায় যদি প্রজাদের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় করিয়ে দিতে চান, তবে এই সব ধনীদের বাদ দিন, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোক যারা—তাদের নিমন্ত্রণ করুন, আমি তাদের নিজের হাতে খাইয়ে ধন্য হ'য়ে যাই।"

হরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

গম্ভীরস্বরে স্বপন বলিল "আপনি কি বাবার মুখে শোনেন নি কাকা, দরিদ্রই নারায়ণ, ভগবান দীনের মধ্যে নিজের প্রকাশ করেছেন, ধনীর মাঝে প্রকাশ হতে পারেন নি? বাবা আমার দরিদ্র-সেবাকেই জীবনের মহাব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, আজীবন ক'রে গেছেনও তাই। বাবা ধনীর মাথায় তেল ঢাল্‌তে যেতেন না, ধনীকে অপদার্থ বলে তিনি ঘৃণা করতেন, দরিদ্রকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন, নিজের সর্ব্বস্ব দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় উৎসর্গ করে গেলেন। যাদের চাষা ব'লে ঘৃণা করেন, সেই চাষারাই দেশের মেরুদণ্ড; এরা দেশকে আঁকড়ে ধ'রে আছে বলেই দেশ আজ দেশ, নইলে দেশের অস্তিত্ব থাকৃত কি? আপনি প্রকৃত দেশবাসীকে বাদ দিতে যাচ্ছেন কাকা, আপনার এ প্রস্তাব আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারলুম না।"

শুষ্ককণ্ঠে হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি সব নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি যে।"

স্বপনের মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, সে ভ্রূহ'টি কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমায় কিছু না ব'লে আগেই এদের সব নিমন্ত্রণ করে ফেলেছেন? একবার আমার মতটা লওয়াও আপনি উপযুক্ত মনে করেন নি?"

হরেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি আরক্তিম মুখ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্বপন বলিল, “যা করেছেন তা আর ফিরান যাবে না। এক কাজ করুন, আয়োজন বেশী করে করুন, শুধু ধনীদের খাওয়ালে চলবে না, এই গ্রামের কৃষকসম্প্রদায়কেও খাওয়ান চাই।”

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া হরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “এই সব চাষা লোকদের দোর দোরে এখন নিমন্ত্রণ করে আমায় ফির্‌তে হবে?”

স্বপন একটু হাসিল, স্থিরকণ্ঠে বলিল, “ছোটলোক কাদের বলছেন কাকা? যারা চাষ করে খায়, দিনমজুরী করে দিন গুজরান করে, তাদের আপনি ছোটলোক বলতে পারেন কি? নীচ বংশে জন্মালেই নীচ হ'তে হয় আর ভদ্রবংশে জন্মালেই ভদ্র হতে হয় এমন কোন কথা নেই। যাদের ছোটলোক বলে ঘৃণা করছেন, তাদের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তাদের মধ্যে সরলতা—পবিত্রতা আছে। তারা শিক্ষা পায় নি, শিক্ষা পেলে তারাও মুখে আবরণ টেনে দিত, তারাও আত্ম-গোপন কর্‌তে পার্‌ত। এই ছোটলোকদের ঘৃণা ক'রে তফাতে রাখবেন না কাকা, জানবেন দেশের আঁধার বুকে এরাই আলো জ্বালিয়ে রাখে নিজেদের বুকের রক্ত দান ক'রে'। এরা যদি না থাকত, দেশ-যন্ত্র অচল হয়ে যেত, আপনার ধনীলোকেরা মাথায় হাত দিয়ে বস্‌তেন। এরা খাটছে, যন্ত্র চালাচ্ছে—তবে যন্ত্র চল্‌ছে এটুকু মনে রাখবেন আপনি সকল রকম আনন্দ উৎসব হ'তে ছোটলোক বলে ঘৃণা ক'রে এদের পেছনে ফেলে এসেছেন, কিন্তু অন্তরের পানে চেয়ে—সত্যের পানে চেয়ে তারই খাতিরে একবার বলুন দেখি কাকা, আপনি এই ছোটলোকদের দ্বারাই বেশী উপকার পাননি কি? এরাই

আপনার ডাকে সকল ফেলে পেছন পানে না তাকিয়ে এগিয়ে আসে না কি ?”

“সত্য কথা বল্‌ছেন দিদিমণি, ঠিক আমার মনের মত কথা।”—

পর্দ্দা সরাইয়া একটী তরুণ যুবক প্রবেশ করিল, বয়স তাহার আঠার-উনিশ বৎসর হইবে।

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল, “এই যে, তুমি এসেছ সতীনাথ, বসো—কথা আছে।”

সতীনাথ হরেন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল। স্বপনের সঙ্গে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, দিদিমণি সম্পর্ক পাতাইয়া এই তরুণটী বাহিরের আড়ম্বর নমস্কারের ব্যাপার তুলিয়া দিয়াছিল।

হরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া সতীনাথ বলিল, “আস্‌তে আস্‌তে কতক কথা আমি শুনতে পেয়েছি। আপনি চাষাদের নিমন্ত্রণ কর্‌তে যেতে না পারেন, আমায় সে ভার দিন না, আমি এখনি সকলের কাছে খবর পাঠাচ্ছি। তারা একবার খবর পেলে হয় যে রাণী-মা তাদের স্মরণ করেছেন, দেখবেন—চারিদিক দিয়ে সব ছুটে আসবে। আমায় এ ভার দিন, আমি তাদের ব'লে আসি।”

স্বপন একটু অস্থির হইয়া বলিল, “তুমি ভার নেবে কি রকম ?”

সতীনাথ একটু হাসিয়া বলিল, “তাতে এতটুকু মান খোওয়া যাবে না দিদিমণি। আপনি বলুন না, কত দরিদ্র চাষা ভুষোকে খাওয়াতে পার্‌বেন, আমি দুনিয়ার দরিদ্র চাষা এনে হাজির ক'রে দেব।”

স্বপনের মুখখানার উপর দিয়া মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়া গেল, সে বলিল, “মাপ কর ভাই, দুনিয়ায় দীনদরিদ্রের সংখ্যাই বেশী, আমার এত বড় বাড়ীখানায়—ওই সামনের অত বড় ময়দানটায়—কোথাও

অত লোক ধরবে না। দেশের মধ্যে যারা আছে তাদের খাওয়াতে পারলেই আমি যথেষ্ট মনে কর্‌ব।”

সতীনাথ প্রবল উৎসাহের সহিত বলিল, “আপনাকে তার জন্যে এতটুকু ভাবতে হবে না দিদি। আসুন ম্যানেজার বাবু, আপনি এ দিককার সব বন্দোবস্ত ঠিক ক’রে ফেলুন, তাদের নিমন্ত্রণ করা, তদারক করা, পরিবেশন করা—সব ভার আমার। আমি এখনি তাদের বলতে যাচ্ছি। রবিবারে তো—বেশ, আমি তাই বলে আস্‌ছি।”

যেমন অকস্মাৎ সে আসিয়াছিল, তেমনই অকস্মাৎ উধাও হইয়া গেল।

বয়স তাহার নিতান্ত কম,—বড় চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে সে। সংসারে একটী মাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছাড়া আর কেহই ছিল না, বিধবা এই ভাইটীর খেয়ালে খুসিই হইতেন। খানিকদূর পড়াশুনা করিয়া সে পড়া ছাড়িয়া দিয়া এইরূপে পরের উপকার করিয়া বেড়াইত। এমন কাজ ছিল না যাহা করিতে সে পিছাইয়া যাইত।

এমনভাবে গায়ে পড়িয়া স্বপনের সহিত আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল যাহাতে সকলেই একটু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। দেশের কেহই ভয়ে রাণীর সম্মুখে যাইতে সাহস করে নাই, সতীনাথের হৃদয়ে ভয় ছিল না।

ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ধনী-দরিদ্র সকলেই আসিল। সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং দীন দরিদ্রগণ পরম তৃপ্তিতে আহার করিয়া গেল। আহার-স্থলে স্বপনকে পাইয়া, তাহার মিষ্ট কথা শুনিয়া কৃষক ও দরিদ্রেরা হাতে স্বর্গ পাইয়াছিল, তাহারা হাত তুলিয়া স্বর্গগত জানকীনাথের ও স্বপনের জয় ঘোষণা করিল; তাহাদের অশ্রুপূর্ণ চোখে আনন্দধ্বনি শুনিয়া স্বপনের চোখেও খানিকটা জল আসিয়া দাঁড়াইল।

মাসীমা শরৎকালী আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ওই চাষাগুলোকে আর ভিক্ষুকগুলোকে খাইয়ে কি লাভ হলো বাছা, ও তো মিথ্যে শুধু জলে ফেলেই দেওয়া হল।"

শ্রান্ত স্বপন উত্তর দিল না, সে যেমন টেবিলের উপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উপুড়ভাবে পড়িয়াছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল।

বড় মেয়ে অর্পণা মুখ ভার করিয়া বলিল, "তা মা, যার ধন সে যদি নিজেই হাতে ক'রে জলে ফেলে দেয়, তাতে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে।"

শরৎকালী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "আমার আর তাতে কি বাছা, তবে কথাটা লোকে বল্‌তে আসে তাই বলি। আমরা স্বপনের মাসী হ'য়ে ছেঁড়া কাপড় পরে' বাধ্য হ'য়ে লোকের সামনে বের হই, লোকেরই বা অপরাধ কি—কাজেই তারা দশকথা ব'লে যায়।"

স্বপন সোজা হইয়া চেয়ারখানায় বসিল, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যথার্থই শরৎকালীর কাপড়খানা দু'তিন জায়গায় ছেঁড়া। অবশ্য ভাল কাপড় গোপন করিয়া ফেলিয়া নূতন কাপড় লাভ করার জন্যই যে ছেঁড়া কাপড় পরা—তাহা স্বপন জানে না, আদায়ের জন্য মানুষকে এরূপ প্রবঞ্চনা অনায়াসে করা যায় তাহা সে কখনও জানে না।

সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমাদের কাপড় নেই মাসিমা? আমায় একথা আগে জানালেই হতো, তা হ'লে এতদিন কাপড় এসে পড়তো।"

শরৎকালী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন "কোন্ মুখ নিয়ে বল্‌ব মা, সেইজন্যই বলিনি, বলবার সাহসও পাইনি। তোমার বাবা বেঁচে থাকৃতে—"

"থাক্ থাক্, আমি এখনই ম্যানেজার কাকাকে ব'লে পাঠাচ্ছি, তিনি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে ছয়মাসের তিন জোড়া ক'রে কাপড় আনিয়ে দিন, তারপর আরও আনিয়ে দেওয়া যাবে।"

সে একখানা কাগজে খস্ খস্ করিয়া খানিকটা কি লিখিয়া দাসীকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিয়া আদেশ দিল, "ম্যানেজার বাবুকে দাও গিয়ে।"

তাহারপর শ্রান্তভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া দেখিল, শরৎকালী তখনও দাঁড়াইয়া আছেন।

"আর কি মাসীমা ?"

শরৎকালী বলিলেন, "অনর্থক এদিক ওদিক খরচ ক'রে টাকাগুলো কেন নষ্ট করবে বাছা, তার চেয়ে ওই যে শিবমন্দিরটা ভেঙ্গে পড়ছে ওটা সারিয়ে দিলে কি কাজ হতো না ?"

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ শিবমন্দির ?"

শরৎকালী বলিলেন, "খানিকটে দূরে বাছা, আধক্রোশ খানেক হবে এখান হ'তে। কোন্‌কালে কে এই শিবমন্দিরটা ক'রে শিবপ্রতিমা করে-ছিলেন জানিনে, শুনেছি তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন তিনি ; তারপর তোমার বাবা কতবার সারাবার কথা তুলেছেন তা আর এ পর্য্যন্ত হ'য়ে উঠল না। গেল পূজোর আগে একদিন ওধারটায় বেড়াতে গিয়ে আবার তাঁর মাথায় কথাটা জেগে উঠে, তিনি—শুন্‌লুক নাকি মন্দিরটা নূতন ক'রে গড়ে' তুলবার জন্যে অনেক টাকা তখন ম্যানেজার বাবুর হাতে দেন, মন্দির সারানো তো হয়ই নি, সে টাকাও কি হলো তা জানিনে।"

কৌতূহলাক্রান্ত স্বপন বলিল, "তুমি ঠিক জানো মাসীমা, বাবা ম্যানেজার বাবুকে টাকা দিয়েছিলেন ?"

গালে হাত দিয়া বিস্ময়-স্বরে শরৎকালী বলিলেন, "ওমা, আমি

নাকি তা জানিনে ? তোমার বাবা কোন্ কাজটা করতেন আমায় লুকিয়ে বল দেখি ?"

স্বপন বলিল, "তা আমি জানি মাসিমা, বাবা তোমায় সব কথাই বল্‌তেন। আচ্ছা কতটাকা দেওয়া হয়েছিল, তা তুমি ঠিক জানো কি ?"

যদিও তাহা শরৎকালী সঠিক জানিতেন না তথাপি তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বলিলেন, "জানি বই কি, হাজার দেড় দুই হবে। তার চেয়ে বেশীও হতে পারে কিন্তু একটী আধলা কম নয় !"

হাজার টাকা যে কয় কুড়িতে হয় তাহা কিন্তু তিনি জানিতেন না। স্বপন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, আনন্দিত মনটা তাহার হঠাৎ যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

"কি মা, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

স্বপন শ্রান্তকণ্ঠে বলিল, "বিশ্বাস না হলেও হয়তো করতে হবে মাসীমা, কাল আমি একথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।"

পরদিন সকালবেলা চোখ মেলিতেই স্বপনের মনে গত রাত্রিকার কথাটা জাগিয়া উঠিল, মনটা তাহার দারুণ ঘৃণা ও লজ্জায় অতি মাত্রায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ছি, ছি, এই কথা সে আবার তুলিবে ? এ কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া ? নানা রকমের ছোট বড় আঘাতে হরেন বাবুর ছদ্মবেশটা প্রায় খসিয়া পড়ার মত হইয়াছিল, তাঁহাকে স্বপন কতকটা জানিতে পারিয়াছিল, এই আঘাতটায় তাঁহার বেশ একেবারেই খসিয়া পড়িল, তাঁহার নগ্ন হৃদয়ের পানে চাহিয়া স্বপন যে শিহরিয়া উঠিল।

না, তুচ্ছ টাকা, ইহার জন্য এ কেলেঙ্কারী বাড়াইয়া আর কাজ নাই, যেমন চাপা পড়িয়া আছে তেমনই চাপা পড়িয়া থাক্। পিতাও তো এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য কিছুই করেন নাই। স্বপন কাল ছাড়া জানিতে পারে

নাই হরেন বাবু নির্ব্বিবাদে দেবমন্দিরের জন্য উৎসর্গিত টাকা অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়াছেন। না, এ চাপা দেওয়াই থাক্, খুলিয়া ফেলিয়া কাজ নাই ; এই ঢাকা খুলিবামাত্র দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিবে, হয় তো আরও কত গোপন কথা বাহির হইয়া পড়িবে তাহাও কে জানে। দরকার কি, দিনগুলা এমনিই সচ্ছন্দে কাটাইয়া দেওয়া যাক্, কোনও রূপে জীবন যাপন করিয়া যাওয়া বই তো নয়।

৮

আষাঢ়ের নবীন মেঘ নীলাকাশ ঘেরিয়া সাজিয়া আসিল, পল্লীবক্ষে সে মেঘের কালো ছায়া থম্‌থম্ করিতে লাগিল, কালো মেঘের কোল ঘেঁসিয়া চঞ্চলা দামিনী এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্য্যন্ত ছুটিতে লাগিল, গুরু গুরু নবীন মেঘের আসার বিজয়-বাদ্য বাজিতে লাগিল। নদীর জলে কালো মেঘের কালো ছায়া ভাসিল, স্রোতের সুরে বর্ষার আবাহন-গীতি উঠিল। পল্লীবধূরা গৃহের কাজ ফেলিয়া আগে ঘাটের কাজ সারিয়া লইবার জন্য ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি আনাগোনা করিতে লাগিল।

হরেন বাবু আসিয়া বলিলেন, "মার তো কলকাতায় যাওয়ার সময় হয়ে এলো।"

বারাণ্ডায় রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া স্বপন দেখিতেছিল আকাশে মেঘের খেলা, নীচে নদীর জলে তাহার ছায়া। হরেন বাবুর কথা শুনিয়া চোখ দুইটী ফিরাইয়া তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

হরেন বাবু বলিলেন, "এটা আর বুঝতে পারছ না মা, আকাশে মেঘ দেখছো, বর্ষা নামবে। বাংলার পল্লীগ্রাম বর্ষায় কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধরে,

সেটা আর তোমার দেখে কোনও দরকার নেই, তোমার এখন আস্তে আস্তে কলকাতায় সরাই উচিত, বর্ষার জল-হাওয়া তোমার মোটেই সইবে না।"

স্বপন বলিল, "তাইতেই আপনি এখন আমায় দেশ হ'তে বিদায় করে দিতে এসেছেন ?"

তাহার কথার সুরে কতখানি শ্লেষ ছিল তাহা হরেন বাবু স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার ভালর জন্যই বলছি মা। বাংলার পল্লীগ্রাম বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ায় ভরে উঠে, এমন কোনও পরিবার দেখতে পাবে না যে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াতে পেরেছে। একে তুমি কখনই পল্লীতে বাস করনি, চিরকাল কলকাতাতেই কাটিয়েছ, পাছে জ্বরে পড় সেই আমার ভাবনা। এ জ্বর এমন বদ যে একবার হ'লে আর সহজে পরিত্রাণ পাবে না। সেই জন্যই বলছি এই তিনটে মাস কলকাতায় কাটিয়ে আশ্বিনের প্রথমে পূজোর দিন কতক আগে চলে এসো।"

স্বপন চুপ করিয়া রহিল, অন্যমনস্ক দৃষ্টি তাহার নদীর তীর ধরিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।

হরেন বাবু তাহার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া উৎসাহিত ভাবে বলিলেন, "তাই বলছি মা, যাতে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে তার চেষ্টা করা—"

দৃষ্টি ফিরাইয়া তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্বপন শান্ত-কণ্ঠে বলিল, "আমি এবারটা যাব না কাকা। জ্বর যাতে না হয় তার চেষ্টা করব। আমি নিজে যদি সাবধান হই তা হ'লে জ্বর কখনই হতে পারবে না, অসাবধান হ'লেই জ্বর হবে। এর মধ্যে যদি জ্বর হয় তা হলে চ'লে যাব আর আসব না।"

তাহার একগুঁয়েমি ভাব দেখিয়া হরেনবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার যা খুসি তাই কর মা, কিন্তু বুড়োর কথাটা মনে রেখো, অসার ব'লে উড়িয়ে দিয়ো না।" স্বপন তাঁহার কথার আর কোন উত্তর দিল না।

৯

হরেন বাবুর স্ত্রী কল্যাণী ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বামীর চেয়ে আরও বেশী গোঁড়া ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি মিশনারীদের মতই ছিলেন। যে সব খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বা প্রচারিকা প্রচার কার্য্যে আসেন, তাঁহারা অসঙ্কোচে বলিয়া যান জগতে খৃষ্টধর্ম্ম ছাড়া আর সব ধর্ম্মই অসার, আর সব দেবতাই মিথ্যা। কল্যাণী এইরূপ ভাবেই খৃষ্টধর্ম্মকে জগতের সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন, অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। এই সব হতভাগ্য ও হতভাগিনীর জন্য তিনি বড়ই দুঃখিতা ছিলেন।

স্বপনের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, কারণ সে একদিন তাঁহারই ভ্রাতৃবধূ হইবে। স্বপনের সম্মুখে তিনি আদর্শনারীরূপে প্রতীয়মানা হইবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন, এ পর্য্যন্ত অযাচিতভাবে তাহার উপর উপদেশ-বৃষ্টিও অবাধে বর্ষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, স্বপনও তাঁহাকে মানিয়া চলিত, বিনা দ্বিধায় তাঁহার আদেশ পালন করিত, সেই স্বপনের এই নিদারুণ অধঃপতন! কল্যাণী যথার্থই অত্যন্ত আহতা হইয়া পড়িলেন। অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িতা হইয়া তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপনের পরিণাম এ কি হলো?"

বিষণ্ণস্বরে হরেন বাবু বলিলেন, "হাজার সোজাপথে চলবার শিক্ষা দিলেও সাপ তার স্বাভাবিক বক্রগতি ত্যাগ কর্তে পারে না সে দৃষ্টান্ত সামনেই দেখ্তে পাচ্ছো।"

হতাশায় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তাই ব'লে স্বপনের যে এমন অধঃপতন হবে, স্বপন যে এমনভাবে বদ্‌লে যাবে, এ আশা আমি কখনই করিনি।"

হরেন বাবু বলিলেন, "পিছলপথে পা দিলে পা নীচের দিকেই ফস্‌কে চলে যায়, উপর দিকে কিছুতে উঠতে পারে না এ তো জানো, তবে তাই নিয়ে মিছে ভেবে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই কল্যাণি।"

কল্যাণী বলিলেন, "দরকার না থাকলে মাথা ঘামাতেই বা যাব কেন? প্রভাতের জন্যই আমি ভাবছি, নচেৎ স্বপনের জন্যে ভাববার আমার কি দরকার? তার অধঃপতনই হোক, বা সে যাই করুক, আমার তাতে কথা বলবারও তো কোনও দরকার ছিল না।"

ইহার পর হঠাৎ তিনি একদিন নিতান্ত অসময়েই জমীদার-বাড়ীতে পদার্পণ করিলেন।

স্বপন আসার পরে কয়দিন তিনি আসিয়াছিলেন, সে এমন অসময়ে নয়, বৈকালে অথবা সন্ধ্যার সময়ে, আজিকার আগমন তাঁহার একেবারে আকস্মিক।

বাড়ীতে রাধাগোবিন্দ-দেবের জন্য ঠাকুরবাড়ী আলাদা আছে, সেখানে প্রত্যহই খুব ধূমধামে পূজা হয়। স্বপন দুই তিনদিন স্নানান্তে ঠাকুরের পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, প্রত্যহ অত সকালে তাহার স্নান হইত না বলিয়া পূজার আয়োজন করা ঘটিয়া উঠিত না, মাসিমাই করিয়া দিতেন।

ত্রিতলের ছোট ঘরখানা স্বপনের একায়ত্ত করা পূজার ঘর। মাসিমা সকাল বেলা পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া যান, স্বপন যত বেলাতেই হোক ছুটি পাইলে স্নান সারিয়া আসিয়া পূজা করে। আজ তাহার বাহিরের কাজে অনেক বেলা হইয়া গিয়াছিল। আর খানিক আগে স্নান করিয়া আসিয়া পিতৃদত্ত গরদের শাড়ীখানি পরিয়া সে পূজায় বসিয়াছে।

কল্যাণী দ্বিতলে তাহার কক্ষে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। দাসী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানা আসন পাতিয়া দিল।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বপন কোথায় ?"

দাসী উত্তর দিল, "তিনি পূজো করতে বসেছেন। আপনি একটু বসুন, তিনি এখনি আসছেন।"

"পূজো করছেন—পূজো ?"

কল্যাণীর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্বপনের এতদূর উন্নতি হইয়াছে—তা তো তিনি জানেন না। সেই স্বপন—যে হিন্দুর ঠাকুর-দেবতাকে পুতুল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, পূজা করা যে উপহাস করিয়াছে সে আজ নিজে পূজা করিতেছে। একি সত্য কথা? কল্যাণীর বুকের মধ্যটা শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তিনি মাথা নীচু করিয়া চক্ষু মুদিয়া একটী নিমেষে স্বপনের ভবিষ্যৎটা দেখিয়া লইলেন।

তিনি একটুখানি নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "সে যেখানে পূজো করছে আমায় সেখানে নিয়ে চল ; আমি একবার দেখব কি ক'রে সে পূজো করে।"

দাসী ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "সে দিকে কারো যাওয়া এ সময়ে নিষেধ, সেই জন্যে কেউ যায় না।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তোমাদের সে নিষেধ করলে করতে পারে, আমায় তা ব'লে নিষেধ করেনি। তোমার অত ভয় হয়ে থাকে, জায়গাটা আমায় দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেয়ো, তারপর আমি দেখব'খন।"

দাসী ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইল, কল্যাণী তাহার পিছনে চলিলেন। ত্রিতলে সেই ছোট ঘরখানার মধ্যে স্বপন তখন পূজা শেষ করিয়া শিবের শেষ প্রণাম মন্ত্রটা উচ্চারণ করিতেছে—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।

তাহার বাহ্যজ্ঞান তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, মন প্রাণ তখন একই কেন্দ্রে ন্যস্ত, বাহিরের অনুভূতি তাহার ছিল না, তাই কল্যাণীর দর্পিত ক্রুদ্ধপদক্ষেপণে উঁচু হিল্‌তোলা-জুতার খটাখট্‌ শব্দ তাহার কানে পৌঁছাইল না।

সম্মুখে তাম্রপাত্রে স্থাপিত মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবলিঙ্গটী-টগর-গোলাপ ধুতুরা প্রভৃতি ফুলের মধ্যে প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না এই রাশীকৃত ফুল-বেলপাতার অন্তরালে একটী শিবলিঙ্গ রহিয়া গিয়াছে। সচন্দন নিখুঁত বেলের ত্রিপত্রটী শিব-লিঙ্গের মাথার উপর ন্যস্ত, পার্শ্বে একখানি রেকাবিতে নৈবেদ্য সাজানো, তাহা কখন উৎসর্গ হইয়া গিয়াছে, গোটা দুই ফুল তাহার উপর পড়িয়া। ঘৃতের প্রদীপটী তখনও দীপ্তভাবে জ্বলিতেছিল, পার্শ্বে ধুনাচি হইতে তখনও ধূপ ও গুগ্‌গুলের সুগন্ধপূর্ণ ধূম অল্প অল্প উঠিতেছিল।

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কল্যাণী এক নিমেষের দৃষ্টিপাতে কক্ষা-ভ্যন্তরটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইলেন। ঘৃণায় ফুলিয়া তাঁহার সর্ব্ব-

শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল! ছি ছি, শিক্ষিতা মেয়ের একি নিদারুণ অধঃপতন! অন্ধবিশ্বাসে অশিক্ষিতা মেয়েরা অন্ধা থাকে, তাই তাহারা মাটীর পুতুলকে প্রত্যক্ষ দেবদেবী জানিয়া পূজা করে, এতখানি পড়িয়া, এমন সৎসংসর্গে আজীবন কাল কাটাইয়া স্বপন শেষটায় সেই অন্ধ-বিশ্বাসের পথে চলিল?

শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালিয়া দিয়া স্বপন যখন গলায় আঁচল জড়াইয়া ভক্তিভরে মাথা নোয়াইল, তখন তাঁহার মনে হইতে-ছিল, তাহাকে ধিক্কার দিয়া এখনই এ স্থান ত্যাগ করেন; কিন্তু তখনি মনে পড়িল প্রভাতের কথা, সে আর মাস দুই-তিন পরেই ফিরিয়া আসিবে তখন স্বপনের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। স্বপন ভবানী-প্রসাদের মোহে ভুলিয়াছে, স্বপনকে হিন্দুধর্ম্মে লইতে পারিলে ভবানী-প্রসাদের কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়াই তিনি ইহাকে টানিতেছেন। হরেনবাবু যথার্থই বলিয়াছেন লোকটা নিশ্চয়ই মেস-মেরিজম জানেন। স্বপনকে এই মোহময় ভ্রান্তপথ হইতে ফিরান চাই, তাহার মনে এইসব কুসংস্কার এখনও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই, উপরেই ভাসিয়া আছে মাত্র, চেষ্টা করিলে এখনও দূর হইতে পারে। তাঁহাকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। স্বপনকে যদি এই পৌত্তলিকতার মোহময় আবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তাহার মন হইতে এ ভাব দূর করিতে না পারেন, সে দারুণ ক্ষতির দুঃখ তাঁহাদেরই বহন করিতে হইবে যে।

"স্বপন—"

সেই রুক্ষ তীক্ষ্ণ আহ্বানটা কানে আসিবামাত্র স্বপন চমকাইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের তরে তাহার মুখখানা ফেকাসে হইয়া গেল। তখনই তাহার

স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। এ তাহার গর্হিত কাজ নয়, এ যে তাহার ন্যায়সঙ্গত যোগ্য কাজ, হিন্দুর মেয়ের এই যে কর্ত্তব্য। এই পূজার মধ্য দিয়া মানুষের নীতিপূর্ণ চরিত্র গঠন হয়, চিত্তে ধর্ম্মের আলো বিকশিত হয়, পাপ-পুণ্য-হিতাহিত জ্ঞান জন্মে। হাঁ, সে হিন্দুর মেয়ে, তাহার দেহের মধ্যে পিতৃপিতামহের রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে, তাঁহাদের দেবভক্তি সে লাভ করিয়াছে। সে লেখাপড়া শিখিয়াছে বলিয়াই কি পিতৃধর্ম্মকে ঘৃণা করিবে, না, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। তাহার লেখাপড়া শিক্ষার জ্ঞান তাহাকে স্বধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত করুক, তাহাকে শক্তি দিক্, সাহস দিক্।

মনের মধ্যে সাহস-শক্তি আনিয়া সে মুখ তুলিল।

"ও কি কর্‌ছিলে স্বপন, দেখি ?"

কল্যাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবামাত্র স্বপন আর্ত্তভাবে বলিয়া উঠিল, "এ ঘরে না, এ ঘরে না কাকিমা, ও ঘরে চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণী বলিলেন, "কেন, এ ঘরে আমার যেতে নেই ?"

স্বপন ঠিক দরজার উপর দাঁড়াইল, দুইদিককার কপাটে দুটি হাত রাখিয়া সে বলিল, "আছে বই কি কাকিমা, কিন্তু আপনার পায়ে জুতো রয়েছে যে। দেবতাকে দেখবার, স্পর্শ করবার অধিকার সবারই আছে, কেননা তিনি সকলেরই। ব্রাহ্মণ উচ্চবংশে জন্মেছে ব'লে সেই যে পূজার যথার্থ অধিকারী, আর হাড়ি ডোম বাগ্দী নীচবংশে জন্মেছে ব'লে পূজার অধিকারী হতে পারবে না, এমন কোন কথাই নেই। পূজো করতে পারে সকলেই ; তবে কি জানেন কাকিমা, অশুচি হ'য়ে ঠাকুর

ছুঁতে নেই। অবশ্য তিনি বলেন না আমায় ছুঁয়ো না, তবু আমাদের মনে তো একটু দ্বিধা জাগে।”

“ওঃ বুঝেছি।”

কল্যাণীর মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া গেল।

স্বপন বলিল, “চলুন কাকিমা, ও ঘরে বস্‌বেন।”

“চল, কোন্ ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে বসাবে দেখা যাক—” বলিয়া কল্যাণী ফিরিলেন।

স্বপন নিজের শয়নকক্ষে তাঁহাকে আনিয়া একখানি চেয়ারে বসাইল এবং নিজেও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল।

কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই দুপুর বেলা এসেছেন যে কাকিমা, খাওয়া হয়ে গেছে?”

উদাসভাবে কল্যাণী বলিলেন, “দরকার ছিল ব’লেই এসেছি, খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।”

স্বপন তাঁহার উদাসীনতার কারণ বুঝিয়াছিল; যেন কিছুই বুঝে নাই এমনই মুখখানা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনাকে আজ কি রকম দেখাচ্ছে কাকিমা, শরীর খারাপ নয় তো?”

কল্যাণী মাথা নাড়িলেন, স্বপনের ললাটের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, “তোমার কপালে ও গুলো কি লেগেছে স্বপন?”

স্বপন অপ্রস্তুত ভাবে অঞ্চলে ললাট মুছিয়া ফেলিয়া শুধু একটু হাসিল, উত্তর দিল না। একটু উত্তেজিত হইয়া কল্যাণী বলিলেন, “সত্যি এটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয় স্বপন। এতদিন যা করেছ সেটা অবুঝের খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এখন তোমার এই অদ্ভুত সং সেজে একটা মাটীর পিণ্ড গড়িয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ ক’রে

তাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করাকে কিছুতেই খেয়াল ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

স্বপন ধীরকণ্ঠে বলিল, "সে সত্যি কথা কাকিমা, এ আমার মিথ্যে খেয়াল নয়, কাজেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না।"

জ্বলিয়া উঠিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কল্যাণী বলিলেন, "তবে কি যথার্থই বিশ্বাস করব তোমার এই রকম অধঃপতন ঘটেছে ?"

স্বপন নতমুখে হাসিল।

সে হাসিতে কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, একটী কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

স্বপন শান্তকণ্ঠে বলিল, "কাকিমা, আমরা বড় দুর্ব্বল—পরাধীন জাতি ; আমাদের প্রাণে সখ আছে ষোল আনা, কিন্তু তা মিটাবার সামর্থ্য নেই। ভারতবর্ষ বিজিত দেশ, যে যখন ভারতবর্ষ দখল করে, দলে দলে ভারতবাসী তার ধর্ম্ম গ্রহণ করে, অবশ্য অনেক জায়গায় স্বেচ্ছাতেই যে করে এমন কথা আমি বলছি নে, এর মধ্যে অত্যাচারও আছে, প্রলোভনও আছে। যখন হিন্দুর রাজত্ব ছিল—ভারতে সবাই হিন্দু ছিল। পৃথিবীর সৃষ্টি হ'তে ভারত হিন্দুর দেশ, একই নিয়ম পালন করে আসছিল, পূজার্চ্চনা একই ভাবে ক'রে যাচ্ছিল। তারপর ভারতের দুর্দ্দিন এলো—মুসলমান ভারত অধিকার করলে, অনেক হিন্দু স্বেচ্ছাতেই হোক্, বলপ্রকাশ বা প্রলোভনে ভুলেই হোক—মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলে। তারপর ইংরাজ এ দেশের অধিপতি হলো, দলে দলে লোকে খৃষ্টান হতে লাগল, তাদের অনুকরণ করতে লাগল। এর মূলে কি আছে একটু লক্ষ্য করলেই সেটা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে রয়েছে রাজার জাতির প্রিয় হওয়া, দুটো প্রশংসার কথা পাওয়া—নয় কি ?

এমনি ক'রেই না হিন্দুর দেশ ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমে গেছে। এক একটা দেশে দেখতে পাবেন, হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। হিন্দুরা ইংরাজ আমলে অনেকে খৃশ্চান হয়েছেন, অনেকে—যাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁরাও নিজেদের জন্যে একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেছেন। এর ফলে প্রাচীন হিন্দুসমাজ দিন দিন অবনত হ'য়ে পড়ছে, আর একটী শিক্ষিত সমাজ তার পাশেই অত্যুজ্জল রত্ন বুক নিয়ে দিন দিন উন্নত হ'য়ে উঠছে। হিন্দুসমাজের বুকে আবর্জ্জনা জম্‌ছে—কেউ তা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করেন না, নিজেদের স্বতন্ত্র করতে পারলেই বেঁচে যান। ওই যে আগেই বললুম—কিছু বেশী লেখাপড়া শিখলেই এ দেশের হিন্দুসমাজের লোকে মনে করে, আমি কি হয়েছি। তাই তারা আবহমান কাল যা চ'লে আসছে তাকে ঘৃণা করে। কেন না, একটা কি-হওয়া'র বিশিষ্টতা দেখান চাই। যে ইংরাজের দৃষ্টান্তে শিক্ষিত সমাজ উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছেন, তাঁরা শিক্ষিত হ'য়ে নিজের—সমাজের—দেশের কতটা উন্নতি সাধন করেন, সেটা এ দেশের শিক্ষিত হিন্দুর ছেলে দেখেছেন কি ? আপনি—শুধু আপনি কেন—সকলেই বল্‌ছেন আমার দারুণ অধঃপতন ঘটেছে। কেন না আমি শিক্ষিতা হ'য়েও পিতৃপুরুষের ধর্ম্মকে ঘৃণা করতে পারিনি। তাই যদি কর্‌ব কাকিমা, তবে আমার বাবা আমায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ-স্থলে গ'ড়ে তুলেছেন কেন ? আমার শিক্ষার মূল্যটাই বা কি ? ভালমন্দ জ্ঞান যদি আমার নাই হবে, তবে আমি শিক্ষায় এতদিন ব্যয় করলুম কেন ? ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কথা বলতে চান, আমি এই বলতে পারি, তাতে কারও মতামত খাটে না। আপনি খৃষ্টান, আপনাকে আমি যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দেই, আপনি তা সইতে পারবেন না। কেন না আপনি আপনার ধর্ম্মকে ভাল-

বাসেন। আমিও আমার ধর্ম্মকে তেমনি ভালবাসি,-তাকে.অসার বল্‌লে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। ধর্ম্মকে আপনি যেমন সকল রকম আঘাত হতে বাঁচিয়ে রাখতে চান, অটুট রাখতে চান, আমিও তেমনি চাই। আপনারা কি চান ভারতের একমাত্র প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের লয় হ'য়ে যাক্, সবাই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, ব্রাহ্ম হোক্, খৃশ্চান হোক্, মুসলমান হোক্? সকল জাতিই এই অধঃপতিত হিন্দুজাতিটাকে লোপ করতে চাচ্ছে, এর বুকে পা দিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছা কর্‌ছে, এর দেবমন্দির সমতল ক'রে ফেলতে চাচ্ছে। দেখুন কাকিমা, আজ অনেক গুলো কথা ব'লে ফেলেছি, আমাকে মাপ করবেন তার জন্যে। একটা শেষ কথা বলছি, যে ইচ্ছা ক'রে কোন ধর্ম্ম নিতে চায় সে নিক্, জোর জবরদস্তি কেউ যেন না করে এই আমার প্রার্থনা।"

কল্যাণী অঞ্চলাগ্র আপন মনে পাকাইতেছিলেন, খুলিতেছিলেন, স্বপনের কথার উত্তর দিলেন না।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, আহার্য্য প্রস্তুত, মাসিমা ডাকিতেছেন।

স্বপন আদেশ দিল, "এই ঘরে দিয়ে যেতে বল।"

কল্যাণী বলিলেন, "তবে আমি অন্য ঘরে গিয়ে বসি।"

তিনি উঠিবার উদ্যোগ করিতেই স্বপন তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল। "আপনি উঠছেন কেন কাকিমা, বসুন।"

অন্ধকারপূর্ণ মুখে কল্যাণী বলিলেন, "আমি যে খৃশ্চান স্বপন, আমার পায়ে জুতো রয়েছে, তুমি হিন্দু—"

কুণ্ঠিত হইয়া স্বপন বলিল, "তাতে কি কাকিমা? আপনি পূজোর ঘরেও যেতে পারতেন, কেবল জুতো পায়ে, আর স্নান করেননি ব'লেই সংস্কারের জন্যে যেতে বারণ করেছি। আপনার মধ্যে যিনি আছেন

আমার মধ্যেও তো তিনিই আছেন কাকিমা! যিনি পবিত্র দেহে বাস করেন, অপবিত্র দেহের মধ্যেও তো তিনিই থাকেন। আধার ভালমন্দ বিচার তিনি তো করেন না। আমি হিন্দু ব'লে তার শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে চাই যদি আপনি ভেবে থাকেন, সেটা আপনার ভুল। যার যা ধর্ম্ম তাই থাক—আমরা সেইটুকু বাঁচিয়ে রেখে সকলের সঙ্গে মিল্‌তে মিশ্‌তে চাই। হিন্দুধর্ম্ম যদি এতই অনুদার হতো কাকিমা, তবে হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে আলিঙ্গন দিতে পারতেন না। হিন্দুধর্ম্মের মূল সাম্য, একে যতটা অনুদার ভাবছেন, বাস্তবিক ততটা নয়। আমিও সাম্য চাই, উদারতা চাই, প্রকৃত হিন্দু হ'তে চাই। আপনি বসুন, আমি এইখানেই ভাত খাব।"

দাসী স্থান করিয়া দিয়া গেল, শরৎকালী আহার্য্য লইয়া আসিলেন।

"এসো মা, খেতে বসো। বেলা একটা বাজে, এখনও এক ফোঁটা জল মুখে দাওনি। এই রকম পিত্তি পড়িয়ে খেয়ে শেষকালটায় একটা শক্ত ব্যারাম না ক'রে দেখছি ছাড়বে না। সকাল বেলা তোমার জল খাওয়া অভ্যাস, সেই অভ্যাস কি হঠাৎ এমন ভাবে একেবারে ছাড়তে আছে?"

কল্যাণী স্বপনের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এখনও কিছু খাওনি বুঝি?

কুণ্ঠিতভাবে স্বপন বলিল, "আজ বড় দেরী হয়ে গেছে কাকিমা, প্রজারা অনেক দূর হ'তে এসেছিল, তাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌তে—"

বাধা দিয়া কল্যাণী বলিলেন, "সে গুলো বুঝি আর কেউ কর্‌তে পার্‌ত না?"

লজ্জিত আরক্ত মুখে স্বপন বলিতে গেল, "তারা আমায়—"

"হয়েছে, এমনি ক'রে চল্‌লেই তুমি জমিদারী চালাবে! যাক্, সে সব কথা পরে হবে এখন, আগে খেয়ে নাও।"

স্বপন আহারে বসিল।

কল্যাণী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আহার দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "এখনও মাছ মাংস তুমি খাও না?"

শরৎকালী বলিয়া উঠিলেন, "কিছুতেই না মা, কিছুতেই মাছ মাংস খাওয়াতে পারলুম না, অথচ মাছ মাংস হচ্ছে, ঝি চাকর আমলা পেয়াদা সবাই খাচ্ছে।"

কল্যাণী বলিলেন, "এটা কিন্তু তোমার বিশেষ অনিষ্ট কর্‌ছে স্বপন মাছ মাংস দেহকে পুষ্ট করে, মস্তিষ্ককে পুষ্ট করে, কাজেই এতে জীবন-শক্তি কতটা বাড়ে সে কথা জানো?"

স্বপন সে কথা মানিয়া লইল, বলিল, "কিন্তু কাকিমা, সেকালকার কথা ছেড়ে দিলেও একালে এমন ঢের লোক আছেন, যাঁরা আমিষ খান না, নিরামিষই খান, কই, তাতে তাঁদের তেমন অনিষ্ট ঘটতে দেখা যায়নি তো। মাছ মাংস খান না এমন অনেক চিন্তাশীল লোকও আছেন, তাঁদের রচনা পড়ে' আমরা চমৎকৃত হ'য়ে যাই, ভেবে পাইনে এমন সব উৎকৃষ্ট চিন্তা তাঁরা করতে পারেন কি করে? হিন্দুঘরে বিধবার অভাব নেই, দেখা গেছে যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য পালন করার জন্যে তাঁদের স্বাস্থ্য যে কোন সধবার চেয়ে উৎকৃষ্ট, মাছ মাংস না খাওয়ার ফলে তাঁদের কোনও ক্ষতি হয় নি বরং ভালই হয়েছে। সংযমের পক্ষে এই দুটো জিনিস ত্যাগ করা খুব ভাল কাকিমা অত্যাচারের দিক দিয়েও কি নয়? আমার খাওয়ার জন্যে নিরপরাধ কতগুলি জীব

প্রাণ বিসর্জ্জন করে তার ঠিক নেই, অথচ আমি তো তরকারী ঘী এ সবও খেতে পারি।"

কঠিন মুখে কল্যাণী বলিলেন, "তোমায় এ ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপদেশ দিলে কে, তোমাদের গুরুদেব বুঝি ?"

কঠিন আঘাতে স্বপনের মুখখানা পাংশু হইয়া গেল, তখনই সে ভাব সামলাইয়া সে বলিল "না, তিনি নয়, আমায় উপদেশ দিয়েছেন আমার বাবা। তিনি কখনও আমিষ খেতেন না সে কথা আপনি বেশই জানেন, এই জন্যেই কখনও আপনার বাড়ীতে তাঁর খাওয়া হতো না।"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিলেন, এ সব বিষয় লইয়া আর নাড়াচাড়া করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। স্বপনের আহার খুব শীঘ্রই হইয়া গেল, সে আচমন করিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিল।

কল্যাণী তখন একখানা ইজিচেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়া কি ভাবিতেছিলেন ; স্বপন অসিয়া পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, দাসী ডিবায় পান রাখিয়া গেল।

কল্যাণী স্বপনের দীপ্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি স্বপন, দেহকে কষ্ট দিয়ে কি ফল লাভ হয় ?"

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল, "দেহকে কষ্ট না দিলে কোন ফল লাভ হয় না কাকিমা। ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে আরাধ্য বস্তু পাওয়া যায় না। এই ত্যাগপথে সংযমের দরকার। অবাধ্য চঞ্চল মনকে সংযত কর্‌তে হলে, আগে দেহকে কষ্ট দিতেই হবে, কেননা দেহের সঙ্গে মনের নিত্যকার সম্পর্ক রয়েছে।"

শ্লেষজড়িত কণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "তোমাদের গুরুদেব তা

পেরেছেন ? তাঁকে দেখলে তো মনে হয় না তিনি কিছু ত্যাগ করতে পেরেছেন। ঘোর সংসারী, ঘোর বিলাসী তিনি, সংযম কাকে বলে তা নিজেই কখনও শিক্ষা করেন নি, কেবল উপদেশই দিতে জানেন।”

শান্তকণ্ঠে স্বপন বলিল, “তাঁর সম্বন্ধ নিয়ে বাদানুবাদ আমি করতে চাইনে কাকিমা, তাঁকে তর্কের বাইরের মানুষ ব'লেই জানি। আমাদের সংসারিক কোন কাজ বা কথার মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে ফেলবার ইচ্ছা আমি মোটেই করিনে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী বড় সুন্দর উপাখ্যান আছে, সেটা আমি আপনাকে না শুনিয়ে থাকতে পারছিনে। আপনি খৃশ্চান হলেও হিন্দুশাস্ত্র-পুরাণ অনেক পড়েছেন, পরমভক্ত নারদ মুনির নামও জানেন নিশ্চয়ই। দেবর্ষি নারদের মনে বড় গর্ব্ব ছিল, তাঁর মত ভক্ত দুনিয়ায় আর কেউ নেই। একদিন তিনি এই ব'লে অহঙ্কার করায় ভগবান্ নারায়ণ তাঁকে বলেছিলেন, তোমার চেয়েও আমায় ভালবাসে, ভক্তি করে, এমন একটী লোক এই পৃথিবীতে সংসারের মাঝখানে রয়েছে। নারদ সেই ভক্তকে দেখতে চাওয়ায় ভগবান্ তার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। নারদ নির্দ্দেশিত স্থানে গিয়ে দেখেন, সেই ভক্তটী সামান্য কৃষকমাত্র। ঘোর সংসারী, দিনরাত তার কাছে থেকেও তিনি তার মুখে একটী বার হরিনাম শুনতে পেলেন না ; এই সব সংসারের কাজে সে এতই আত্ম-ভোলা হ'য়ে রয়েছে। দেবর্ষি হাস্‌লেন, ভগবান্ লোক চিনতে পারেন না ব'লে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করলেন। ফিরে গিয়ে নারায়ণকে এ কথা বল্‌তে তিনি বল্‌লেন—আচ্ছা চল, আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখছি। এর পর নারদ প্রমাণ পেলেন, ঘোর সংসারী সেই লোকটী

কর্ম্মে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, প্রভুর সেবা বলেই সে তার সারা অন্তরখানি ঢেলে দিয়ে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলি নিয়মিতভাবে ক'রে যাচ্ছে। একটা প্রদীপে এক প্রদীপ তেল দিয়ে কাউকে যদি বলা যায়, সারা সহরখানা ঘুরে এসো, কিন্তু এক ফোঁটা তেল যেন উপছে না পড়ে। আদিষ্ট লোকটী সারা সহরই বেড়িয়ে আসবে, কিন্তু মন তার যেমন সেই তৈলপূর্ণ প্রদীপটার 'পরেই পড়ে থাকে, এই ভক্তটীরও তেমনি হয়েছিল। সংসারের কোলে এসে সন্তান হ'য়ে যখন জন্মাতে হয়েছে, তখন তার প্রতি মানুষের কর্ত্তব্যও তেমনি আছে বই কি। কর্ম্মে অনাসক্তি, ভোগে নিবৃত্তি এই তো ত্যাগীর ধর্ম্ম। ত্যাগ মানুষের অন্তরের জিনিস, বাইরে ত্যাগশীলতা দেখান'—লোকের ভক্তি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করা মাত্র, মন পাঁকে ডুবে থাকে, সে তো পদ্ম হ'য়ে ফুটে উঠতে পারে না।"

ভক্তিতে স্বপনের কণ্ঠস্বর ভিজিয়া উঠিল। তাহার মুখখানা উজ্জল হইয়া উঠিল, কল্যাণী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার সেই দীপ্ত মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন, চোখ সহজে ফিরাইতে পারিলেন না।

গভীর সুরে স্বপন বলিল, "আপনি মন্দ বলবেন কাকিমা, কিন্তু তা বলুন, আমি যথার্থ কথাই বল্‌ব। প্রথম বেলাটায় একবারেই নাস্তিক হয়েছিলুম, ভগবান্ নামে কেউ যে আছেন সে কথা বিশ্বাস কর্‌তে আমার প্রাণ চায় নি। তার পর আস্তে আস্তে মনে এল, ভগবান নামে কেউ নিশ্চয়ই আছেন, কিছুই নেই এ কথা জোর ক'রে মানতে গেলে জগৎটাই যেন মিথ্যে হ'য়ে যায়। তারপর চোখ বুজে ভগবান্‌কে ধারণা করতে গেলুম—দেখলুম কেবল অন্ধকারে, সে অন্ধকারকে উজ্জল ক'রে দিতে কোনও স্বর্গীয় দীপ্তি নেমে এল না; ব্রহ্মকে নিরাকার-

রূপে কিছুতেই আমি ধারণা ক'রে নিতে পারলুম না। জ্যেঠামহাশয় আমার সামনে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, বুঝিয়ে দিলেন অল্পে অল্পে উঠতে হবে, হঠাৎ লাফিয়ে মূল ধর্‌তে পার্‌ব না। হিন্দুশাস্ত্র বলে, জন্ম-জন্মান্তর আছে,পুণ্য ও পাপ জন্ম-জন্মান্তর হতেই সঞ্চিত হয়। কেউ হয়তো জন্ম-জন্মান্তর হ'তে পুণ্য সঞ্চয় করতে করতে এসে এই সংসারের বুকেই কোন একজন্মে মূল পেয়ে যান,যেমন রামমোহন রায়, কেশব সেন পেয়েছেন। আমাদের শাস্ত্র বলছে, বহুজন্মের পুণ্য একটু একটু করে সঞ্চিত হতে হতে মানুষকে পূর্ণ করে দেয়, তাইতেই হিন্দু রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে পেয়েছে। আমি হিন্দু, শাস্ত্র মেনে চলছি, এজন্মে একটু পুণ্য সঞ্চয় করব, যতটুকু পার্‌ব ততটুকুই ত্যাগ কর্‌ব—পরজন্মে আবার খানিকটা কর্‌ব; এমনি ক'রে জন্ম-জন্ম ত্যাগের পথে চল্‌তে চল্‌তে একটা জন্ম পাব যে আমায় মুক্তি দেবে, যে আমায় পূর্ণতা দেবে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া এমন সুন্দর কথা বল্‌তে আর কেউ পারবে না। তাই এদেশে ত্যাগের আদর্শ চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, অবশেষে রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হয়েছিল। যতদিন জানিনি, শাস্ত্রকে ধর্ম্মকে চিনিনি, ততদিন মিথ্যে খেলে দিন কাটিয়েছি, আজ চিনেছি জেনেছি—তাই আঁকড়ে ধরেছি। আমি আপনাদের কাছে অনেক অপরাধ করেছি, আপনারা আমার জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, এখনও পাচ্ছেন, তার জন্যে মার্জ্জনা কি পাব না কাকিমা, আমার এই একগুঁয়েমির জন্যে মাপ করবেন না কি?"

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আমরা তোমায় মাপ করেছি মা, কোনদিনই তোমার দোষ

ধরিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি সুখিনী হও, তোমার একাগ্র বাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।"

বৈকালের দিকে তিনি বিদায় লইলেন।

১০

প্রভাত যে দিন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইবে বলিয়া টেলিগ্রাফ করিল—তাহাকে আদর করিয়া নামাইয়া লইবার জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বেই হরেনবাবু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। প্রভাতকে লইয়া আসা ছাড়া তাঁহার আরও কতকগুলি গোপনীয় জরুরী কাজ ছিল, এ গুলির কথা স্বপনকে জানানো তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি কোনও একটা অছিলাই খুঁজিতেছিলেন, ভগবান পাপীকেও দয়া করেন, তাই হরেনবাবু অচিরেই এই সুবিধা পাইয়া গেলেন। স্বপন অসন্দিগ্ধচিত্তেই তাঁহাকে বিদায় দিল, জানিল না হরেনবাবু তার জমিদারীকে জালে জড়াইয়া ফেলিবার জন্যই বিশেষ করিয়া কলিকাতায় চলিলেন।

বহুকালের পর প্রভাত কলিকাতায় পদার্পণ করিল, আনন্দে তাহার হৃদয়খানা তখন পূর্ণ! সে ষ্টেশানে নামিয়াই উৎসুক চোখে চারিদিকে চাহিয়াছিল, একমাত্র হরেনবাবু ছাড়া সে আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। স্বপনের উপর একটু অভিমানও হইয়াছিল। সে কি আজিকার এই দিনটীতে একবার আসিতে পারিল না? সে যে সম্মানের সহিত পাস করিয়া আসিয়াছে সে আনন্দটা যেন তাহার মাঠেই মারা গেল!

হরেনবাবুর সহিত তাহার বেশ কথাবার্ত্তা চলিল, কথায় কথায়

হরেনবাবু জানাইলেন, স্বপন নিজের জমিদারীতেই রহিয়াছে, কলিকাতায় আসে নাই।

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "সে ভাল আছে তো?"

হরেনবাবু বলিলেন, "বেশ আছে। সে তোমায় পত্র দেয় কি?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া প্রভাত বলিল, "দেয় তো, তার পত্র প্রায় মেলেই পেয়ে থাকি।"

হরেনবাবু অন্যমনাভাবে শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

প্রভাতের পূর্ব্ব বন্ধুগণ তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, অনেক কষ্টে তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রভাত হরেনবাবুর সহিত বাসায় আসিয়া পৌঁছাইল।

কল্যাণী মহাসমাদরে প্রভাতকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার মুখের কথা আর ফুরায় না।

কল্যাণীর একমাত্র কন্যা মৃন্ময়ী প্রস্তাব করিল, মামার আসা উপলক্ষে একটা মিলন-ভোজ দেওয়া হোক্।

কল্যাণী কঠিন মুখে বলিলেন "তোকে কেউ কথা বল্‌তে ডাকছে না মিনু, যেমন আছিস্ তেমনি চুপ করে থাক্।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, তাহার মুখে আর একটি কথাও ফুটিল না কিন্তু হরেনবাবু তাহার কথা সমর্থন করিলেন, তিনি একটা মিলন-ভোজের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কল্যাণীর পরিচিতা মেয়েরা নিমন্ত্রিতা হইলেন। হরেনবাবু নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভাতের বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হইল। মৃন্ময়ী এই মিলন-ভোজ হইতে দূরে রহিয়া গেল, সে প্রথম প্রস্তাবেই ধমক খাইয়া থতমত খাইয়া গিয়াছিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বন্ধু কাউকে বলবিনে?"

মৃন্ময়ী বিমর্ষভাবে শুধু মাথা নাড়িল।

বিরক্ত কল্যাণী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন বল্‌বিনে, আমার 'পরে রাগ করেছিস্ বুঝি?"

মৃন্ময়ী শান্তকণ্ঠে বলিল "আমি রাগ করব কেন মা, আর আমার রাগেই বা তোমার কি আসে যায়? আমি কে মা, কতটুকু সম্বন্ধ রেখেছ আমার সঙ্গে? দয়া করে যে টুকু—"

বলিতে বলিত সে যেন অশ্রুসম্বরণে অসমর্থ হইয়াই তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলিয়া গেল।

এই মেয়েটিকে লইয়া এই পরিবারে গোল চলিতেছিল খুব, ইহার একটী মস্ত বড় ইতিহাস আছে।

হরেনবাবু হিন্দুগৃহের ছেলে ছিলেন। যখন তিনি বি-এ; পড়িতে-ছিলেন, সেই সময়ে প্রফেসার মতিলাল রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। কল্যাণী ও প্রভাত মতিলাল রায়ের পুত্রকন্যা। মতিলাল বাবু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। কল্যাণী যখন বেথুনে আই-এ পড়িতেন, সেই সময় হরেনবাবু এম-এ পাস করিয়া কল্যাণীকে বিবাহ করেন, এই সময়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সংসারে বর্ত্তমান ছিলেন বৃদ্ধ পিতা, তাঁহার অনেকটা আশা ভরসা এই ছেলেটীর উপর ন্যস্ত ছিল। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, হরেনবাবু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বুক শতধা হইয়া গেল, তিনি জন্মের মত তাঁহার দেশ বসিরহাট ত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

এখানে তাঁহার দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়, তবু পুত্রের প্রতি মায়া-

মমতা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। তিনি একবার কলিকাতায় পুত্রের নিকট আসিলেন, তখন মৃন্ময়ী হইয়াছে, এই পৌত্রীর মায়ায় তিনি আবার জড়াইয়া পড়িলেন।

ইহার পর মৃন্ময়ী একটু বড় হইলে তিনি তাহাকে নিজের কাছে দুদিন লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কল্যাণী প্রথমটা ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু হরেন বাবু সম্মতি দিলেন, মনটায় বোধ হয় ব্যথা বাজিয়াছিল, তাই নিজেই তিনি একমাত্র আদরিণী কন্যাকে মাস খানেকের জন্য পিতার কাছে রাখিয়া আসিলেন।

এই মাসখানেকের মধ্যে নবমবর্ষীয়া পৌত্রীর তিনি যে চুপি চুপি বিবাহ দিয়া ফেলিবেন, তাহা পুত্র বা পুত্রবধূ কেহই জানিতে পারেন নাই, সন্দেহও করেন নাই।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কি কুমতি ধরিয়াছিল জানি না, তাড়াতাড়ি পৌত্রীর বিবাহ দিয়া ফেলিয়া তিনি যেন একটা দায় হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণসন্তান হরেন্দ্রনাথ পিতৃ-ধর্ম্ম ত্যাগ করায় বৃদ্ধ পিতা হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। পৌত্রীকে তাঁহার পছন্দ মত সৎ-পাত্রের হাতে সমর্পণ করিয়া সে ক্ষতের বেদনা যেন কতকটা জুড়াইয়া আসিল, ইহার ফল পরে কি ঘটিবে তাহা তিনি তখনও ভাবেন নাই।

একমাস পরে মৃন্ময়ীর স্কুল খুলিবার দুইদিন আগে হরেনবাবু মৃন্ময়ীকে আনিবার জন্য তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন, মৃন্ময়ী তাহার সহিত কলিকাতায় আসিল। সদ্য-বিবাহিতা কন্যার পানে চাহিয়া কল্যাণী মূর্চ্ছিতাপ্রায় হইলেন, আর হরেনবাবুর কথা বর্ণনাতীত। পিতা যে এমন করিয়া শত্রুতা করিবেন, কন্যাকে উচ্চশিক্ষিতা করিয়া বিলাত-ফেরৎ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার একান্ত বাসনা যে এরূপ

ভাবে সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিবেন, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; রোষে ক্ষোভে হরেনবাবু পাগলের মত হইয়া গেলেন।

এভাব সামলাইতে তাঁহার অনেক দিন লাগিল, ইহার পর পিতার সহিত সম্পর্ক তিনি একেবারেই তুলিয়া দিলেন; ভগ্নহৃদয় পিতা পুত্রের কাছে ক্ষমা চাহিয়া পত্র দিলেন, উত্তর পাইলেন না।

কল্যাণী কন্যার মাথার সিঁদুর মুছিয়া হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া লোহা খসাইয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন; জোর করিয়া বলিলেন, তাহার বিবাহ হয় নাই; এ বিবাহকে বিবাহ বলিয়া মানিয়া লইতে তিনি কিছুতেই রাজি নহেন।

কিন্তু জোর করিয়া বলিলেই কি হইল, ক্ষুদ্র নবমবর্ষীয়া বালিকার মন হইতে সে ছবি তিনি কিছুতেই মুছিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বালিকা সে, মায়ের আদেশ-অনুসারে চলিল, কিন্তু একদিনকার সেই এক রাত্রির কথা তাহার মনে জাগিয়া রহিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, একমাত্র মৃন্ময়ী ছাড়া আর সকলেই ভুলিয়া গেল, তাহার বিবাহ হইয়াছিল,তাহার শ্বশুরালয় হইতেও কেহ কোনদিন দাবী লইয়া আসিল না, যেন কিছুই হয় নাই। এই একরাত্রের কথা জাগিয়া রহিল এক অনুতপ্ত বৃদ্ধের হৃদয়ে আর মৃন্ময়ীর প্রাণে।

গত বৎসর সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বাঁকিয়া বসিল, আর সে পড়িবে না। যতটুকু জানিলে মেয়েদের দিন চলে ততটুকু তাহার জানা হইয়াছে, আর বেশী শিক্ষায় কি দরকার।

পিতা ও মাতা অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সে অটল। সে বেশী কথা বলিত না, কিন্তু যাহা না বলিত, তাহা কিছুতেই হাঁ বলাইতে পারা

যাইত না। পিতা মাতা বাধ্য হইয়া তাকে ছাড়িয়া দিলেন, মা মেয়ের উপর চটিয়া গেলেন।

কয়েকমাস পূর্ব্বে পূজার আগে হরেনবাবু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কাশীতে আসিয়াও তিনি পিতার সহিত দেখা করিতে যান নাই, কেমন একটা নিদারুণ বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মৃন্ময়ী যখন ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করার কথা কহিল, তখন তাঁহারা উভয়েই তাহাকে অপমান করিয়াছিলেন, রাগ করিয়া মৃন্ময়ী দুইদিন আহার করে নাই। ঠাকুরদাদা তাহাদের আসার সংবাদ পাইয়াও সাহস করিয়া দেখা করিতে আসিতে পারেন নাই, মৃন্ময়ীকে একবার দেখা করিয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মৃন্ময়ী দেখা করিতে গিয়া তাঁহার শরীর অসুস্থ দেখিয়া ফেলিয়া আসিতে পারিল না, বিরক্ত ক্রুদ্ধ পিতামাতা তাহাকে সেখানে ফেলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এই দুর্ব্বিনীতা মেয়েটীর জন্য তাঁহাদের মনোকষ্ট পাইতে হইতেছিল বড় কম নয়। এই মেয়েটীর জন্য সমাজে তাঁহাদের যেন সঙ্কুচিত ভাবেই চলিতে হইত, কখন এ কি করিয়া বসে, কি বলিয়া বসে, তাহার জন্য ভাবনার অন্ত ছিল না।

কয়েকদিন পরে হরেন্দ্রনাথের পিতা স্বয়ং পৌত্রীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। হরেন্দ্রনাথ পিতার সহিত কথা কওয়া দূরে থাক্, মুখদর্শনও করেন নাই, পুত্রবধূ কল্যাণী শ্বশুরের দিকেও যান নাই, কন্যার সহিত বাক্যালাপও করেন নাই। ভগ্নমনা বৃদ্ধ খাওয়ার বেলায় নিজেই যাচিয়া পুত্রবধূর নিকট গিয়া তাঁহার হাত দু'খানা নিজের শীর্ণ কম্পিত দু'টি হাতের মধ্যে লইয়া চোখের জলে ভিজাইয়া কম্পিত কণ্ঠে

বলিয়াছিলেন, "মা, একটা বড় অন্যায় কাজই ক'রে ফেলেছি, কিন্তু তার জন্যে এই গুরু দণ্ডটা বুড়োর মাথায় চাপিয়ে দেওয়া কি ভাল কাজ হয়েছে ? তখন বুঝতে পারিনি, আমার সে কাজের ফল এরকম হবে, তোমরা আমায় ঘৃণা করবে, মেয়েটীকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করবে। মা, একটা কথা বলি বিয়ে যথার্থই ওর হয়েছে,হিন্দুমতেই বিয়ে দিয়েছিলুম, তোমরা সে বিয়েটাকে এমন করে উড়িয়ে দিয়ো না। তোমার মেয়েকে আমি অপাত্রে ন্যস্ত করিনি মা, যেমন গৌরীর মত মেয়ে তোমার, তেমনি শিবের হাতেই অর্পণ করেছি। সে শুনেছে দিদি আমার তোমাদের মেয়ে,তাই পেছিয়ে গেছে, সমাজের ভয় করছে,কেননা ছেলেমানুষ সে, তার মাথার 'পরে বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। মিনুর বিয়ে হয়েছে, ওকে আর বিবাহিতা করবার চেষ্টা করো না, এতে মহাপাপ হবে।"

তাঁহার বিদায়কালীন কথা কল্যাণী শুনিয়াও শুনিলেন না, তিনি এখন কন্যাকেই অপরাধিনী ঠিক করিলেন। কথায় কথায় বাক্যবাণে মৃন্ময়ীর অন্তর তিনি বিদীর্ণ করিয়া দিতেন, অভিমানিনী মৃন্ময়ী নীরবে মায়ের অবহেলা সহিয়া যাইত।

আজিকার এই আনন্দোৎসবে সে কিছুতেই যোগ দিতে পারে নাই। পিতার অবহেলা, মায়ের তাচ্ছিল্য তাহার বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধাইয়া দিতেছিল, দোষ কাহার ? ইঁহারা কেন তাহাকে এ শাস্তি দিতেছেন ? সে সেই আনন্দ কোলাহলময় স্থান ছাড়িয়া গিয়া নিজের কক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল, দারুণ অভিমানে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"মা—"

বড় কষ্টে বড় সান্ত্বনাদায়ক এই শব্দটাই তাহার মুখে ভাসিয়া উঠিল,

সে চমকাইয়া উঠিল—ডাকিতেছে কাহাকে! যে নারী মা হইয়াও মা হইতে পারে নাই, তাহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণে শান্তি আসে কই, সে তো সন্তানের হৃদয়বেদনা বুঝিবে না!

সে আর মায়ের নাম মুখে আনিতে পারিল না, অব্যক্ত যাতনায় হৃদয়খানা তাহার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, আহারাদি কিছুই হইল না।

কল্যাণীর মনটা আজ কন্যার উপর একেবারে বিরূপ হইয়া গিয়াছিল। মনে হইল আজ নিমন্ত্রিত এতগুলি নরনারীর সম্মুখে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্যই মৃন্ময়ী সরিয়া গিয়াছে। মেয়েরা সকলেই আগ্রহভরে মৃন্ময়ীর অনুপস্থিতের কারণ জানিতে চাহিতেছিলেন, প্রথমটা এড়াইয়া গেলেও শেষটায় তাঁহাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইল, তিনি জানাইলেন তাহার জ্বর হইয়াছে, নিজের কক্ষে সে শুইয়া আছে।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বাড়ীখানি নিঝুম হইয়া গেল। শেষ বন্ধুটীকে বিদায় দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "মিনুর কি সত্যই জ্বর এসেছে দিদি?"

কল্যাণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে না আর কিছু? কথায় কথায় আজকাল তার রাগ অভিমান হয়, রাগ ক'রে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে আছে।"

প্রভাত বলিল, "আজ এই মিলনানন্দের দিনেও তার রাগ-অভিমান এলো দিদি? আমি এবার এসে তার মুখে আর সে হাসি দেখতে পেলুম না, কেমন যেন সঙ্কুচিত ভাবে সে সকলকে এড়িয়ে একপাশে সরে যায়। তার নাগাল পাওয়া যেন এখন ভারি দুর্ঘট হয়ে উঠেছে।"

কল্যাণী তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "অনেকটা আশা করেছিলুম কিনা,

তাই সব আশাতেই ছাই পড়ে গেল। এর মধ্যে অনেক কথা আছে, সব শুনতে পাবে, আজ রাত অনেক হয়েছে,সে সব কথা বলবার অবকাশ নেই, তুমি যাও শুয়ে পড় গিয়ে, আর রাত জেগো না।"

প্রভাত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি অনেক কথা জানি দিদি, সেই জন্যেই ভাবি মিনুর ভবিষ্যৎটা কি দুঃখের মধ্য দিয়েই চল্‌বে? যাই হোক, সেই সকালে খেয়েছে দিদি, তাকে ডেকে এনে যা হয় কিছু খেতে দাও।"

কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "থাক্ গিয়ে, আমি অমন মেয়ের মুখ আর দেখতে চাইনে, আমার আজ যে কত দূর লজ্জা পেতে হলো সেটা সে যখন বুঝলে না, আমিই বা কেন তার জন্যে মর্‌ব! বড় স্নেহে লালন পালন করে এত বড়টা করলুম, সে কি ওকে নিয়ে লোকের কাছে শুনব ব'লে? দরকার নেই আমার অমন সন্তানে, আমি মনে করব—"

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি মুখ ফিরাইয়া অশ্রুগোপন করিতে অসমর্থ হইয়াই দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন।

প্রভাত স্তম্ভিতভাবে খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। অবাধ্য মেয়ের জন্য মা যে কতটা বেদনা সহিতেছেন তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মৃন্ময়ীরই বা দোষ কি? সে কি করিয়াছে? প্রভাত মৃন্ময়ীকে এতটুকু বেলা হইতে কোলে পিঠে করিয়াছে, এই মেয়েটীকে সে যথার্থই ভালবাসিত। প্রভাতের মনে ব্যথা বাজিতে লাগিল, আচ্ছা সে যথার্থই বড় অভাগিনী, নিজে কি দোষ করিয়াছে তাহা জানে না, অথচ পিতা মাতার স্নেহ পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে।

সে মৃন্ময়ীর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বার ঠেলিয়া দেখিল, ভিতর

হইতে অর্গলরুদ্ধ করিয়া দেওয়া ; সে দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিল—"মিনু, দরজাটা খোল।"

দু'তিনবার ডাকিতে মৃন্ময়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

"হ্যাঁরে, আজ আমি কতকাল পরে বিদেশের ব্যথা জুড়াতে তোদের কাছে এলুম, তুই রাগ ক'রে দরজা বন্ধ করলি, এতে আমার কতটা কষ্ট হয়েছে তা বলতে পারিনে। এটা কি তোর উচিত কাজ হয়েছে ? তোর কি হয়েছে বল্ দেখি ?"

এতটুকু সহানুভূতি পাইয়া মৃন্ময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, তাহার কণ্ঠের মধ্যে বাষ্প জমিয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "কিছুই তো হয়নি মামা।"

তাহার হাত দুইটী নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রভাত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যে কথাগুলো কেন ব্যবহার করছিস্ মা ? আমি যে তোর ছেলে ছেলের কাছে মা কি কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে ? আমি তো তোর মা বাপ নই মিনু, ছেলের কাছেও যদি নিজেকে গোপন ক'রে রাখবি তা হলে আত্মপ্রকাশ কর্‌বি কার কাছে ?"

মৃন্ময়ীর অশ্রু আর গোপনে রহিল না, উপছাইয়া ঝর ঝর করিয়া প্রভাতের হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে লুকাইবার জন্য মাথা নত করিল, কিন্তু প্রভাতের হাতের উপর পড়িয়াই অশ্রু তাহাকে প্রকাশ করিয়া দিল।

"কাঁদছিস্ মিনু—ও কি ছিঃ মা, ছেলেমানুষের মত ক'রে কাঁদতে লাগলি শেষটায় ?"

মৃন্ময়ী মামার কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইল গোপন জমাট বাঁধা বেদনা তাহার অশ্রুর আকারে আজ বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

প্রভাত তাহাকে বাধা দিল না, তাহার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই মুহূর্ত্তে সে মৃন্ময়ীর বেদনা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিল, সে বুঝিল পিতামাতার অবহেলা— তা সে কৃত্রিমই হোক্, অথবা প্রকৃতই হোক্, সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, মৃন্ময়ীর বুকে সে অবহেলা কঠিনরূপেই বাজিয়াছে।

অনেকক্ষণ অবাধে চোখের জল ফেলিয়া সে নিজেই শান্ত হইল, চোখ মুছিয়া বলিল, "তুমি যাও মামা, শোও গিয়ে, রাত অনেক হয়েছে।"

প্রভাত বলিল, "তা হোক রাত, এটুকু রাত জাগলে আমার ক্ষতি হবে না। তোর মা শুতে চলে গেছে, কেউ কোথাও নেই, আমায় এই সময়ে তোর সব কথাগুলো বল্‌বি কি মা?"

মৃন্ময়ী বড় বড় চোখ দুইটী তুলিয়া মামার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "কি কথা বল্‌ব মামা?"

প্রভাত বলিল, "সত্যি তোর বিয়ে হয়েছিল?"

মৃন্ময়ী চুপ করিয়া রহিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভাত বলিল, "চুপ করে রইলি যে মিনু, আমাকে সত্যি কথা বলতেও তুই ভয় পাচ্ছিস? আমি তোর বাপের মুখে শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি।"

ক্ষীণকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিল, "এত বড় একটা কথা কি মিথ্যে হতে পারে মামা? এতে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই, সত্যিই আমার বিয়ে হয়েছে। মা বলছেন, আমার স্বামী নেই, যদিও বিয়ে হয়েছিল সে স্বামী মরে গেছে, আর সে বিয়েকে বিয়ে বলে গণ্যই করা যেতে পারে না, কেননা—"

তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের কথা আর বাহির হইল না।

প্রভাত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর সকল জড়তা দূর করিয়া

ফেলিয়া সে মৃন্ময়ীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এতে তোরই নারীজীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল মিনু, কিন্তু এতে তোকে অপরাধিনী করবার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। অপরাধী এতে কেউ নয়, যার অদৃষ্টে যা থাকে তা যে খণ্ডানো যেতে পারে না তোর এই বিয়ের ব্যাপারে তাই জানা যাচ্ছে। পুরুষকার এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, অদৃষ্টবাদ তার 'পরে দাঁড়িয়েছে। তুই বুঝি কিছুদিন আগে আবার দাদামশাইয়ের কাছে গেছলি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিতকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিল, "কাশীতে ঠাকুরদা যখন তাঁর অসুখের খবর দিয়ে পাঠালেন, তখন মা বাবা সেই আমার বিয়ের কথা মনে ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান নি, আমি জোর ক'রে গিয়েছিলুম, তাই তাঁরা আমার 'পরে এতটা রাগ করেছেন। ঠাকুরদা যে আমায় বড় ভালবাসেন মামা, বড় স্নেহ করেন, আমার বিয়ে দিয়ে কতটা অপরাধ করেছেন তা তিনি বুঝে কি কান্নাই কাঁদলেন, তা যদি তুমি দেখতে, তুমিও চোখের জল রাখতে পারতে না। আমার চেয়ে বড় দুঃখী তিনি মামা, তাঁর আর কেউ নেই।"

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

প্রভাত বলিল, "নিজের ভাবনা ভুলে গিয়ে তাঁর কথাই যে বিশেষ করে ভাবছিস্ এই আশ্চর্য্য! আচ্ছা, এসব কথা একদিন আমি তুলব তোমার বাপ মায়ের গেছে—"

ব্যগ্রকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিয়া উঠিল, "না মামা, এসব কথা তুমি একটাও তুলো না। মাঘ মাস মাত্র আমাদের কাছে তুমি থাকবে, এর মধ্যে অনর্থক ঝগড়া বিবাদ মনোকষ্ট কেন আন্‌বে? আমি বেশ আছি, এ কষ্ট আমার একটু গায়ে লাগে না, বাপ মায়ের কাছ হতে যতটা

দূরে আছি ততটা দূরেই বরাবর থাকব। তোমার পায়ে পড়ি মামা—”

ব্যস্ত প্রভাত উঠিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “বেশ মা, আমি কোন কথাই তাঁদের বল্‌ব না। তুই এবার ঘুমো গিয়ে—কিন্তু কিছু খেলিনে তো ?”

মৃন্ময়ী বলিল, “এখন কিছু খাব না মামা। তুমি যাও, আমিও শুয়ে পড়ি।”

প্রভাত বাহির হইয়া গেল।

১১

কয়েকটা দিন পরে কলিকাতার কাজ-কর্ম্ম সব মিটাইয়া সপরিবারে হরেনবাবু অনন্তপুরে ফিরিলেন, প্রভাতও কর্ম্মস্থলে যাইবার আগে বাংলার পল্লীগ্রামটা দেখিয়া লইতে সঙ্গে আসিল।

এই কয়েকদিন কল্যাণী অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া স্বপনের কাহিনী প্রভাতের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। উপসংহারে বলিয়াছিলেন, “যাক গিয়ে সে, তার জন্যে আর মাথা ঘামানোর এতটুকু দরকার আমাদের নেই। তোর আবার পাত্রীর অভাব প্রভাত? লোকে জানে, স্বপনের সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে, তবু অনেকে ঝোঁক করতেও ছাড়ছে না। অমর বোসের মেয়ে লতিকা—এবার খুব ভাল হ’য়ে বি-এ পাস করেছে, বোধ হয় দেখেছিস তাকে, যেমন রূপ তার তেমনি গুণ। বাপের একটী মাত্র মেয়ে, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সেই পাবে, সে তোর বড় পক্ষপাতিনী, একবার বল্‌লেই তার বাপ এখনি রাজি হবেন,

সে তো রাজি আছেই। স্বপন যে এমন ভাবে ভবানীপ্রসাদের কুহক-মন্ত্রে ভুলে যাবে, তা আমি কখনও ভাবিনি, তাকে অনেক বুঝিয়েও ফিরাতে পারলুম না। তবে তুই যদি নিজে ব'লে বুঝিয়ে এখনও পারিস্ তবে চেষ্টা দেখ্।"

প্রভাত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার মনের ভাব হরেনবাবু না জানুন, কল্যাণীর কাছে গোপনীয় ছিল না। তিনি জানিতেন, প্রভাত বাল্যকাল হইতেই স্বপনকে গভীর ভালবাসে, দীর্ঘকাল প্রবাসে বাস হেতু তাহার সে নিবিড় ভালবাসা একটুও কমে নাই, বরং আরও বাড়িয়াছে। এই অসীম ভালবাসার জন্য সে নিজেকে পর্য্যন্ত হারাইতে পারে; তাঁহার মনে এই আশঙ্কাই জাগিতেছিল। সে যে পৌত্তলিক স্বপনকে বিবাহ করিবে ইহা কল্যাণীর অসহ্য। স্বপন যেমন আছে—যদি মত না বদলাইতে পারে, তবে এমনই থাক্, তিনি কিছুতেই তাহাকে প্রভাতের ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিগণিত হইতে দিবেন না। শিক্ষিত সমাজে স্বপনকে লইয়া বেশ একটু গণ্ডগোল সৃজিত হইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাসও করিতেছিল। কল্যাণীর পরিচিতা—যাঁহারা জানিতেন প্রভাতের সহিত স্বপনের বিবাহ হইবে, তাঁহারা কল্যাণীকে ইহার মধ্যে একচোট ঠাট্টাও করিয়া লইয়াছেন, অনেক শুভানুধ্যায়িনী বার বার কল্যাণীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন; ঘোর পৌত্তলিক স্বপনের সঙ্গে প্রভাতের বিবাহ যেন না দেওয়া হয়, এই বিবাহে প্রভাত সুখী হইতে পারিবে না।

প্রভাতের অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ প্রভাতকে পরিহাস করিতেছিল—প্রভাত এবার ফুল-তুলসী যোগাড় করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া শিব-কালী-কৃষ্ণ পূজা করিবে; স্বপনের আদর্শানুসারে তাহাকেও চলিতে হইবে ইত্যাদি

ইত্যাদি। প্রভাতের ভ্রূদু'টি মুহূর্ত্তের জন্য একবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তারপরই মুখে তাহার চিরাভ্যস্ত মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—"আগে বিয়েই হোক্ তো, তার পর দেখা যাবে।"

তাহারা যে আনন্দপুরে আসিয়াছে, এ সংবাদ স্বপন পাইল। মৃন্ময়ীকে সে ছোটবেলা হইতে ছোট বোনের মতই ভালবাসিত, একবার তাহাকে দেখিবার জন্য সে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

বৈকালে হরেনবাবু একাই দেখা করিতে আসিলেন, প্রভাত ও মৃন্ময়ী কাহাকেও সঙ্গে আনেন নাই।

স্বপন তখন বাহিরের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে বসিয়া সম্মুখে আকাশ পানে চাহিয়াছিল। নদীর ওপারে ঘনবনানীর অন্তরালে আরক্তিম সূর্য্য তখন ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে; বেলাশেষের রক্তরশ্মি ধরার গায়ে শেষ চুম্বন দিয়া যাইতেছে। নদীর উপর দিয়া দলে দলে পাখীগুলি ফিরিয়া নীড়াভিমুখে চলিয়াছে, শান্ত পল্লীবক্ষ তাহাদের কলরবে শব্দায়মান হইয়া উঠিয়াছে।

কি শান্ত সুন্দর দৃশ্য! স্বপন বিমুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়াছিল, কোলের উপর বইখানা যেমন তেমনিই পড়িয়াছিল। দ্বারের কাছে ভৃত্য সরযূয়া যে কোনও আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বারোয়ান আসিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম দিয়া দাঁড়াইল,—"ম্যানেজার বাবু আয়া দিদিসাব্, আপ্‌কো সাথ মূলকাৎ—"

স্বপন বলিল, "উন্‌কো ভেজ দেও।"

অন্যমনস্ক দৃষ্টি ফিরাইয়া সে বইয়ের উপর রাখিল, আনমনা ভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল, একটী পৃষ্ঠার একটী লাইনে সে চিত্তসংযোগ করিতে পারিল না।

"এই যে মা, শরীর ভাল তো?"

হরেনবাবুর কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "বেশ আছি কাকা, আপনি ভাল আছেন তো কাকা, বাড়ীর সব ভাল?"

হরেনবাবু সম্মুখের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বসো মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

স্বপন বসিল।

হরেনবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "এই কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ মা।"

স্বপন একবার নিজের হাতখানার পানে চাহিয়া হাসিল, "না কাকা, রোগা একটুও হইনি, যেমন তেমনিই আছি। কোনও অসুখ হয়নি, রোগা হব কেন?"

গম্ভীর মুখে হরেনবাবু বলিলেন, "ওই তো মা, মস্ত বড় ভুল তোমাদের। মনে কর অসুখ না হ'লে রোগা হবে কেন? তুমি যে রকম অনিয়ম করছো এতে স্বাস্থ্য কি থাকে? এই যে বেলা একটার সময় স্নান করা, দুটোর সময় খাওয়া, এগুলো কি অনিয়ম নয়? মানুষের অসুখের চেয়ে অনিয়মে স্বাস্থ্য বেশী ভাঙ্গে, এ কথা তোমায় বেশী ক'রে বল্‌তে হবে না।"

স্বপন নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, কথা কহিল না।

উৎসাহিত হরেনবাবু বলিলেন, "এ সব কি তোমার শরীরে সহ্য হয় মা? যাদের এতটুকু বেলা হ'তে অভ্যাস আছে, তাদের অনিয়মে বেলায় খাওয়া, উপবাস সবই সয়ে যায়। তা ব'লে যারা করে নি কখনও, তাদের জোর ক'রে করলেই যে সহ্য হ'য়ে যাবে এমন কথা নেই। আমি কোন-

দিনই এ খোঁজ নেইনি। কেননা জানতাম, তুমি ঠিক আগেকার মত সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যেই খাও, সে দিন তোমার কাকিমার মুখে এ কথা শুনে আমি যেন আকাশ হ'তে পড়লুম। ভেবেছিলুম তোমায় বুঝিয়ে দেব, আত্মাকে কষ্ট দিলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। কেননা আত্মাই ভগবান্ এ কথা হিন্দুশাস্ত্রই বলে থাকে। সেই দিনই প্রভাতের টেলিগ্রাফ খানা পেলুম, সে আসছে। তোমায় সে কথা জানিয়ে ছুটি নিতে এলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি তোমার খাওয়ার কথা তুলতেও পাই নি, মনেও ছিল না। আমি বরাবর যা বল্‌ছি তা উড়িয়ে দিয়েই আসছো। এই কথাটী শোন মা, ও রকম ক'রে দেহকে কষ্ট দিলে আত্মাই কষ্ট পায়, এ রকম কষ্টে তোমার নারায়ণ কখনই সন্তুষ্ট হ'তে পারবেন না।"

স্বপন মুখ তুলিল, ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "কোনদিনই আমি আপনার কথা উড়িয়ে দেইনি কাকা, যেটা অবশ্য প্রতিপাল্য সেইটাই পালন করে যাচ্ছি মাত্র। আপনার সব উপদেশ যে প্রতিপালন করতে পারছিনে, এতে আমি কতদূর লজ্জিত হয়েছি তা ব'লে জানাতে পারছিনে। অবাধ্য অবুঝ মেয়ে আপনার কাকা, তা ব'লে তাকে ছাড়লে তো হবে না।"

সন্তুষ্ট হইয়া হরেনবাবু বলিলেন, "তাকি ছাড়তে পারি মা? সন্তান মন্দ হয়, কিন্তু বাপ মা কখনই মন্দ হতে পারে না। এই যে মিনু এত কাণ্ড করছে, তাই ব'লে তাকে কি ফেল্‌তে পারছি? এ তোমার একটা খেয়াল তা বুঝেছি। এ রকম বদখেয়াল ভারি খারাপ। খেয়ালের ঝোঁকে লোকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। না মা, হেসো না, তুমি যা করছো এ আত্মহত্যা বই কি, তোমার মধ্যে যে এতকাল ছিল তাকে তুমি হত্যা ক'রে এখন অন্যকে এনে তোমারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করছো; একে কি বলা যায় তা তুমিই বুঝে বল। জীবনটা কি ছেলেখেলার জিনিস স্বপন,

দেহটা কি এতই হেলার জিনিস, যে তার'পরে এতটুকু দৃষ্টি রাখবে না। যা খুসি অত্যাচার তার'পরে চালিয়ে যাবে? এমন নয় যে তুমি অশিক্ষিতা। দেহকে কষ্ট দিলেই মনে করবে ভগবানকে পাওয়া হলো। তুমি শিক্ষিতা, সবই জানো, জেনে শুনে বুঝে সুঝে যদি এ রকম কৃচ্ছতা ক'রে ভগবানকে পেয়েছি ভাব, তাতে লোকে তোমায় ঠাট্টাই করবে। এই কলকাতায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সেই হাস্‌ছে। শুনে আর দেখে কি লজ্জা পেয়েছি মা, তা আর কি বলব। উত্তর দেবার মুখ নেই, জোর ক'রে বলতে পারছিনে এ মিছে কথা। কেননা এ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। না মা, এ রকম পাগলামি আর করো না; যা করেছ তা এখনও সুধরে নেওয়া যেতে পারে; এর পর আর এ ভুল তোমার সুধরানো যাবে না।"

উত্তরের প্রতীক্ষায় তিনি স্বপনের পানে চাহিয়া রহিলেন, স্বপন উত্তর দিল না। তাঁহার সহিত বৃথাতর্কে সে অগ্রসর হইল না। কেননা এ তর্কে কোনও ফল নাই। তিনি কিছুই বুঝিতে চাহিবেন না, জোর করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকে—হিন্দুমতকে কাটিয়া উড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে কেবল অশান্তিই উৎপন্ন হইবে মাত্র। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যান, স্বপন নীরবে শুনিয়া গেলেই হইল।

সে কথা আর মোটেই না তুলিয়া সে বলিল, "মিনু কি করছে বলছিলেন না কাকাবাবু?"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে হরেনবাবু বলিলেন, "তার কথা মনে করতে গেলেও আমার অন্তরটা বিষিয়ে ওঠে মা। সে তোমার কাছেই আসতে চায়, আজ আমার আগেই আসবে বলে প্রস্তুত হয়েছিল, অনেক ক'রে তবে তাকে রাখা হয়েছে। তুমি শুনেছ কি মা, বোধ হয় শুনেছ, তার—তার—"

কথাটা বলিতেও সুর এড়াইয়া আসিল।

স্বপন জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার পানে চাহিল।

হরেনবাবু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কি শুনেছ, আমার বাবা তার খুব ছোটবেলায় হিন্দুমতে বিয়ে দিয়েছিলেন?"

স্বপন বলিল, "শুনেছি কাকা, অবশ্য আপনারা কেউ বলেন নি; মিনুর মুখেই একথা শুনেছিলুম। তারপর কাকিমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলুম, সে ছেলেটী বিয়ের পর কয়েকমাসের মধ্যেই মারা গেছে।"

হরেনবাবু শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আমরা খোঁজ ক'রে তাই শুনতে পেয়েছি। তুমি বোধ হয় জানো, শশাঙ্কের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। আমার খুব ঝোঁক ছিল, শশাঙ্কের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। ছেলেটী খুব ভাল, মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী করছে, এই বয়সে যশও যথেষ্ট পেয়েছে। সে মিনুকে নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করতে চায়, কিন্তু মেয়ে একেবারে বেঁকে বসেছে।"

কৌতূহলাক্রান্তা স্বপন বলিল, "কি রকম?"

হরেনবাবু বলিলেন, "সে বল্‌ছে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, মানুষের একবারই বিয়ে হয়ে থাকে, দশবার বিয়ে হয় না। তার স্বামী মারা গেছে এ কথা সে প্রথমটায় বিশ্বাস করতেই চায় না, জোর ক'রে বল্‌ছিল তার স্বামী বেঁচে আছে। তারপর যখন অনেক প্রমাণ দেখালুম, তখন গুম্ হয়ে বসে রইল। তোমার কাকিমা অনেক ক'রে বলবার পরে শেষকালে সেই একটু উত্তর দিলে, আমার বিয়ে একবার হ'য়ে গেছে আর হ'তে পারে না। স্বামী আমার যদি বাস্তবিকই মারা গিয়ে থাকেন, তাই ব'লে আমায় আবার যে বিয়ে করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। বলব কি মা, ছেলেমুখে এই সব পাকাকথা শুনে আমি তো একেবারে

অবাক্ হয়ে গেছি। ভেবে পাচ্ছিনে, এ সব শিক্ষা সে পেলে কোথায়। খৃশ্চানের মেয়ে এ গোঁড়া হিন্দুমত কুড়িয়ে পেলে কোথায় ? ভাব দেখি মা, আশ্চর্য্যের কথা নয় কি—নয়বছরের যে মেয়েটীর বিয়ে হয়েছিল,এই আট নয় বছর সেই কথা সে মনে ক'রে রাখে,সেই স্মৃতি নিয়ে সে এখনই ব্রহ্মচারিণী হতে চায় ? কি জানে সে তখন বিয়ের ? স্বামীকে যে দেখেছিল, সে কথা তার কি মনে আছে ? কোন একটা ছায়ামূর্ত্তি কল্পনায় মনে এঁকে সে এখন তার দীর্ঘজীবনটা তার স্মৃতির পূজায় কাটিয়ে দিতে চায়, এ কি সাংঘাতিক খেয়াল ! এই কথাটা যদি সমাজে প্রকাশ হয়, আমাদের কি মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে ? খৃশ্চানসমাজে আমার মান আছে, প্রতিপত্তি আছে, আমার মেয়ে যদি জোর গলায় সকলের কাছে ব'লে বেড়ায়—সে গোঁড়া হিন্দু, তা হলে আমায় বাধ্য হ'য়ে আত্মহত্যাই করতে হবে দেখে নিয়ো। একটী মাত্র মেয়ে আমার, অনেকটা আশা করেছিলুম বলেই সে আমার সকল আশায় ছাই দিয়ে দিলে।"

স্বপন বিস্ময়ে চুপ করিয়াছিল, ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইয়াছে তাহা সে জানিত না। সে মৃন্ময়ীকে যতদূর চিনিত এত বোধ হয় তাহার বাপ মাও চিনিতেন না। কেননা সে মনের সব কথা অসঙ্কোচে স্বপনদি'র কাছে প্রকাশ করিত, পিতা মাতার সম্মুখে সে মুখ তুলিয়া কখনও একটা কথা ভাল করিয়া বলিতে পারে নাই। খুব কম কথায় কিছুতেই তাহার ধৈর্য্য যাইত না, নিতান্ত উৎপীড়িতা না হইয়া সে এতগুলি স্পষ্ট সত্য কথা মায়ের সম্মুখে কখনই বলিতে পারে নাই।

সন্তানে মায়ের কাছে যতটা আব্দার করিতে পারে, বাপের কাছে ততটা করিতে পারে না। বাপকে সকল সন্তানেই একটু সঙ্কোচ করিয়া

চলে ; কিন্তু মায়ের কাছে সে সঙ্কোচ থাকে না, ভয় থাকে না। এই শান্ত নম্রস্বভাবা মেয়েটী মায়ের কাছেও কখন আবদার করে নাই, মায়ের সঙ্গও সে প্রাণপণে এড়াইয়া চলিত। ইহার কারণও ছিল। কল্যাণী মাতৃত্বপদটা লাভ করিয়াছিলেন মাত্র, যথার্থ মা হইতে পারেন নাই ; কোনও দিনই তিনি সন্তানের সংস্পর্শে আসেন নাই, ছোট বেলা হইতে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলিয়াছেন। সে পরের কাছেই লালিত পালিত হইয়াছিল। কল্যাণী শুধু শাসন করিয়া তাহার চরিত্রগঠনের ভারটুকু লইয়াছিলেন। সেই জন্যই মৃন্ময়ী মায়ের স্নেহ কখনও অনুভব করিতে পারে নাই,—নিরন্তর কেবলমাত্র শাসন পাইয়া সে মাকে ভয় করিতেই শিখিয়াছিল।

স্বপন অন্তরে তাহার দৃঢ়তাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এই পিতা মাতা—যাহাদের সে আজীবন কাল ভয় করিয়াই আসিয়াছে, ইহাদের সম্মুখে সে সেদিন কি সাহসের সহিতই দাঁড়াইয়াছিল, কতদূর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, সে বিবাহিতা—তাহার স্বামী না থাকিলেও সে সেই স্বামীর ধ্যানেই জীবন কাটাইয়া দিবে। তাহার মত লাজুক মেয়ের পক্ষে যাহা একেবারেই অসম্ভব সে তাহাও করিয়া ফেলিয়াছে।

হরেনবাবু অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়াছিলেন। স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই তার স্বামী মারা গেছে কাকাবাবু ?"

হরেনবাবু গর্জ্জনের সুরে বলিলেন,"চুলোয় যাক তার স্বামী! একবার খোঁজ করেছিলুম, এই রকম একটা কথা শুনে আর খোঁজ নেই নি। ধর যদিও সে বেঁচে থাকে, কোন্ শক্তিতে কোন্ সাহসে সে আমার মেয়েকে স্ত্রী ব'লে পাওয়ার দাবী করবে ? জুয়াচুরী ক'রে যে বিয়ে তা

কখনও বিয়ে নয়, এ ধর্ম্মসঙ্গত নয়, আইনসঙ্গত নয়। একি বিয়ে বলে গণ্য হতে পারে স্বপন, খৃশ্চানের মেয়ে সে, শিশু মাত্র, অভিভাবক আমরা কিছু জানতে পারলুম না—”

রোষে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ দুইটী অস্বাভাবিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

“কিন্তু সে তো তাই মনে ক’রে রেখেছে কাকা।”

হরেনবাবু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “নিজেরই অহিত করছে, আর কিছু নয়। তার ভুল ভাঙ্গাবার এত চেষ্টা করলুম, কিছুতেই এ ভুল দূর করতে পারলুম না। যাই হোক্ আমরা তাকে সহজে এ রকম ক’রে নিজের জীবনটা নষ্ট করতে দেবোনা। কে তার স্বামী, তার সম্বন্ধে সে কতটুকু জানে, যাতে তার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবে? শুনেছি বিয়ের সময়ে সে ছেলেটীও ছেলেমানুষ ছিল, বছর বার তের বয়েস হবে। যদি সে বেঁচে থাকে তার বয়স এখন বাইশ তেইশ হবে। কে বলতে পারে সে এখন কি হয়েছে, চোর হয়েছে, কি ডাকাত হয়েছে—”

স্বপন ধীরস্বরে বলিল, “উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে মানুষ হতেও পারে।”

ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া হরেনবাবু বলিলেন, “মনকে চোখ ঠারা আর কি! পাড়াগাঁয়ের ছেলে যে মানুষ হতে পারে এ আমি বিশ্বাস করিনে।”

স্বপন বলিল, “সে কাথা বলবেন না কাকা, অনেক পাড়াগাঁয়ের ছেলে মানুষ হ’য়ে গেছে, এর প্রমাণ যথেষ্ট আছে।”

হরেনবাবু নিজে পল্লীগ্রামের ছেলে ছিলেন, তাই স্বপনের এই কথায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, “যাই হোক্ অনিশ্চিতকে নিয়ে আমি বেশী বক্‌তে চাইনে। মিনু যদি এমনিভাবে

থাকে, তা হলে শেষটা যে ওর কি হবে, আমি কেবল তাই ভাবি তোমার কাকিমা রাগ ক'রে ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছেন, প্রভাতের সঙ্গেও বড় একটা কথাবার্ত্তা বলে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি একটা হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, "যাক্ গিয়ে, যা থাকে ওর অদৃষ্টে হবে। এখন তবে উঠি মা, রাত হয়ে এলো, কলকাতার পথ নয়, পল্লীগ্রামের—পথ সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে সব নিঝুম হয়ে পড়ে, আজকের মত ওঠা যাক্, কাল সকালে আবার আসব।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নীলাকাশের গা বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। নদীর ওপারে ঘন অন্ধকার, আকাশের লাল আলো এ পারটা তখনও উজ্জ্বল করিয়াছিল।

স্বপন অন্যমনস্কভাবে বলিল, "একটু চা খেয়ে যাবেন না?"

"এখন থাক, বাড়ী হতে খেয়ে এসেছি।"

হরেনবাবু উঠিলেন।

১২

সন্ধ্যা।অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শরৎকালী রন্ধন-গৃহে রন্ধনে ব্যস্ত, স্বপন উপরে নিজের গৃহে বই লইয়া বসিয়াছিল। সমস্ত দিন সকলের সঙ্গে দেখা-শোনা কথাবর্ত্তায় সে বড় ব্যস্ত থাকিত, অবকাশ মিলিত না, রাত্রিটা তাহার বিশ্রামের সময় ছিল। সন্ধ্যার পরে বসিয়া সে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিত, এগারটার কমে সে আহার করিত না।

হরেনবাবু সেই গিয়াছেন আর আসেন নাই, লোক পাঠাইয়া সে জানিয়াছিল তাঁহার অসুখ করিয়াছে। মৃন্ময়ী বা প্রভাত কেহই তাহার সহিত দেখা করিতে আসে নাই। সে ভাবিয়াছিল, নিজেই গিয়া দেখা করিবে, নানা কারণে সে ছুটি পাইতেছে না।

হরেনবাবুর প্রকৃত মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি যে কতদূর সত্যবাদী ইদানীং পদে পদে সে তাহার প্রমাণ পাইতেছিল। স্বপন দিন দিন জ্ঞানলাভ করিতেছিল, মানুষকে চিনিবার জানিবার দিন তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে যে বড় নিরুপায়। সে দেখিতেছিল, সকলেই তাহার চোখে ধূলা দিতে চায়, ম্যানেজার বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য পেয়াদাটা পর্য্যন্ত কেহই বিশ্বাস রাখিতে জানে না। সে বেশ জানিতেছিল, ইহারা দুই হাতে তাহার বিষয় লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু হায়রে, মুখ থাকিতেও তাহার মুখ নাই, চোখ থাকিতেও তাহার চোখ নাই যে; সব দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও তাহাকে বোবা কালা অন্ধ সাজিয়া থাকিতে হইতেছে যে।

দুনিয়ায় এরূপ শাস্তি বুঝি আর নাই। উপায় নাই বলিয়া অন্যায়ও সহ্য করিয়া যাইতে হয়, জানিয়া শুনিয়া এই মহাপাপের প্রশ্রয় দিয়া যাইতে হয়। কে আছে তাহার এমন বন্ধু যে বিশ্বাস রাখিবে, প্রাণ দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে?

আজ বৈকালে সে হঠাৎ একখানা পত্র পাইয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সেই পত্রে সে জানিয়াছিল, তাহার রংপুর জেলার মহালটী বাকি খাজনার দায়ে যায়-যায় হইয়াছে। সতীনাথ নিকটে ছিল, পত্রখানা সেও দেখিতে পাইয়াছিল, সে জানাইল এ সংবাদ

সম্পূর্ণ সত্য, সেও একথা শুনিয়াছে, সাহস করিয়া স্বপনকে জানাইতে পারে নাই।

কি করিয়া যে কি ঘটিয়া গেল, স্বপন তাহা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। ম্যানেজার বাবু প্রায়ই মহালে ঘুরিতেন, মাস দুই আগে তিনি রংপুরে গিয়াছিলেন, কই এ সব কথা একদিনও তো তাহাকে জানান নাই। এই মহালটী হইতেই তাহার প্রচুর আয় হয়, ইহার মত বড় মহাল তাহার আর একটীও ছিল না।

কাহাকে সে বিশ্বাস করিবে, কাহার উপর ভার দিবে? অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া সে সতীনাথকে ডাকিল, "আমার সঙ্গে রংপুর যাবে সতীনাথ?"

বিস্মিত সতীনাথ বলিল, "আপনি যাবেন কেন দিদিমণি?"

স্বপন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কারও 'পরে ভার দিতে আমার আর ইচ্ছে নেই, কেন তা জানো? এই যে কয়বছর প্রজারা খাজনা দেয় নি, আমরাও গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দেই নি, এ কথা আমায় কেউ জানাই নি, জানি নে এর মধ্যে কি ষড়যন্ত্র আছে। দেখছি জগতে যাকে বিশ্বাস কর্‌ব সেই বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বে, তাই ভাবছি কারও 'পরে ভার দিয়ে, কাউকে বিশ্বাস ক'রে আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে আনব না, নিজে গিয়ে সেখানে দাঁড়াব। আমার মনে আশা আছে, আমি গিয়ে দাঁড়ালে প্রজারা খাজনা মিটিয়ে দেবে, আমিও তাই দিয়ে কয়বছরের বাকি খাজনা মিটিয়ে দিয়ে মহালটীকে বাঁচাব।"

সতীনাথ বলিল, "হঠাৎ নিজেই যাওয়া কি ভাল হবে দিদিমণি! ম্যানেজার বাবুকে ডাকান, তাঁর কৈফিয়ৎ নিন, তিনি কেন জানান নি আপনাকে, তা শুনুন, তারপর নিজে যেতে কতক্ষণ? আপনি যখন সব

বন্দোবস্ত করবার জন্যেই তাঁকে বেতন দিয়ে রেখেছেন, তখন তাঁর একটা কৈফিয়ৎ নেওয়া দরকার তো।”

স্বপন ভাবিয়া দেখিল তাহার কথা সত্য, হরেনবাবুর কৈফিয়ৎ নেওয়া আগে দরকার, তাহার পর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে ?

একখানা পত্র লিখিয়া সতীনাথের হাতে দিয়া সে হরেনবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিল।

স্বপন বইখানা লইয়া বসিয়াছিল মাত্র, মনে শান্তি ছিল না, দেহও তাহার আজ বড় অসুস্থ ছিল। সতীনাথের অপেক্ষাই সে করিতেছিল, সে আসিলে হরেনবাবুর সংবাদ পাওয়া যাইবে।

পর্দ্দাটা সরাইতে সরাইতে সতীনাথ ডাকিল “দিদি—”

ব্যগ্রভাবে স্বপন বলিল, “এসো ভাই, আমি তোমারই অপেক্ষা করছি।”

আদব-কায়দার ধার সতীনাথ কোনদিনই ধারিত না, সে যেন এই বাড়ীরই একটী ছেলে হইয়া গিয়াছে। তাহার ছোটখাট অনেক ত্রুটিই ছিল, সে সব স্বপনের চোখে কোনদিনই ঠেকিত না। হরেনবাবু তাহার শিষ্টাচার-বিরুদ্ধতা আদৌ সহিতে পারিতেন না, কতদিন তিনি সতীনাথকে শিষ্টাচার সম্বন্ধে সাবধানও করিয়া দিয়াছেন। সতীনাথ দুই একদিন সাবধান হইয়া চলে, তাহার পর আবার সব ভুলিয়া যায়। শিষ্টাচারের শক্তবন্ধনে জড়াইয়া পড়া এই পল্লীনিবাসী সরলপ্রাণ তরুণের পক্ষে একেবারেই দুঃসাধ্য ছিল।

সটান কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল, উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “আপনিও যেমন দিদিমণি,

তাই অমন ম্যানেজারকে কাজে রেখেছেন, আমি যদি হতুম এতদিন লোকটাকে তাড়িয়ে দিতুম। উঃ, কি লোক সে আমি কেবল তাই ভাবছি।"

স্বপন মলিন হাসিল,বলিল, "তাড়িয়ে দেওয়া কি মুখের কথা ভাই ? উনি আমার বাপের বন্ধু, আজ দশ বার বছর ধ'রে ম্যানেজারী করছেন, তাড়ানো বলা যত সহজ—কাজে তত কিছুতেই নয়।"

উত্তেজিত সতীনাথ বলিল, "সোজা কথা নয় ? আমায় আপনি একবার আদেশ দিন না, আমি এখনি গিয়ে বলে আসছি, আপনার কাজে জবাব হয়ে গেল, এখন সোজা রাস্তা দেখুন।"

মাথা নাড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে স্বপন বলিল, "এত শীগ্‌গির খবর পেয়েই তা করা উচিত নয় সতীনাথ। আগে সব প্রমাণগুলো পাই, তারপর সব ব্যবস্থা কর্‌ব। এই তো খানিক আগে তুমিই আমায় সে ব্যবস্থা দিয়ে গেলে, দু' ঘণ্টা যেতে না যেতেই সে কথা ভুলে গেলে ভাই ?"

সতীনাথ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "যথার্থই ভুলে গেছি। দিদি, আমার ওই এক স্বভাব, রাগ্‌লে পরে আর জ্ঞান থাকে না, কি বলি না বলি তার কিছু ঠিক নেই। তা যাই বলুন দিদিমণি, আপনার বাবা বেঁচে থাকতেই ম্যানেজারবাবু বন্ধুত্বের ভাণে তাঁর চোখে ধূলো দিয়ে অনেক কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। শুনছি তিনি কিছুই দেখতেন না ; সব ভার ম্যানেজার বাবুর 'পরে ফেলে দিয়ে তিনি শুধু দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। যখন আসতেন তখনও কিছুর হিসেব নিতেন না, কিছুই দেখতেন না। ম্যানেজার বাবু অনেক দিন হ'তেই কাজটার সূত্রপাত করেছেন ; কিন্তু বাইরে খুবই আত্মীয়তা দেখাচ্ছেন। আমি শুনেছি আর এক সপ্তাহের মধ্যে খাজনা দিতে হবে, সোমবার শেষ দিন। এর

মধ্যে খাজনা না দিতে পারলে আপনার বড় মহাল লাটে উঠবে। তারপর—মনে করছেন কি আর কিছু আপনি রাখতে পারবেন? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার চোখে ধূলো দিয়ে সর্ব্বস্ব নিতে পারেন এ বুদ্ধিটুকু তাঁর বেশই আছে।"

স্বপন নীরবে বইখানার পাতা উল্টাইতে লাগিল, তাহার মুখে একটু অধীরতার ছায়াও পড়ে নাই।

সতীনাথ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "বাঃ, আপনি এখনও যে চুপ ক'রে রইলেন দিদি ?"

স্বপন বলিল, "এখনি তো কিছু করা যাবে না সতীনাথ, সকাল হোক্, তারপর ব্যবস্থা হবে। তুমি যে হরেনবাবুকে ডাকতে গেলে, তিনি কি বললেন ?"

সতীনাথ বলিল, "তাঁর নাকি জ্বর হয়েছে, বল্লেন একটু ভাল হয়েই দেখা করতে আসবেন। বুঝছেন না দিদি, এ সবই তাঁর কৌশল। আপনার হাতে যে পত্রখানা পড়েছে তা তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, কৈফিয়ৎটা ঠিক করে নেবার জন্যে জ্বরের ভাণে দুদিন কাটাতে চান। আপনি লেখাপড়াই শিখুন, আর যাই করুন, জমীদারীর কূট চাল তো জানেন না, এতখানি বয়েস আপনার চর্ব্বিত চর্ব্বণ কর্তেই কেটে গেছে, এ সব তো শেখেন নি, কেউ শিখায়ও নি। মেয়েদের সরল জেনে তাদের ঠকাতে পুরুষদের একটুও দেরী হয় না, কেননা এ সব চালে তারা সিদ্ধহস্ত। রাগ করবেন না দিদি, কারণ আমি আপনাদের জাতির নিন্দে করছি, আপনাদের প্রধান দোষ এই একটু মিষ্ট কথা শুনলেই মন গলে যায়, চোখে অমনি জল আসে। এই রকম স্বভাব জেনেই পুরুষেরা প্রতি পদে আপনাদের ঠকিয়ে যায়। এই

অতিরিক্ত কোমলতার জন্যেই মেয়েরা মরেছে, কিছুতেই তারা দৃঢ় হতে পারছে না, সম্ভব পারবেও না।”

সে যে ভাবে মুখখানা ফিরাইল, তাহা দেখিয়া স্বপন একটু হাসিল, সে হাসি দেখিয়া সতীনাথ আরও জলিয়া উঠিল, “আর হাসবেন না দিদিমণি, কি সর্ব্বনাশ আপনার হচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না, তাই এখনও আপনার হাসি আসছে।”

হাসি চাপিয়া শান্তকণ্ঠে স্বপন বলিল, “কি করব তবে ভাই, মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে বল, কাঁদতে বল ? এতে ভেবেই বা কি করব কেঁদেই বা কি করব, ভগবানের ইচ্ছা যা তাই পূর্ণ হবে। তুমি আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারব না। হতে পারে হয় তো এ বিশাল জমিদারীর ভার বহনের যোগ্যতা আমার নেই, আমি এর সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা, তাই তিনি কোনও উপযুক্ত যোগ্য লোকের হাতে এ জমিদারি তুলে দেবেন। মানুষের চিরদিনই তো একই সমান যায় না সতীনাথ, যে অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশে পৃথিবীর বুকে একবার রাত একবার দিন গড়িয়ে আসছে, একবার আলো তার পাশেই আবার অন্ধকারের সৃজন হচ্ছে, সেই নিয়মের বশে মানুষের সুখ-দুঃখও যাওয়া আসা করছে। আলোর পাশে আঁধার যেমন অনিবার্য্য ;—সুখের পর দুঃখও তেমনি অনিবার্য্য। এই ক্ষণিক সুখ ক্ষণিক দুঃখ এই দুটো আসা যাওয়া করবেই ; সুখের বেলা হাসব, দুঃখের বেলা কাঁদব না কেন ভাই ? সবই ভগবানের ইচ্ছা, এতদিন এই ত্রিতল হর্ম্মে বাস করেছি, এবার না হয় কুঁড়েঘরে গিয়ে বাস করব। নানা ব্যঞ্জনের স্বাদ নিয়েছি, এবার না হয় শাক ভাতই খাব। তবুও বলব ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তাঁর বিচারের দোষ আমি কখনও যেন না দেই, এই আমার লক্ষ্য। তবুও

বলবে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলুম কেন ? বড় দুর্ব্বল মানুষের মন ভাই, আঘাতটা প্রথম বেলায় বড় বেশী রকম লাগে। মনে বড় দুঃখ হয়েছে সতীনাথ, আমি বিরক্ত হয়েছি, রাগ করেছি, কিন্তু সে ভগবানের 'পরে নয়, মানুষের 'পরে। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা দেখছি, আমারও রাজা লীয়ারের মত চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে দাউ আরট নট সো আনকাইণ্ড অ্যাজ ম্যানস ইনগ্রেটিচিউড। গল্প পড়েছি, আজ সেই ভাবটা মনে বড় আঘাত করছে, হায়রে, বড় আঘাত করে এই বিশ্বাস-ঘাতকতা—এক নিমেষে চোখ ফুটিয়ে দেয়। রাজা লীয়ার শেষে আশ্রয় পেয়েছিলেন, আমিও কি আশ্রয় পাবনা ? এই কৃতঘ্নতার মাঝখান হতে কোনও সত্যবিন্দু কি ভেসে উঠবে না, যাতে আমি এতটুকু সান্তনা লাভ করতে পারব ?"

সতীনাথ কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে স্বপনের বিমর্ষ অথচ জ্যোতিপূর্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "দেখুন দিদি, সেই সত্যবিন্দু আবিষ্কার করাই কঠিন। আপনি ভগবানের 'পরে সব ভার ফেলে দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে চান, আপনার চোখের সুমুখ হতে সাত পুরুষের জমিদারি এই রকম এক জুয়াচোর ম্যানেজারের হাতে পড়ে আপনার দায়ে শেষটায় নিলামে উঠল, আপনি তা দেখতে চান্, সহ্য করতে চান ?"

স্বপন বলিল "চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে, কারণ ভগবান মানুষকে চেষ্টা করার শক্তি সাহস দিয়েছেন। তারপরে চেষ্টায় যদি না ফল হয় তারপরে তো কথা বলা চলবে না সতীনাথ।"

সতীনাথ চুপ করিয়া রহিল ; একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

অনেক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল "আমি বলি কি দিদিমণি, আপনার সকালেই একবার ম্যানেজার বাবুর বাড়ী যাওয়া উচিত। ক্ষতিটা আপনারই, তিনি যদি না আসেন আপনারই যেতে হবে।"

স্বপন বলিল "সে আমিও ভেবেছি ভাই, কাল সকালেই আমি নিজে তাঁর বাড়ীতে একবার যাব, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করব, দেখি তিনি কি বলেন। যদি তিনি টাকা সংগ্রহের ভার নেন, ভালই, না হলে আমাকেই চেষ্টা করতে হবে।"

সতীনাথ চুপ করিয়া খানিক বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। স্বপন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে তাহার অভ্যাসানুযায়ী হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া গেল।

স্বপন দাসীকে ডাকিয়া আদেশ দিল, কেহ যেন তাহাকে এখন বিরক্ত না করে। তাহার শরীর বড় অসুস্থ, আজ সে আহারাদি কিছুই করিবে না, এখনই শুইয়া পড়িবে।

দরজাটা বন্ধ করিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

কত বছরের খাজনা, তাহা সে জানে না। সে বড় কম টাকা তো নয়, এত টাকা সে জোগাড় করিবে কেমন করিয়া? আজ দুই বৎসর পিতা মারা গিয়াছেন, এই দুই বৎসরে খাজনা সামান্যই আদায় হইয়াছে, অন্ততঃ সে তাহাই জানে। হরেনবাবু তাহাকে বুঝাইয়াছেন, প্রজারা নূতন জমিদারের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। মোকর্দ্দমা মামলায় জলের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে, সে সব হিসাবও তিনি দিয়াছেন। হরেনবাবু যে এমনভাবে তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন তাহা সে কখনই ভাবে নাই, তবে তিনি যে অল্পস্বল্প লইতেছেন ইহাই সে জানিত;—স্বপনের যথাসর্ব্বস্ব তিনি নিজের দিকে টানিতেছেন,

এই অল্পবয়স্কা বন্ধুহীনা যুবতীকে প্রবঞ্চনা করিতে তিনি পশ্চাৎপদ হইতেছেন না।

আজ আবার পিতার কথা নূতন করিয়াই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই। তিনি তাহাকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন নাই, ভাবেন নাই, সতর্ক হইলেও বা তাহার উপায় কি, বিশ্বাস না করারই বা পথ কই? সে স্বাধীনভাবে জমিদারী দেখিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও এত বড় প্রতারণা চলিয়া গেল, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতেই এই জুয়াচুরী চলিতেছে, তিনিও তো কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাঁহার চোখেও ত ইহারা ধূলা দিতে ছাড়ে নাই।

অসহ্য গরম, কক্ষমধ্যে একটুও বাতাস নাই; টানা পাখাটা অব্যবহার্য্য পড়িয়া আছে। আজ কয়দিন হইল যে ছেলেটী পাখা টানিত তাহার জ্বর হইয়াছে, হরেনবাবু আর একটী লোক আনিয়াছিলেন, পাখা টানার দরকার নাই বলিয়া স্বপন তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে।

স্বপন বিছানা ত্যাগ করিয়া মুক্ত জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে নিকষ কালো অন্ধকার—ঠিক তাহার অন্তরেরই প্রতিরূপ। নীচে শিউলি ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়াছিল, তাহার গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

এই কুসুমগন্ধপূর্ণ ঝরঝরে শীতল বাতাসের মুখে দাঁড়াইয়া তাহার দেহ প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল, সে রুদ্ধদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্য সহস্রগুণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সান্ধ্য তারাটী তখন

আস্তে আস্তে নামিয়া যাইতেছে, তাহার আলোকে সেখানকার আকাশটা একটু বেশী উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

কোথায় পিতা—কোন্‌খানে রহিয়াছ তুমি ? তুমি যে বলিয়াছিলে আমি সর্ব্বদা তোমায় দেখিব, আজ কি তাহাকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না ? তাহার এই দারুণ বিপদও কি আজ তোমার অজ্ঞাত ? দেব, আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর ওখান হইতে, তোমার আশীর্ব্বাদরূপ অক্ষয় বর্ম্মে ঠেকিয়া সকল বিপদ আপদ দূর হইয়া যাক্।

ধীরে ধীরে স্বপনের চোখ দুইটী সজল হইয়া উঠিল, ক্রমে বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পিতাকে ডাকিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের জমাট ব্যথা নিবেদন করিয়া দিয়া খানিকটা কাঁদিয়া সে যেন নিজেকে অনেকটা হালকা বিবেচনা করিল।

ফিরিয়া টেবিলের পার্শ্বে চেয়ারে বসিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা পত্র লিখিতে লাগিল। মনের আবেগে দ্রুত দীর্ঘপত্র লেখা শেষ হইয়া গেল, সেখানা তুলিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, দেড় বৎসর আগে ভবানীপ্রসাদ ইউরোপে চলিয়া গিয়াছেন, দুই একখানা পত্র তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে দিয়াছেন, কোনটাতেই তাঁহার স্থায়ী ঠিকানা দেন নাই। এখন তিনি কোথায় আছেন সে কথা সে জানে না, ডাক্তার গুপ্তকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিল, তিনিও জানেন না লিখিয়াছেন।

হায়রে, এ সময়টায় তিনিও নাই। যদি তিনি থাকিতেন, তাহা হইলে স্বপন একটুও ভাবিত কি ? তাঁহার একটী মুখের কথায় অসাধ্য সাধন হইতে পারিত, এ টাকা সব দেওয়া হইত, কিন্তু হায়! তাহার দুর্ভাগ্য হেতু তিনি আজ কোথায় ?

স্বপন পত্রখানা শতখণ্ডে বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া দিল, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুইহাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে নিবিড় চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

"ওমা স্বপন, দরজাটা খুলে দাও মা, কিছু খাও, রাত উপোসী থাকতে নেই যে মা।"

স্বপন চুপ করিয়া রহিল। স্বার্থপরা এই মাসীমাটিকে চিনিতেও তাহার বিলম্ব হয় নাই, ঘৃণায় সে কথার উত্তর দিল ন।

"মা স্বপন—"

দারুণ বিরক্তিভরে স্বপন উত্তর দিল, "কি বলছো মাসীমা?"

মাসীমা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "খাবার এনেছি মা।"

স্বপন বলিল, "আমি তো আগেই বলে দিয়েছি মাসীমা, আমি আজ কিছু খাব না।"

মাসীমা দারুণ বিস্ময়ে বলিলেন, "তাই কি হয় মা, রাত উপোসে হাতী পড়ে এ কথাই তো রয়েছে। ওঠ মা, দরজাটা খুলে দাও, যা পার চারটী খাও।"

স্বপন শ্রান্তভাবে বলিল, "না মাসীমা, আমার শরীর আজ ভারী খারাপ করেছে, কিছু খাব না।"

মাসীমার ব্যগ্রকণ্ঠ শুনা গেল—"শরীর খারাপ করেছে, দেখি মা, একবার দরজাটী খোল।"

"আজ আর দেখতে হবে না মাসীমা, কাল দেখো।"

মাসীমা বলিলেন, "আজ তবে রাধানাথকে বলে দেই কাল সকালেই সে ডাক্তারকে ডেকে আন্‌বে আর হরেন বাবুকে খবর দিয়ে আস্‌বে।"

অতিরিক্ত বিরক্ত হইয়া স্বপন বলিল, "না না, কাউকে খবর দিতে বা

ডাকতে হবে না। কাল সকালে শরীর বুঝে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি আর আমায় বকিয়ো না, আজকের মত রেহাই দাও।”

মাসীমা বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

স্বপনের সহিত অন্তঃপুরের সংস্রব মোটেই ছিল না, মাসীমা ইহাতে একপক্ষে খুসি হইলেও অন্যদিকে মোটেই সম্প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই অত্যন্ত বেহায়া হইয়া পড়ে, পুরুষকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, প্রথম হইতেই এ ধারণাটা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল, স্বপনকে দেখিয়া তাহাতে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাহা দূর হইয়া গিয়াছে।

স্বপন প্রথম দিনের পলকের দৃষ্টিপাতে এই মাসীমাটির অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। পাছে নিজের কোনও স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে তিনি প্রথমেই শঙ্কিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বপনও সেই জন্যই অন্তঃপুরের সংস্রবে যায় নাই, বাহিরের মানুষের মত বাহিরে বাহিরেই দিন কাটাইয়া দিত। মাসীমার স্বার্থপরতা দেখিয়া তাহার মুখে একটী বারের জন্য একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ে সে দিন দিন নূতন ব্যথা পাইতেছিল, এই সব ব্যথা জমাট বাঁধিয়া থাকিতেছিল ; শান্তি তাহার একতিল ছিল না। মানুষ যে কতদূর স্বার্থপর হইতে পারে এই দুই বৎসরে সে তাহা জানিয়াছিল, পিতা থাকিতে সংসারের কুটীলতা তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই।

১৩

সকাল বেলাই মাসীমা সকল কাজ ফেলিয়া আগে ছুটিয়া আসিলেন—"আহা, কাল মায়ের আমার অসুখ করেছিল, মুখখানা শুকিয়ে আমসী-পারা হয়ে গেছে ; দেখি মা গা তোমার।"

শুষ্ক হাসিয়া স্বপন বলিল, "কিছু হয়নি মাসীমা, জ্বরও নয়, সর্দ্দি মাথা ধরাও নয় ; কাল মোটে খিদে ছিল না বলে মিছে করে অসুখের ভান করেছিলুম নইলে তো তুমি খাওয়াতে ছাড়তে না। এই দেখ না বেশ ভাল আছি।"

মাসীমা তাহার ললাটে হাত দিয়া তাপ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অসুখ যদিও হয়ে থাকে এখন ছেড়ে গেছে। এ সব দেশের অসুখ ওই রকমই মা, ম্যালোয়ারী জ্বর—বিকেল হতে রাত পর্য্যন্ত আসে, একঘুম দিয়ে দেখ ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। তুমি বারণ করলেও মা আমি তো থাকতে পারিনে—কথাতেই বলে মা আর মাসী, পার্থক্য কতটুকু বল। আমি সকাল হতেই রাধানাথকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছি, ভোর না হতে সে চলে গেছে। আগে হরেনবাবুর কাছে যাবে বল্‌লে, তারপর ডাক্তারকে খবর দেবে। সে কি আমার তেমনি জামাই মা, মুখের কথাটী একবার খসালে হয়। তোমার হুকুমে সে শীতের রাতেও আট ক্রোশ পথ হাঁট্‌তে ভয় পায় না।"

তাঁহার জামাতা রাধানাথের গুণ স্বপনের অবিদিত ছিল না। অশিক্ষিত বর্ব্বর প্রকৃতির লোক ছিল সে, সভ্যতার ধার দিয়াও যায় নাই, কাহাকে কি বলিতে হয় তাহাও সে জানে না। দিনের মধ্যে

অধিকাংশ সময়ই সে গাঁজায় দম দিয়া থাকিত, খুব কম সময়ই তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাওয়া যাইত।' এই বর্ব্বর প্রকৃতির লোকটাকে স্বপন আদতেই পছন্দ করিত না। যদি সে দূরে দূরে থাকিত, তাহা হইলে এতটা ঘৃণা করিবার কোন কারণই থাকিত না, কিন্তু সে নাকি স্বপনের সঙ্গটাই খুব বেশীরকম পছন্দ করিত, অপরকে একটা আদেশ করিলে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৎপরতার সহিত সেই আদেশ পালন করিয়া দুই পাটী দাঁত বাহির করিয়া হাসিত।

চেহারাটাও ছিল তাহার তেমনি, অতিরিক্ত লম্বা, মাংস তাহার গায়ে আদতে ছিল না বলিলেই চলে। হাত দুখানা তাহার আজানুলম্বিত ; চোখ দুটি ছিল যেমন ক্ষুদ্র, নাসিকাটী ছিল তেমনই উন্নত। মাথার চুলগুলি তৈলসিক্ত চকচকে, তাহার উপর যথোপযুক্ত ঢেউ খেলানো। চুলকে এইরূপ ভাবে ঢেউ খেলাইয়া তোলা তাহার পক্ষে খুব গৌরবের কারণ ছিল ; সে মনে করিত এই ঢেউখেলানো চুলগুলার জন্য তাহাকে পরম সুন্দর দেখায়।

তাহার মত না লইয়াই রাধানাথকে হরেনবাবু ও ডাক্তারের কাছে পাঠানো হইয়াছে শুনিয়া স্বপনের মুখখানা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, সে একবার শুধু মাসীমার মুখের পানে তাকাইয়া চোখ ফিরাইয়া দাসীকে আদেশ করিল, "পাল্কী তৈরি করতে বল. আমি এখনি বার হব।"

উৎকণ্ঠিতভাবে শরৎকালী বলিলেন, "সে কি কথা মা, এই সকাল-বেলা—এখন কোথায় যাবে ?"

স্বপন বলিল, "দরকার আছে।"

মাসীমা বলিলেন, "কাল রাত্রে কিছু খাওনি মা, আজ আগে চা খাবার খেয়ে নাও। শরীর খারাপ, পূজো আজ থাক্।"

স্বপন বলিল, "তুমি ঝির হাতে দিয়ে চা খাবার পাঠিয়ে দাও গিয়ে মাসীমা, আমি এখনি আসছি।"

সে পূজার গৃহে চলিয়া গেল, অন্যদিনের মত আজ বিলম্ব করিল না; তাড়াতাড়ি পূজা সাঙ্গ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

মাসীমা নিজের হাতেই চা খাবার আনিয়া টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "তোমার এ পাড়াগাঁয়ের জল বাতাস মোটেই সহি হবে না মা, তাই বলছি—তোমার পাড়াগাঁ হতে চলে যাওয়াই ভাল।"

স্বপন চা পান করিতে করিতে একটু হাসিয়া বলিল, "দেখা যাক মাসীমা, ভবিষ্যতের মধ্যে যা লেখা আছে তা হবেই, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।"

এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত সে জুতা পায় দেয় নাই, পল্লীগ্রামের মেয়েদের মতই খুব সাদাসিদাভাবে চলিতেছিল। আজ সে জোর করিয়াই জুতা পায় দিল, উপযুক্ত বেশভূষা করিল; দাসীকে সঙ্গে লইয়া সে যখন নীচে নামিয়া গেল, তখন মাসীমা স্বগতই বলিতেছিলেন, "বাবা, বাবা, কি মেয়ে, অমনি জুতো পায় দেওয়া হল, কাপড়খানা পরার কায়দাই বা কি,—হাঁটছে যেন ঘোড়া ছুটেছে। ওই এক ইলেং কেলাসের জুতো বাবা, এতখানি উঁচু যেন ঘোড়ার ক্ষুর। জুতো পায় আবার মেয়ে মানুষে নাকি দেয়, সব খিষ্টেনি মত, ঢং করে আবার পূজো হয়। ঠাকুর ওর হাতের পূজো নেওয়ার জন্যে যেন এতখানি হাঁ করে বসে আছে; ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো।"

হরেনবাবুর বাড়ীর সম্মুখে লাল সুরকী ফেলা দুপাশে সবুজ ঘাসে মোড়া পথটার উপর প্রভাত পাদচারণা করিতেছিল। মনটা তাহার চিন্তাপূর্ণ। কাল সে দ্বিধায় পড়িয়া স্বপনের সহিত দেখা করিতে যায়

নাই, অতটা সাহসও তাহার হয় নাই। ভগিনীপতি, ভগিনী সকলেই স্বপনের উপর বিরূপ, তাহার মনে দারুণ ঘৃণা জন্মাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত, কিন্তু ঘৃণা দূরে থাক, প্রভাত ইহাতে আরও শ্রদ্ধার চোখে স্বপনকে দেখিতেছে। যথার্থ ন্যায়পরায়ণ ছিল সে, সে চায় না কেহ নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করে। যার যে ধর্ম্ম সে তাহা ধরিয়া থাক, সেই ধর্ম্মাশ্রিত সমাজের উন্নতি সাধন করুক, প্রভাতের ইহাই মত। এইজন্যই সে স্বপনকে ঘৃণা করিতে পারিতেছে না, ঘৃণার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

হরেনবাবুর ইচ্ছা ছিল না প্রভাত স্বপনের সঙ্গে দেখা করে; মাঝের দিন কয়টা কাটিয়া গেলে প্রভাতকে কর্ম্মস্থলে পাঠাইয়া দিয়া ভগিনীও নিশ্চিন্ত হন। প্রভাত ভাবিতেছিল, সে আজ বৈকালে যখন বেড়াইতে যাইবে তখন নিশ্চয়ই স্বপনের সঙ্গে দেখা করিবে। স্বপন তাহাকে বিবাহ না করুক তাহাতে তাহার ক্ষতি নাই। সে স্বপনকে ভালবাসিতে পারিয়াছে এই তাহার পক্ষে যথেষ্ট লাভ, স্বপন তাহাকে ভালবাসার চোখে নাই বা দেখিতে পারিল!

কিন্তু একথা ভাবিতেও যে বুকটা ফাটিয়া যায়, সে শুধু ভালবাসিয়াই যাইবে, প্রতিদানে এতটুকু কিছু পাইবে না যাহা তাহাকে ভবিষ্যতে সান্ত্বনা দিতে পারিবে? সে যাহাকে ভালবাসে, সে নিজের খেয়ালেই মত্ত থাকিবে, কেহ যে তাহাকে যথার্থ হৃদয় ঢালিয়া পূজা করে তাহা সে জানিবে না, এ যে বড় কষ্টকর কথা।

কিন্তু না, কি হইবে তাহাকে জানাইয়া? এই ব্যঙ্গকর পুতুলপূজার মধ্য দিয়া সে উন্নতির পথে উঠিতেছে, একদিন—এই পথে চলিতে চলিতে সে এমন এক স্থানে উপনীত হইবে, যেদিন পুতুল পুতুলই থাকিয়া যাইবে,

সত্যকে সে সেই উপরে পাইয়া নিজের জন্মের সার্থকতা অনুভব করিবে, সেদিন সে প্রকৃত জ্ঞানী হইবে।

একদিন হরেনবাবুর সঙ্গে এই কথাই তাহার হইয়াছিল। হরেনবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "স্বপন বলেছে এই পুতুল পূজোর মধ্যে দিয়েই সে ভগবানকে লাভ করবে, সেদিন মাটি মাটিই থাকবে সত্যি, কিন্তু এই মাটির মধ্যে প্রাণ কল্পনা করে সে যে ভগবানের সত্যসুন্দর রূপ ধারণা করতে পেরেছে সে কথা ভুলতে পারবে না, তাই মাটি চিরকালই তার কাছে উঁচু থাকবে, মাটিকে সে ঘৃণা করতে পারবে না। সে একেবারেই নিরাকার ধারণা করতে অক্ষম, তার গুরু বলেছে ধাপে ধাপে উঠ্‌তে হবে, তাই সে ধাপে ধাপে উঠ্‌ছে।"

তিনি ব্যঙ্গ করিয়াই কথাটা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভাত ইহার মধ্যে সত্য অনেকখানি পাইয়াছিল। সে কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণার চোখে দেখে নাই। ভগবানকে পাওয়ার পথ চারিদিকেই আছে। ব্রাহ্মও যেখানে পৌঁছিবে, মুসলমানও সেখানে পৌঁছিবে, হিন্দু খৃষ্টানও সেখানে পৌঁছিবে। উপাসনা-প্রণালী পৃথক হইলেও সত্য সেই একই, সেখানে সবই একাকার, সেখানে বিভিন্ন কিছুই নাই। পৌত্তলিক হিন্দু পুতুল পূজার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে চায়, লক্ষ্যও তাহার সেই একই স্থানে। প্রভাত জানে, প্রাণের কামনা মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে তখনই যখন ডাকটা আন্তরিক হয়, তবে হিন্দুর প্রাণের কামনাও কেনো মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে না?

প্রভাত জানিত, স্বপনের এই গোঁড়ামিতে হরেন্দ্রনাথের কিছুই আসিত যাইত না, যদি তাঁহার বিশেষ স্বার্থ ইহাতে জড়িত না থাকিত। অনেক হিন্দু আছে, খৃষ্টান বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর চেয়ে হিন্দুর দেশে

হিন্দুর সংখ্যাই বেশী ; অনেক হিন্দুর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্বও রহিয়াছে, কখনও কাহাকেও হিন্দুয়ানীর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার পরদুঃখকাতর প্রাণে এরূপ গভীর বেদনা তো বাজিয়া উঠে নাই, কাহাকেও সেই অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্যও তো তিনি এরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই।

এই কথাগুলিই সে ভাবিতেছিল, সেই সময় পাল্কীখানা গেটের কাছে আসিয়া থামিল, স্বপন নামিয়া পড়িল।

প্রভাত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কেন না স্বপনের হঠাৎ এ রকমভাবে আসা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে আসিয়া পর্য্যন্ত স্বপনকে দেখিতে পায় নাই, তাহার কথা দূর হইতে শুনিয়াই আসিতেছে মাত্র। কল্যাণী তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন প্রভাতের মনে তাহাই আঁকিয়া গিয়াছিল, সে তাই বিস্ময়-ভরা চোখ দুটী তুলিয়া তাহার উপর রাখিল। না, স্বপনের সে বেশ তো নয়, যেমন ভাবে সজ্জিতা হইতে ছয় বৎসর আগে প্রভাত তাহাকে দেখিয়া গিয়াছে, ঠিক তেমনই বেশে সাজিয়া সে আজ আসিয়াছে।

বেশের পরিবর্ত্তন না হইলেও মানুষটীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। যে মুখে ছিল শুধু তরল হাসি, সে মুখের উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে গাম্ভীর্য্য। সে চোখের দৃষ্টি অর্থহীন চঞ্চল নয়, এখন প্রতি পলকে এ যেন মর্ম্মস্পর্শ করিতে চায়।

স্বপন সম্মুখে তাহাকে দেখিয়াই দুটি হাত কপালে ঠেকাইল, একটু হাসির রেখা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, "ভাল আছ তুমি ? কবে এসেছ এখানে ?"

প্রভাত মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল, শুধু মাথাটা কাত

করিয়া তাহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারিল না।

স্বপন পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর দেখা পাইয়া সহজভাবেই কথা বলিয়া গেল, প্রভাত কিছুতেই তেমন সহজভাবে কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ যেন কে চাপিয়া ধরিতেছিল।

স্বপন আবার বলিল, "আমি ভেবেছিলুম তুমি সেই ছোটবেলার বন্ধুত্ব মনে করে অবশ্যই আমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাবে, কিন্তু সেটা আমার মনে করাই সার হয়েছে মাত্র। বিলেতে গেলে আমাদের দেশের লোক মনে করে তারা একটা কিছু হয়েছে, পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাক, দেখে মোটে চিনতেই পারে না।"

প্রভাত হাসিল, হৃদয়ের ব্যথাটাই সে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল মাত্র, তাহাকে হাসি বলে না। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তাই মনে করছ স্বপন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। যদি একটুও বুঝতে পারতে—"

"বেশ বুঝেছি ; আমার 'পরে তোমরা অনেকটা আশা করেছিলে, সে আশায় এখন নিরাশ হ'য়ে—না, থাক্ সে কথা, আমায় তোমরা ঘৃণা করতে পার তাই করে যেয়ো। কাকা বাড়ী আছেন কি, তাঁর কাছেই আমার দরকার।"

প্রভাত নীরবে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "আছেন।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর অসুখ করেছে ?"

বিস্মিতভাবে প্রভাত বলিল, "কই, না।"

"হুঁ" বলিয়া স্বপন নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কালবৈশাখীর কালো মেঘ তাহার মুখের উপর ঘনাইয়া আসিল। প্রভাত তাহার মুখের পানে

চাহিয়া আর একটীও কথা বলিতে পারিল না; অনেকগুলো কথা তাহার মুখে আসিয়াছিল, সে তাহা চাপিয়া গেল।

বৈঠকখানায় হরেনবাবু একাই বসিয়া নিবিষ্টমনে কি সব কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন।

স্বপন দরজার পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, "কাকা—"

হঠাৎ স্বপনের চিরমধুর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র হরেনবাবু অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখখানা পাংশু হইয়া গেল; তখনই সে ভাব সামলাইয়া লইয়া হাতের কাগজপত্রগুলা একখানা মোটা খাতার তলে চাপা দিয়া ফেলিলেন, স্বপনের সতর্ক দৃষ্টিতে তাহা গোপন রহিল না।

ব্যস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে তিনি বলিলেন, "একি মা, তুমি নিজেই এসেছ এই অসুস্থ শরীর নিয়ে? এই খানিক আগে রাধানাথ এসে খবর দিয়ে গেল কাল রাত্রে তোমার অসুখ করেছে, কোন্ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যাবে তাই জানতে এসেছিল। আমি আবার রমেন ডাক্তারকে একখানা পত্র লিখে দিলুম, সকল কাজ ফেলে অবিলম্বে যেন সে জমিদার বাড়ী যায়। এই অসুস্থ দেহ—বসো মা, চেয়ারখানায় বসো।"

তিনি নিজেই চেয়ারখানা তাড়াতাড়ি তাহার দিকে সরাইয়া দিলেন। স্বপন চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আপনি বসুন, আমি বসছি।"

মিষ্টভাষী হরেনবাবু বলিলেন, "তাও কি হয় মা? তুমি এসেছ আমার বাড়ীতে, তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি বসব, একি কথা হতে পারে?"

প্রভাতের পানে চাহিয়া স্বপন বলিল, "তুমিও দাঁড়িয়ে রইলে যে প্রভাত-দা, বসো, আমি বসছি।"

নির্ব্বাক প্রভাত সকলের আগেই বসিয়া পড়িল, স্বপন বসিল, সঙ্গে সঙ্গে হরেনবাবুও বসিলেন।

"আমার অসুখের জন্যে আপনাকে একটুও ভাবতে হবে না কাকা, সামান্য একটু অসুখে ডাক্তার ডাকার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। যদি দরকারই বুঝতুম তা হ'লে আপনার কাছে লোক না পাঠিয়ে রমেন বাবুর কাছে আমিই কাউকে পাঠাতে পারতুম। আমার অসুস্থতার জন্যে কাউকেই আমি ভাবতে দিতে চাইনে।"

হরেনবাবু একটু যেন দমিয়া গেলেন, বলিলেন "তা বল্‌লে কি চলে মা? তোমার বাপ মারা গেছেন, আমার হাতে তোমার ভার দিয়ে গেছেন, এখন আমিই এখানে তোমার অভিভাবক। যদিও আমি তোমার বেতনভোগী ম্যানেজার, সে কথা তুমিও মনে কর না, আমিও করিনে, কেন না আমি তোমায় ছোটবেলা হতে মানুষ করেছি। ডাক্তার গুপ্ত আমার হাতে তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন, সেদিনও সে কথা আমায় বল্‌লেন। তুমি এখন অন্য লোকের কথা কানে নিয়ে আমায় অন্যভাবে ধারণা করলেও করতে পার, কিন্তু আমি তা কোন দিনই করব না, আমার নিজের একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে তো।"

স্বপনের মুখে চকিতের মত একটু হাসি ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। সে বলিল, "আমিও কারও কথা কানে নেইনে কাকা, যদি সেটা বুঝে থাকেন তবে ভুল বুঝেছেন জানবেন। বেশ, আপনার কর্ত্তব্য আপনি পালন করে যান, ওতে আমার কথা বলবার কোন দরকার দেখছি নে। আপনাকে কাল সতীনাথ ডাকতে এসেছিল না?"

হরেনবাবু মাথা কাত করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ছোকরা এসেছিল বটে, কিন্তু আজ কয়দিন জ্বরের জন্যই তো কাছারীতে যেতে পারিনি মা, তোমার সঙ্গে দেখাও করতে পারিনি। কাল রাত্রে মাত্র জ্বরটা ছেড়েছে, আজ এখনও শরীরটা এত দুর্ব্বল যে উঠতে পারা যাচ্ছে না। লেখাপড়ার কাজটা না করলে নয় তাই কোনও রকমে বসে বসে করতে হচ্ছে, নইলে—জানোই তো মা—যে বিশৃঙ্খলা চারিদিকে—উঃ—"

তিনি হাত দুখানা বার কত শূন্যে আন্দোলন করিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বৃথা অনেক চেষ্টা করিয়া হাই তুলিলেন।

স্বপন একবার প্রভাতের পানে চাহিল, প্রভাত বিকৃত হাসিয়া মুখখানা ফিরাইয়া লইল। এই অকপট মিথ্যাটা স্বপন জানিতেছে, তথাপি হরেনবাবু এমনভাবে বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন ইহাতে তাহারই লজ্জা করিতেছিল।

স্বপন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনি এদিকে অসুখে পড়ে রইলেন কাকা, ওদিকে আমার সবই যে যায়। আমার জমিদারি নিলামে উঠেছে এ কথা আমার অনেক আগে আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন। বড় দুঃখের কথা, এই সাংঘাতিক খবর পেয়েও আপনি এখনও চুপ করে রয়েছেন, আমাকে পর্য্যন্ত খবরটা দেন নি। আপনি সব জেনে শুনেও—"

প্রভাত চমকাইয়া উঠিল, বিবর্ণমুখে বলিল, "নিলামে উঠেছে কি রকম?"

হরেনবাবু একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি জানি এ যথার্থ কথা। তোমায় এ খবর জানাইনি তার কারণও আছে। তুমি

মনে ভেব না মা, এ খবর পেয়ে আমি চুপ করে আছি; যাতে টাকার যোগাড় হয় তার জন্যে আমি মোটেই চেষ্টা করছি নে। প্রজাদের সব জানিয়েছি, শীঘ্রই এ টাকাটা আদায় হয়ে যাবে এর জন্যে তোমায় এতটুকু ভাবতে হবে না। তুমি অতিরিক্ত ভাববে বলেই আমি এ খবর পেয়েও তোমায় দেই নি, দেখছি—এর মধ্যে কে তোমায় খবর দিয়েছে। যেই দিক্—সে শুধু তোমায় কষ্টই দেবে, কেন না প্রতিবিধানের ক্ষমতা আমার ছাড়া আর কারও নেই। বুঝেছি—কাল এই জন্যই তুমি কিছু খাওনি, অসুখ হয়েছে বলে শুয়ে পড়েছিলে না মা?"

স্বপন শুষ্কমুখে বলিল, "এটা আপনারই বুঝবার ভুল হয়েছে কাকা। যার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে তাকে আগেই তা জানিয়ে দেওয়া দরকার, কেন না যদিই সব যায়, হঠাৎ সেই প্রবল ধাক্কাটা লাগলে তার ফল খারাপই হয়ে থাকে। আমি জানতে পেরেছি, কয়েক বছরের খাজনা বাকি পড়েছে, এত বাকি পড়ল কেন, বাবা কি দেন নি?"

হরেনবাবু মুখখানা অত্যন্ত বিমর্ষ করিয়া তুলিয়া বলিলেন, "তাঁর জীবনে সেইটেই মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে মা, এখন তাঁর সেই ভুলের শাস্তি তোমাকেই পেতে হচ্ছে। তিনি তিন বছরের মধ্যে সব মিটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন, এই তিন বছরের এগ্রিমেণ্ট নিতে তাঁর অনেক টাকা খরচও হয়ে গেছে। তিন বছর যেতে না যেতে তিনি মারা যান, টাকা জমিয়েছিলেন কিনা তা বলতে পারিনে। আমি অ্যাটর্ণি রজনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সব অস্বীকার করেন। কতক টাকার কথা আমি জানি, তিনি যে কি করেছিলেন তা আমার চেয়ে তুমি জানো না। আমায় তিনি এমন অনেক গোপন কথা বিশ্বাস করে বলতেন, সে সব কথা তোমাদের গুরুদেবও জানেন না। তিনি আমায়

মরণের আগে বলে গেছেন, আমার সব দেনা রয়ে গেল, তুমি যেমন করে পার শোধ দিয়ো, আমায় যেন ঋণী হয়ে না থাকতে হয়।”

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিসের দেনা ?”

হরেনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “সে অনেক কথা মা, এই কাগজখানা পড়ে দেখ আগে।”

ড্রয়ার খুলিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া তিনি স্বপনের হাতে দিলেন।

স্বপন একবার কাগজখানির উপর চোখ বুলাইয়া সেখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, “এ আর দেখে কি করব কাকা ? বুঝছি এই খাজনা আর দেনার দায়ে আমার সব জমিদারীই বিকিয়ে যাবে, আমায় জমিদার বলে কেউ চিনবে না, আমি সামান্য একটী নারী হয়েই থাকব। আপনার দান অবশ্য মাথা পেতে নিতেই হবে, নেব না বলা যাবে না, ফেলবার যো কিছুতেই নেই। এতে আমার দুঃখ হচ্ছে না কাকা, কেন না মানুষ যে—সেই যখন চিরস্থায়ী নয়, ধন সম্পত্তি কেমন করে চিরস্থায়ী হবে ? যাক —কিন্তু অন্ধের মত যেতে দেব না, কেন গেল, বাবা কেন এত দেনা করেছিলেন, কেন এই কয় সনের খাজনা দেওয়া হয় নি সব কথা জানতে চাই। বাবা কেন দেনা করলেন, কেন আমায় সে কথা গোপন করে গেলেন ?”

হরেনবাবু গম্ভীরভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “বলছি তো ওই ভুলটীর জন্যেই আজ তোমায় আকস্মিক আঘাত পেতে হল। আমাকেও আগে দেনা করার সময় কিছু জানান নি ; তখন আমি তাঁর বন্ধুই ছিলুম, ম্যানেজার ছিলুম না। কাজ নেওয়ার পরে একদিন কথায় কথায় এই দেনার কথাটা বল্‌লেন, দেনা অনেককাল আগেকার—তাঁর

যৌবন সময়ের। অবশ্য সেদিনকার ঘৃণাকর কথা আমি তোমার কাছে বিশদভাবে বল্‌ব না, তবে এইটুকু বলছি তোমার বাপের সাধুত্বের আড়ালে অনেকখানি কলঙ্কগ্লানি ছিল, আগুনে পুড়ে তিনি ইদানীং নূতন জীবন পেলেও পেছনের পানে তাকিয়ে স্থির হতে পারতেন না। কলকাতায় অনেক কাজ করে তিনি যখন পশ্চিমে যান, তখন একটী মেয়ে তাঁর সঙ্গে ছিল, সেই মেয়েটীর ও নিজের বিলাস-তৃপ্তির জন্যেই তিনি দেনার পর—"

"থাক্ থাক্ কাকা, ওসব কথা তুলবার আবশ্যকতা নেই। আমি ও কথা শুনতে চাই নে, আশা করছি আপনিও আমার পূজনীয় স্বর্গগত পিতৃদেবের চরিত্র সম্বন্ধে আমায় কোন কথা বলবেন না। আমি যা জানিনে, তা জানতে চাইনে। আমার বাবাকে আমি দেবতার চেয়েও উচ্চে আসন দিয়েছি, আমার বাবাকে আমি আজও পূজো করেছি, আমার সেই বাবাকে আপনি কলঙ্কিত করে তুলবেন না।"

হরেনবাবু বলিলেন, "থাক্ মা, আমি বল্‌ব না। তুমি জানতে চাচ্ছিলে কেন এত দেনা হলো, তাই আমি তোমায় জানিয়ে দিতে চাচ্ছিলুম। আমিও জানতুম না, তিনি এত দেনা করে গেছেন, আজ দশ বার দিন এই কথা মাত্র জানতে পেরেছি। দেনা যত করেছেন, সুদ প্রায় ততই দাঁড়িয়ে গেছে। অনন্ত বোস এখন টাকার জন্যে বড় তাগাদা করছেন। মাঝে তোমার বাবা একবার হাণ্ডনোট বদলে দিয়ে বার বছর সময় নিয়েছিলেন, সে বার বছর পূর্ণ হতে আর ছয় মাস দেরী আছে, সেই কথাটা তিনি আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছেন আর তোমায় জানাতে বলেছেন। তোমার যদি না বিশ্বাস হয়, তিনি তাহ'লে রজনী-

বাবুকে নিয়ে একদিন তোমার কাছে আসবেন। রজনীবাবু, ডাক্তার গুপ্ত সবাই এতে সাক্ষী আছেন।"

স্বপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তাঁর কথায় আমি অবিশ্বাস করছিনে, আমি জেনেছি অনন্ত বোস আমাদের কাছে টাকা পাবেন। তাঁকে আসতে হবে না, আমি বাবার দেনা স্বীকার করছি।"

সে খানিক চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর হাসিল। এই ভয়ানক বিপদের মধ্যে তাহার এই প্রশান্ত হাসি দেখিয়া প্রভাত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

হরেনবাবু বলিলেন, "এ সময়েও তোমার হাসি আসছে মা?"

স্বপন বলিল, "হাসছি বড় দুঃখে কাকা, হাসছি মানুষের স্বভাবানুযায়ী ধর্ম্ম দেখে। এ জগতে কেউই চায় না কেউ সুখে থাকে, কেউ ভাল থাকে, পরস্পর পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করবেই এই হচ্ছে এই জগতের অধিবাসীর চিরন্তন নিয়ম। যাক্ সে কথা কাকা; এই যে দুটি বছর আমি জমিদারির মালিক হয়েছি, খাজনা আদায় হয় শুনেছি, হিসাব পত্র আপনিই করেন, আমায় একবার দেখাতে নিয়ে যান এই মাত্র; আমি কিন্তু এক পাইও এ পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। এ সব ব্যাপারের—"

হরেনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি করব মা, প্রথমটায় যে বিশৃঙ্খলা ঘটেছে তা সামলানোই দায় হয়ে পড়েছে। দেখতেই পাচ্ছো, এই দুটি বছর কেবল মহালে মহালে ঘুরে বেড়াচ্ছি তবু যদি রীতিমত খাজনা আদায় করতে পারছি। এই বদমায়েস লোকগুলো ভেবেছে তুমি স্ত্রীলোক, নিজে কিছু দেখাশুনা করতে পারবে না, সেই জন্যেই তারা গোল বাধিয়ে তুলেছে, মোকর্দ্দমা মামলায় তহবিলে যা কিছু ছিল সব ব্যয় হয়ে গেল। আমার ত্রুটী কোনদিন কি দেখতে

পেয়েছ মা? আমি শুধু মাইনের চাকর নই, তোমার বাপের পরম বন্ধু ছিলুম, তোমাকে এতটুকু বেলা হতে মেয়ের মত কোলে পিঠে করেছি, মিনুর চেয়ে তোমায় কম ভালবাসি নে, তেমনি নিঃস্বার্থভাবেই তোমার কাজও করে যাচ্ছি। এখনও কি চেষ্টার ত্রুটি করছি মা? প্রজাদের জানিয়েছি সাতদিনের মধ্যে খাজনা দিতেই হবে, যদি সাতদিনের মধ্যে খাজনা না পাওয়া যায়, একটাকা করে ফাইন দিতে হবে, যদি না দেয় লাঠিয়াল পাঠিয়ে ছাগল গরু লাঙ্গল সব নিয়ে আসব। সাতদিনের মধ্যে চারদিন গেছে আর তিনটে দিন মাত্র বাকি আছে, দেখা যাক কি হয়।"

স্বপন বড় বড় তুইটী চোখের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "সাতদিনের মধ্যে খাজনা দিতে পারবে এমন অবস্থা হয় তো প্রজাদের মধ্যে অনেকেরই নেই, এর পরে আবার একটাকা করে ফাইন ধরেছেন, ওরা কি দিতে পারবে? কেউ বা একেবারে দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়, এরা কোনক্রমে খাজনাটা যোগাড় করে দেবে কি করে সেই ভাবনাতেই পাগল হয়ে যাচ্ছে। খাজনা দিতে একটা দিন কোন ক্রমে পেছিয়ে পড়ে, ফাইনের একটাকা বেশী আর কি দিতে পারবে? তার পর শুনেছি এ বছর ফসল তেমন হয়নি, কেউ কেউ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—"

বাধা দিয়া হরেনবাবু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "ও সব জুয়াচুরি মা, ওদের কথা তুমি শোন কেন? ঘরে হাঁড়ি ভরে টাকা মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে বেটারা লোকের সামনে উপোস করে মরে, যাতে তাতে জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার চেষ্টা করা, পাওনদারকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা। যখন দেখবে অত্যাচার সুরু হয়েছে, শুধু চোখরাঙানিই নয়—

দেখবে তখন টাকা নিয়ে নিজেরাই ছুটে আসতে পথ পাবে না। এ সব হচ্ছে জমিদারী চাল, তুমি কি এসব জানো মা? এ রকম না করলে বদমায়েস প্রজাগুলো জব্দ হয় না। তোমার বাবা থাকতে এ রকম ঢের বার হয়েছে, জমিদারের এ নূতন কাজ নয়, যদিও তোমার কাছে আজ এ কথাটা একেবারেই নূতন ঠেকছে। এদিককার খাজনাগুলো আদায় হলে সেই টাকা—আর যদিই কিছু কম পড়ে ঠাকুরবাড়ীটা তো কিছুই কাজে লাগে না, সেটা বিক্রি করে ফেলে টাকা নিয়ে—"

স্বপন ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, ঠাকুরবাড়ী আমি বিক্রি করতে পারব না।"

হরেনবাবু অসহায়ভাবে বলিলেন, "তবেই মা, টাকার যে বড় অনাটন।"

স্বপন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কিছু অনাটন হবে না। বাবা আমায় দামী যে গহনা কখানা দিয়েছেন, সে গুলো বিক্রি করলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে কাকা।"

প্রভাতের কণ্ঠ চিরিয়া একটা আর্ত্তস্বর বাহির হইয়া গেল! স্বপন তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তাতে কি? গহনার বোঝা বইতে পারিনে বলে সেগুলো বরাবরই বাক্সে পড়ে আছে। আজ দু' বছর আমি সেগুলোকে নাড়িনি, বাবা যেমন তুলে রেখেছিলেন ঠিক তেমনিটীই আছে। কি হবে ও গুলো অনর্থক পড়ে থেকে, বিক্রি করলে কুড়ি বাইশ হাজার টাকা দর উঠতে পারে, না কাকা?"

হরেনবাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, "অত যদি নাও হয় তা হ'লেও পনের যোল হাজার টাকার কমতো কিছুতেই নয়। তবে তাই হোক মা, রংপুরের মহালটা কোন ক্রমে আগে বাঁচানো যাক, তারপর

অনন্ত বোসের পঞ্চাশহাজার টাকা শোধ করতে দেরী হবে না। তুমি তিন বছরের সময় নিয়ো, এর মধ্যে যেমন করেই হোক শোধ দেওয়া যাবে।”

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন, “আজ এখানে থেকে যাও না মা। জমিদার হিসেবে তোমায় সাদরে নিমন্ত্রণ করছিনে, মেয়ের মত জেনে জোর করছি।”

স্বপন বলিল, “আজ না কাকা, আর একদিন এসে থেকে যাব। আজ বাড়ীতে আমার বিশেষ দরকার আছে, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।”

সে উঠিয়া পড়িল।

ব্যস্তভাবে হরেনবাবু বলিলেন, “মিন্নুকে খবর দেই মা! তার সঙ্গে অনেককাল তোমার দেখা হয়নি, দেখা করে যাও।”

“আজ না কাকা, আর একদিন আসব, আজকে আমি এসেছিলুম এ কথা তাকে কিম্বা কাকীমাকে জানিয়ে কোন দরকার নেই। আবার হয়তো কালই আমাকে আপনার কাছে আসতে হবে, আজ এবিপদে আশ্রয় দিতে আপনি বই আর তো কেউ নেই কাকা।”

তাহার কণ্ঠস্বরটা ভিজিয়া উঠিল।

“তা বই কি, এ ঠিক কথাই বটে, তবে আজ থাক।” বলিতে বলিতে হরেনবাবুও তাহার সহিত অগ্রসর হইলেন।

স্বপন বলিল, “আপনাকে আর আমার সঙ্গে যেতে হবে না কাকা, আমার সঙ্গে ঝি আছে।”

সে যখন পাল্কীতে উঠিতেছিল, তখন প্রভাত নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। স্বপন তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া গেল, “তুমি এখান হতে

চলে যাওয়ার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো প্রভাত-দা, ভুলো না যেন।

প্রভাত একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভুলব না স্বপন, আমারও কয়টা কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

স্বপনের পাল্কী উঠিল।

১৪

হরেনবাবুর চতুরতাপূর্ণ কথা শুনিয়া স্বপন বিশ্বাস হারাইয়াও আবার জড়াইয়া পড়িয়াছিল, বুঝিয়াও সে বুঝে নাই প্রভাত তাহা ঠিকই ধারণা করিয়াছিল। হরেনবাবুকে চিনিতে প্রভাতের বাকি ছিল না, মনে মনে সে হরেনবাবুকে একটু ঘৃণা করিত, আজ সেই ঘৃণা তাহার বাড়িয়াই গেল।

স্বপনকে তুলিয়া দিয়া সে গৃহমধ্যে ফিরিয়া দেখিল, হরেনবাবুর মুখখানা আনন্দদীপ্ত, যেন কথাটা এমন সহজ সরলভাবে প্রকাশিত হইয়া মীমাংসা হইয়া যাওয়াতে তিনি পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন। যতদিন হইতে তিনি এই ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতেছেন, ততদিন তাঁহার মুখে এমন প্রফুল্লতা কখনও দেখা যায় নাই, এমন হাসি অনেককাল তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠে নাই। স্বপন শিক্ষিতা হইলেও তাহার চোখে ধুলা দেওয়া যায় খুব সহজেই, তিনি তাহাই ভাবিতেছিলেন। কল্পনা-চক্ষে তিনি দেখিতেছিলেন, দেশের জমিদার এখন তিনিই, স্বপনের নাম দেশ হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আজ স্বপনকে দেখিয়া প্রভাত নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল,

তাহার চোখেমুখে যে দীপ্তি সে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল তাহাতে তাহার হৃদয় নত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বপনের সহিত হরেনবাবুর যে কথাবার্ত্তা হইল তাহা শুনিয়া যথার্থই সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল। আইন বাঁচাইয়া রাখিয়া হরেনবাবুর মত অনেক পিশাচ-প্রকৃতির লোকে এমনভাবে কাজ করিয়া যায়, যাহা জানিতে পারিলেও প্রতিবিধান করা যায় না।

কল্যাণী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, "শুনছিস্ প্রভাত, স্বপনের জমিদারি যে যায়, নিলামে উঠেছে।"

প্রভাত উত্তর দিল, "এ রকম জায়গায় গিয়েই থাকে দিদি। সব একটানা লোকসানই পড়ে থাকে, লাভের দিক দেখতে গেলে কেবল শূন্যই দেখতে পাওয়া যায়। শুধু স্বপন কেন দিদি, অনেক বুদ্ধিমান পুরুষও এ রকম জায়গায় কিছু বুঝতে পারে না।"

কল্যাণী বলিলেন, "পুরুষ হলে এ রকম গোলমাল কখনই বাধ্‌ত না। স্বপন শিক্ষিতা হলেও সে মেয়ে, পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করবার যোগ্যতা তার নেই জেনেই প্রজারা এই রকম কাণ্ড করেছে, খাজনা দেবার সামর্থ্য থাকলেও খাজনা দেয়নি, যদি একটা দশ বার বছরের ছেলেও হতো—"

বাধা দিয়া প্রভাত বলিল, "তা হ'লে তো আরও ভাল হতো দিদি, নির্ব্বিবাদে ঘরের জিনিসগুলোও সরে যেতে পারত। অতটা হতে পারেনি, কেন না স্বপন সাবালিকা অবস্থায় জমিদারি পেয়েছে। তবুও সে রাখতে পারলে না, সব গেল, এটা শুধু তার একাজ চালাবার অনভিজ্ঞতার ফল, পরের উপরে নির্ভর করার ফল। যদি সে নামে মাত্র জমিদার না থেকে নিজের হাতে সব নিত, মহালে নিজে দু' একবার যাওয়া আসা

করত, তা হ'লে আজ হয় তো অন্য রকম দেখতে পেতুম। এতটা নির্ভর জেনে শুনে সে কেন করলে আমি কেবল তাই ভাবছি।"

তাহার কণ্ঠস্বর বড় রুক্ষ হইয়াই উঠিয়াছিল, কল্যাণী বিস্মিত হইয়া খানিক তাহার মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন, বলিলেন, "তুই বলছিস্ কি প্রভাত ?"

প্রভাত নিজের কণ্ঠস্বরের উগ্রতা বুঝিয়া মুহূর্ত্তে তাহা কোমল করিয়া ফেলিয়া নরমভাবে বলিল, "বলছি ভাল কথাই দিদি। তুমিও শিক্ষিতা, ভালমন্দ জ্ঞান তোমারও আছে, বল দেখি কার'পরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ভাল, না নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ভাল ? কেউ কি সাধ করে লাঠির সাহায্য নিয়ে হাঁটতে চায় ? স্বপনের দুই পা সবল থাক্তেও কেন সে লাঠির 'পরে ভর দিতে গেছে, সে যখন ভাল রকমই জানে লাঠিটা ঠিক সরল ভাবে না থাকলে তাকে পড়ে গিয়ে আঘাতজনিত দারুণ বেদনাও লাভ করতে হবে ?"

খানিক তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কল্যাণী আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন।

তাহার দিদিও এই ব্যাপারে কতটা সংস্থষ্ট তাহা ভাবিয়া প্রভাতের হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সংসারানভিজ্ঞা একটী সরলা যুবতীকে প্রবঞ্চনা করিবার কি বিশাল আয়োজন ইহাদের, কি ভাবেই না ইহারা জাল ফেলিয়াছে। স্বপন ইহাদের বিশ্বাস করিয়াছিল, ইহাদের 'পরে সব ভার নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ কথাটা কোনও লোকের কাছে শুনিতে পাইয়া পরামর্শ লইবার জন্যই সে হরেনবাবুর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, হরেনবাবু যে পরামর্শ দিলেন তাহা অত্যুত্তম।

হীন প্রবঞ্চনাকারী—

প্রভাতের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আপনা আপনি গর্জ্জিতে লাগিল এ রকমভাবে প্রতারণা করা কি মানুষের উচিত? মানুষকে অপদার্থ করিয়া তুলে মানুষেই নিজেদের হীন ব্যবহার দ্বারা। মানুষকে অবিশ্বাসযুক্ত মন দেয় মানুষেই,—নিজেরা অবিশ্বাসীর কাজ করিয়া। সব সময়ে তাহারা মুখোস পরিয়া গোপনে নিজেদের রাখিতে গেলেও তাহাদের হীন স্বার্থ কোন এক সময়ে তাহাদের প্রকাশ করিয়া দেয়।

সে এক সময় কল্যাণীকে ডাকিয়া বলিল "দিদি", আমি আজ রাত্রের মেলে কলকাতায় যাব, ওখান হতে একেবারে পশ্চিমে চলে যাব আর এখানে আসব না। মিনুকে বলে দিও আমার নিজিষ পত্র কয়টা দেখে শুনে যেন চাকরটার কাছে দেয়।"

কল্যাণী বলিতে গেলেন "আজই যাবি, কাল গেলেও—"

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে প্রভাত বলিল "না না, কাল আর নয়, আজই যেতে হবে। পরশু আমায় কাজে জয়েন করতে হবে, কলকাতায় কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে, কালই রওনা হতে হবে। আর দেরী করলে মুস্কিলে পড়তে হবে তখন।"

বৈকালের দিকে সে নিত্যকার মত বেড়াইতে বাহির হইল।

এদিক ওদিক খানিক বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময়টা সে স্বপনের বাড়ী গিয়া পৌছাইল। পল্লীর গৃহে গৃহে পল্লীবধূ তখন সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিতেছে, প্রতি গৃহ হইতে সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি উৰ্দ্ধে উঠিতেছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পল্লীর গাছের পাতার মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতেছে।

স্বপন তাহার প্রতীক্ষাতেই ছিল। প্রভাত আসিয়াছে সংবাদ

পাইবামাত্র তাহাকে বরাবর উপরে নিজের কক্ষে লইয়া আসিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিল।

ভৃত্য প্রভাতকে স্বপনের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। প্রভাতের জুতার শব্দ পাইয়া স্বপন অগ্রসর হইয়া বলিল "ঘরে এসো প্রভাত-দা।"

প্রভাত পর্দ্দা সরাইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অনেক কাল আগে সে একবার এই কক্ষে আসিয়াছিল তখন এ কক্ষ আর এক বেশে সজ্জিত ছিল। মেঝে কার্পেটে মোড়া ছিল, দেয়ালে শ্লীল অশ্লীল নানা প্রকারের ছবি ছিল। স্বপন সে সব নামাইয়া ফেলিয়া কোথায় নির্ব্বাসিত করিয়াছে। দেয়ালে শুধু তাহার পিতা ও মাতার বড় দুখানি ফটো রহিয়াছে, গৃহের মেঝের কার্পেট তুলিয়া ফেলিয়াছে, গৃহতল অনাবৃত। মাঝখানে গোল টেবিল ও চেয়ার কয়খানি থাকিয়া গিয়াছে, কি ভাবিয়া সে এগুলিকে নির্ব্বাসিত করে নাই।

জুতা পায় এই পবিত্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে প্রভাত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; তাহার মনে হইল এ কক্ষে স্বপনের ঠাকুর আছে, সে জুতা পায় প্রবেশ করিলে হয় তো স্বপনের পবিত্রতায় আঘাত করা হইবে, সে তাই আর অগ্রসর হইল না, সঙ্কুচিতভাবে স্বপনের পানে চাহিয়া রহিল।

স্বপন তাহার মনের ভাব বুঝিল, একটু হাসি তাহার গম্ভীর মুখখানার 'পরে ভাসিয়া উঠিল, সে বলিল "এ ঘরে কিছু নেই, তুমি সোজা চলে এসো।"

প্রভাত একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। স্বপনের বেশ এখন স্বাভাবিক, সকাল বেলাকার সে বেশ ভূষা এখন ছিল না। মোটা একখানি শাড়ী—তেমনিই মোটা একটা সেমিজ তাহার গায়ে;

মাথার চুলগুলা অসংযত হাতে একরকম করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে, দুই একটা এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সুগৌর ললাটের উপর ছোট ছোট কয়েকগাছি চুল অসংযতভাবে আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রভাত চেয়ারখানা টেবিলের কাছ হইতে একটু দূরে সরাইয়া লইল, এই পুণ্রব্রতা নারীর কাছে বসিতে তাহার সাহস হইতে ছিল না। সে স্বপনকে ভালবাসে বলিয়াই তাহাকে অটুট রাখিতে চায়, তাহার গায়ের ক্লেদভরা বাতাসে স্বপনকে যেন একটুও মলিনতা না দান করে। সে নিজে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, পাশ্চাত্য দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে বহুকাল কাটাইয়া আসিয়াছে, এই পুণ্যব্রতকে তখন ঘৃণাই করিয়াছে, আজ সে ঘৃণা করিতে পারিল না, এই হিন্দু নারীর নিষ্ঠার কাছেই সে সসম্মানে মাথা নত করিল। তাহার সারা হৃদয়খানি অনন্ধভূত মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে এই মুহূর্ত্তে স্বীকার করিল যথার্থ সৌন্দর্য্য বিলাসের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না, মন যখন নিস্পৃহ হয় তখনই অন্তরের সৌন্দর্য্য বাহিরে বিকশিয়া উঠে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার কি কথা আছে স্বপন, কি বলবে আমাকে—বল।"

স্বপন অন্যমনস্কভাবে দেয়ালে প্রজ্বলিত আলোটার পানে চাহিয়াছিল। আজ সন্ধ্যায় আকাশ পাতলা মেঘে আবৃত হইয়াছিল, বাহিরের অনেক পতঙ্গ এই মেঘভরা আকাশের তলে কক্ষ মধ্যে আলো দেখিয়া উড়িয়া আসিয়াছিল। চিমনির চারিদিকে তাহারা উড়িতেছিল, চিমনির গায়ে ঠেকিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছিল, আবার মরিবার জন্যই প্রাণপণে উঠিয়া আলোর চারিদিকে ঘুরিতেছিল। স্বপন এই দৃশ্যের সহিত নিজের অবস্থা মিলাইয়া দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

তাহার রূপ আছে, অগাধ সম্পত্তি আছে, শিক্ষা আছে, শুধু এই জন্যই জগতে প্রভাতের মত কতকগুলি লোক তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এমনিই করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই আলোটী নিভাইয়া দিলে পতঙ্গগুলি কোথায় যাইবে, আবার অন্য কোথাও আলো দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়া সেইদিকে ছুটিবে; স্বপনের রূপ থাকিলেও রূপেয়া যখন থাকিবে না তখন ইহারাও অন্যদিকে ছুটিবে, তাহার আশা ত্যাগ করিবে ইহা সত্য কথা।

"স্বপন—"

প্রভাতের প্রথম কথাগুলি তাহার কানে আসে নাই, আহ্বান শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়া তাহার পানে চাহিল।

"হ্যাঁ, তোমায় একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি বটে, কিন্তু—"

তাহার কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া গেল।

প্রভাত বলিল, "কিন্তু কি স্বপন, কথাটা বলতে পারছ না? যেমন সহজভাবে বল্‌বে ভেবেছিলে তেমনভাবে বল্‌তে পারছ না? অসঙ্কোচে বল, যতই অপ্রিয় হোক না—আমি তা সইতে পারব, আমি তা শুন্‌তে পারব এমন শক্তিটুকু আমার আছে। আমি পুরুষ স্বপন, মেয়ে নই যে এতটুকু আঘাতে বুকটা আমার একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। যত অপদার্থ আমায় ভাবছ বাস্তবিক তত অপদার্থ আমি নই, আমি তোমার সকল কথা শুন্‌বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি।"

স্বপন মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, ধীরকণ্ঠে বলিল, "তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি একটা অপ্রিয় সত্য শুন্‌বার জন্যে তুমি প্রস্তুত হয়ে আছ। সেটা অন্য কারও মুখে শুনেও বুঝি তোমার প্রত্যয় হয়নি তাই তুমি আমার মুখেই স্পষ্ট করে শুনতে চাও? আমি

জানি, এ সত্য তোমার মনেও জেগেছে, কেবল একলা আমার মনেই জাগে নি।"

একটু কাল সে নীরবে প্রভাতের মুখের উপর দুইটী চোখের দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর ব্যথাভরা সুরে বলিল, "বাবা তোমায় আমার ভাবী স্বামী নির্ব্বাচিত করে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যেই বিলাতে পাঠিয়েছিলেন, তুমি বাবার কাছে যে কথা বলে গিয়েছিলে তা রেখেছ, বাবার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করেছ, কিন্তু আমি যে আমার কথা রাখতে পারলুম না।"

সে দুই বাহুর মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

শান্তকণ্ঠে প্রভাত বলিল, "সে আমি অনেক কাল আগেই জেনেছি স্বপন, এর জন্যে তুমি এতটা কাতর হচ্ছো কেন? আমি আগেই বলেছি যতটা অপদার্থ আমায় ভেবেছ, আমি ততটা অপদার্থ নই, আমার মধ্যেও যথার্থ মনুষ্যত্ব এটুকু অন্ততঃ পক্ষে আছে যা, একটী নারীকে তার ছোটবেলাকার প্রতিশ্রুতি হতে মুক্তি দিতে পারে, তুমি সেইটুকু ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পার।"

তাহার উদার হৃদয়ের কথা ভাবিতে স্বপনের দুটি চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, সে মুখ তুলিতে পারিল না।

প্রভাত ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি, ভাবছ আমিও তোমায় প্রতারণা করছি, মানুষের কাছে অহরহঃ প্রতারিতা হয়ে তুমি আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছ না। এতে তোমার বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই, কেন না সংসারে যথার্থ বিশ্বাসের কাজ করতে পারে এমন একজন লোক কাউকেই তুমি পাওনি। অবশ্য স্বামীজি ছাড়া—তাঁকে আমি

সংসারের বাইরের লোক বলেই জানি, তাই তাঁকে সাংসারিক কোন কথায় টেনে আনতেও চাই নে। যথার্থ এ সংসার অবিশ্বাসীতেই ভরা, বিশ্বাস করে যাও—ফিরে পাবে অবিশ্বাস। সংসারের কপালে জ্বলজ্বলে লেখা রয়েছে অবিশ্বাস ; তুমিও সেটা পড়েছ, আঘাত পেয়ে ঠিক জেনেছ আঘাতের ব্যথা চিরস্থায়ীই হয়, প্রাণপণ চেষ্টা করলেও এ ব্যথার দাগ মিলিয়ে যায় না। তবু—তবু বল্‌ছি স্বপন, ভাল করে আমার মুখের পানে চাও, আমার চোখের 'পরে তোমার চোখ রাখো, দেখ—তাদের মত আমার কপালে অবিশ্বাসীর ছাপ ফুটে উঠেছে কিনা, আমার চোখে মনের গোপন স্বার্থের বিকাশ হচ্ছে কিনা। আমায় বিশ্বাস কর ; বিশ্বাস কর আমি যে তোমায় ছোটবেলায় নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতুম, সেই অমর ভালবাসাই তোমায় অটুট অব্যয় করে রাখবে, তোমার শুভই করবে ; যাতে তোমার একগাছি মাথার চুল কেঁপে উঠে তা কখনই করতে পারবে না।"

স্বপন মুখ তুলিল, তাহার সমস্ত মুখখানা তখন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চোখের পাতা দুটি তখনও চকচক করিতেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তা আমি জানি ; আমি জানি ছোটবেলায় তুমি আমায় বড় ভালবাসতে, তাই দেখেই আমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেছিলেন, আমিও পেছন ফিরে না চেয়ে, সামনের দিকে না চেয়ে তাতেই রাজি হয়েছিলুম। দিন যত যাচ্ছে, নিজের অবস্থা যত বুঝতে পারছি, ততই জানতে পারছি আমি মত দিয়ে ভাল কাজ করিনি। তোমার পথ একদিকে, আমার পথ একদিকে, তোমায় চলতে হবে তোমার পথে, আমায় চলতে হবে আমার পথে, কেউ যখন কারও পথ ত্যাগ করতে পারব না, তখন আমাদের মিলন হবে কি করে?

আমি পৌত্তলিক হিন্দু, তুমি খৃশ্চান ; তুমি ধরে আছ একটা, আমি ধরে আছি তেত্রিশ কোটী। গোড়াতেই যদি ভুল রইল, কেমন করে আমরা নিজেদের বয়ে নিয়ে চলব ? ভিত্তি কাঁচা থাকবে, প্রাণপণ চেষ্টায় যে ইমারত গড়ে তুলব কোনদিন একটী আঘাতে সে ধূলিস্তাৎ হয়ে যাবে, এ হবেই। এ জানিত সত্য কথা—এ বিয়ের ফলে অবশ্যই সুধা উঠবে না, গরল উঠবে, তাতে আমাদের দুজনের জীবনই বিষময় হয়ে যাবে, শুধু এই জন্যেই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারব না, তুমিও কিছুতেই আমায় বিয়ে করতে পারবে না। দুই বিভিন্নধর্ম্মী কখনই এক হয়ে যেতে পারবে না, বিবাদ মনোমালিন্য এদের মধ্যে ঘটবেই। আমি যদি ছোট থাকতুম, সেই সময় যদি বিয়ে হতো, তোমার মতেই আমায় মত দিতে হতো, এতদিন আমি তোমাদের মনের মতই নিজেকে গঠিত করে তুল্‌তুম, কিন্তু এখন তা আর হবে না। আমায় নিজের মতের 'পরে নির্ভর করে বাবা যখন বিয়ের আদেশ দিয়েছিলেন, তার অনেক আগেই আমার স্বভাব গঠন হয়ে গেছে, ভেঙ্গে চুরে নূতন করে আমায় আর গড়ে নিতে পারবে না ; কেন না অভ্যাস আমার মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই সব দেশে এককালে ছোটবেলায় মেয়েদের বিয়ে হতো। আজ কাল বড় করে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়, এতে ফল হয় এই—এই সব বড় মেয়েরা নিজেরাও যৎপরোনাস্তি কষ্ট পায়, স্বামী ও তাঁর পরিজনবর্গও প্রথমটায় খুবই কষ্ট পান। কোন কোন মেয়ে নিজেকে ভেঙ্গে চুরে শ্বশুরঘরের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলেও সকল মেয়ে তো তা পারে না, কাজেই আমাদের দেশে আজকাল ঘরে ঘরে ঝগড়া-বিবাদ পৃথক হওয়া চলছে। আমি যে তোমায় বিয়ে করে সেই রকম ভাবে স্বার্থের দিকেই দেখব, তোমায় তোমার বোন, আত্মীয়-

আত্মীয়র কাছ ছাড়া করব, তেমন স্বভাব আমার নয় ; ভগবান্ তেমন নীচ মন আমায় দেন নি। ছোটবেলায় কি বলেছি, কি করেছি, সে সব ভুলে যাও ; মনে কর আমি পৌত্তলিক হিন্দু, তোমাদের ঘৃণার পাত্রী। কাকীমা, কাকাবাবু মৌখিক আমায় ভালবাসা দেখালেও আমি বুঝতে পারি তাঁরা আমায় অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন। তুমিও আমায় ঘৃণা করো ; ছোটবেলাকার কথা ভুলে যাও। সকলের ঘৃণা পেয়েছি, এখন তোমার ঘৃণা পেলেই আমি যথার্থ খুব খুসি হব, তোমার ঘৃণা কুড়ানোর জন্যেই এত আয়োজন।"

প্রভাত হাসিল, সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল অন্তরের জমাট ব্যথা। —"ঘৃণা করব, ঠিক কথাই বলেছ স্বপন! জানি নে, কখনও কাউকে অন্তর দিয়ে তুমি ভালবাসতে পেরেছ কিনা, যদি ভালবেসে থাকো তোমার প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে—দেখ, তাকে ঘৃণা করতে পারো কি? আমি জানি প্রকৃত প্রেমের কাছে আত্মীয় স্বজন কিম্বা ধর্ম্ম কেউই দাঁড়াতে পারে না,—কিন্তু থাক্, তা নিয়ে আমি আর কথা বলব না। তুমি ভাববে আমি তোমায় এই সব কথা বলে মুগ্ধ করতে এসেছি। আমি তোমায় একটা সত্য কথা জানাতে চাই। একটা ভুল ধারণা তোমার আছে, সকলে তোমায় তোমার অসীম সম্পত্তির জন্যেই ভালবাসে, স্নেহ করে, অবশ্য এটা দেখে তুমি তাই জেনেছ। কিন্তু এই স্বার্থপরের রাজ্যে কেউ যে তোমার জন্যেই—তোমার সম্পত্তি, রূপ, শিক্ষা, এ সব বাদ দিয়ে—শুধু তোমার জন্যেই তোমায় ভালবাসে তা কোনদিন ভেবেছ কি? রূপ শিক্ষা ঐশ্বর্য্য অনেক মেয়ের আছে, গর্ব্বের কথা নয়— তারা আমায় স্বামীরূপে পাওয়ার কামনাও করে, কিন্তু আমি তো কিছুই চাইনে স্বপন! আমি রূপের জন্যে ভালবাসিনি, শিক্ষার

জন্য ভালবাসিনি, ঐশ্বর্য্যের জন্য ভালবাসিনি, কেন না আমি যে ছোট্ট মেয়েটীকে প্রথম কোলে তুলে নিয়েছিলুম, তার রূপের বিকাশ তখন এত হয় নি, তার শিক্ষা তখন মোটেই হয় নি। আমার কোলে মাথা রেখে সে আমার মুখের পানে চেয়ে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ত, আমার সঙ্গে ছুটোছুটি কর্‌ত, খাবার পেলে আমায় অর্দ্ধেক না খাইয়ে তার তৃপ্তি হতো না। কিন্তু না, থাক্ সে সব কথা স্বপন, তোমার কান পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে, আমি সে কথা আর তুলব না। ভেবেছিলুম মুখ ফুটে কোনদিন বলিনি, কোনদিন বলবও না, আমার বুকের কথা বুকেই লুকিয়ে থাক্। বড় ব্যথা পেয়ে—বড় আঘাতে আজ কথাটা বার হয়ে পড়েছে স্বপন, এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে আমায় ক্ষমা করো। আমি জানি তুমি ছোটবেলায় আমার থাকলেও এখন আমার নও, আমার চেয়ে অনেক উপরে চলে গেছ, তোমার নাগাল হয় তো আমি এ জীবনে পাব না, তবু তাতে আমি তো দুঃখিত নই স্বপন, কেন না দৈহিক মিলন—যা অতি তুচ্ছ ভোগের বস্তু মাত্র, তা আমার অভিপ্রেত নয়। আমার ভালবাসা স্বর্গীয়, আমি তোমায় দেবীর আসনে বসিয়ে ভক্তের মত তোমার পায়ের তলায় বসে আমার প্রাণের অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমায় দেব, তুমি শুধু নাও। আমি তোমার কাছে কোনও দিন কিছু চাইনি, কখনও কিছু পেতে চাইব না, কেবল দিয়ে যাব, তোমায় কেবল নিয়ে যেতে হবে। যথার্থ কথা বলছি স্বপন, তোমায় আমি উপাস্যরূপে পূজো করে যত সুখী হব, তোমায় উপভোগ করতে পেলে কখনই তেমন সুখী হতে পারব না। চাঁদ দূরে থাকে বলেই আমরা চাঁদকে বড় সুন্দর দেখি, যদি কাছে পেতুম, যদি তাকে উপভোগ করতে পেতুম, দেখতুম তার মধ্যে কিছুই নেই। ফুলটী যতক্ষণ গাছে ফুটে থাকে,

ততক্ষণই তার সৌন্দর্য্য থাকে, তাকে তুলে নিলে সে বিবর্ণ হয়ে যাবে, ঝরে পড়বে, তখন দেখব সে মাটি হয়ে মাটিতেই পড়ে গেল। আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে, ভালবাসার জিনিসকে দূরেই রাখতে হয়, বড় কাছে পেতে নেই। আমি তোমায় দেবীর চোখে দেখব, তুমি আমায় তোমার ছোটবেলার সেই বন্ধুর চোখে দেখ। যদি বিপদে পড় আমায় ডেকো, আমি তোমার সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

"সাহায্য—সাহায্য—"

স্বপন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। প্রভাত বলিল, "এখনই তোমার যে বিপদ উপস্থিত তা বেশ জানতে পেরেছ। তোমার সব যেতে বসেছে, সব যাবে, শেষটায় তোমায় পথেই দাঁড়াতে হবে। দেখ, যদি তোমার এ বিপদে তুমি আমার সাহায্য চাও, তবে আমি সাহায্য করতে পারি ; এখনও হয় তো আমার সাহায্য পেলে তোমার উপকার হতে পারে।"

স্বপন চিন্তিত মুখে মাথা নাড়িল।

প্রভাত ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "আমি অপরাধী, তাই তুমি আমার সাহায্য নেবে না। যদি পথের অচেনা কোনও লোক অযাচিতভাবে তোমায় এতটুকু সাহায্য করতে আসত, তা তুমি নিতে পারতে। আমি তোমায় ভালবাসি এই আমার অপরাধ, কিন্তু একি এতই গুরুতর স্বপন, আমার ভালবাসাকে তুমি এমন ভাবে অপমান করতে পারলে এই আশ্চর্য্য! আমি তোমায়—"

স্বপন একটু হাসিল, শান্তস্বরে বলিল, "ভুল বুঝেছ তুমি, আমি সে অপরাধ করিনে। ভালবাসা মানুষের স্বভাবজ ধর্ম্ম, এর জন্যে কাউকে দোষী করা যায় না। আমি তোমার সাহায্য নেব না তার অন্য কারণ আছে।"

প্রভাত ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কি কারণ স্বপন ?"

স্বপন বলিল, "তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছো আমার সব যাচ্ছে কেন, কার লোলুপদৃষ্টি আমার সম্পত্তির 'পরে পড়েছে। তুমি মনে ভাবছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, তা নয়, আমি সব বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রতিবিধানের উপায় আমার নেই বলেই সব সহ্য করে যেতে হচ্ছে। ডাক্তার কাকা কাল আসবেন, রজনীবাবুও আসবেন, তখন দেখা যাবে কতদূর কাণ্ডটা গড়িয়েছে, কিছু রক্ষা করা যাবে কিনা। তুমি আমায় সাহায্য করতে আসবে এতে তোমায় তোমার আত্মীয় স্বজনের স্নেহ প্রীতি হারাতে হবে। আমার জন্যে কেউ যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আমি তা চাইনে, চাইনে বলেই তোমার উপকারও নিতে পারব না। আমার অন্য উদ্দেশ্য কিছু নেই, এর জন্যে আমায় মাপ করো।"

উত্তেজিত প্রভাত বলিল, "সব বুঝছ, তবে এখনও কেন হরেনবাবুকে কাজে রেখেছ ? তাঁকে পদচ্যুত করে অন্য কাউকে এ কাজে দিলে হয় তো সব যেত না।"

স্বপন ধীরস্বরে বলিল, "কেন করিনি তা তুমি বুঝবে না, অনেক ভেবেই আমি তাঁকে ছাড়াইনি। এখন হঠাৎ তাঁকে কর্ম্মচ্যুত করলে যেটা যেতে দশদিন অন্ততঃ পক্ষে সময় নিত, সেটা এক সন্ধ্যাতেই যাবে, তিনি শত্রু হলে আমার যেটুকু আশা আছে সেটুকুও যাবে। এখন তাঁর হাতে পায়ে ধরে খোসামোদ করে তাঁর মনটা নরম রাখতেই হবে, এদিকে অন্য চেষ্টাও দেখতে হবে। অবশ্য তিনি বাবার বন্ধু, আমায় কোলে করে মানুষ করেছেন, স্বার্থের দিকে টান্‌লেও যথার্থই কি আমার এমনি করে সর্ব্বনাশ করবেন, আমায় পথে বসাবেন ? তিনি আমাদের অনেক এমন কথা জানেন যা প্রকাশ হলে আমার সমাজে মুখ দেখানো

দুষ্কর হবে। তিনি আমার শত্রু হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। নানা রকম ভেবে আমি নীরবে থেকে গেছি, মুখ ফুটে কোনও কথা বলতে পারছিনে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি কোন ক্রমে বাকি খাজনাটা মিটিয়ে দিতে পারি, মহালটা মুক্ত করতে পারি, তারপর দেখে নেব, নিজে সব দেখাশুনা করব, ম্যানেজার উপলক্ষ্য থাকবে মাত্র।"

মনের আবেগে কথাগুলা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দেয়ালের বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল, প্রভাতের চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া পড়িল, সচকিত ভাবে সে বলিয়া উঠিল, "ন'টা বেজে গেল স্বপন, আমায় বারটার মেলে যেতে হবে।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "আজই যাবে! শুনেছিলুম আর কয়দিন তুমি এখানে থাকবে?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত বলিল, "না, এসব দেখে শুনে আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না, মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এখান হতে যেতে পারি ততই ভাল। আইন বাঁচিয়ে এমন জুয়াচুরীও চলে যায়, দেখে আমার মনে হচ্ছে এমন আইনের মাথায় লাথি মেরে একে চুরমার করে ফেলি।"

স্বপন বলিল, "আইন বাঁচিয়ে রেখে নিত্য এমন কত জুয়াচুরি চলে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই, তা বলে করা যাবে কি? যার যায় তারই যায়, অন্যের তাতে কি বল?"

প্রভাত চেয়ার ত্যাগ করিল, স্বপনও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। দুই পা অগ্রসর হইয়া প্রভাত হঠাৎ ফিরিল। স্বপনের একখানা হাত চাপিয়া

ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার একটী অনুরোধ রেখো স্বপন, এ রকম উদাসভাবে আর থেকো না। সব ভার ভগবানের 'পরে চাপিয়ে এ রকম করে নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থেক না। জেনো ভগবান্ কাউকে নিশ্চেষ্ট থাকতে বলেন নি, চেষ্টা করে ফলটা তাঁর 'পরে নির্ভর করতে বলেছেন। আমি খৃশ্চান, কিন্তু মনে ভেব না তোমাদের হিন্দুশাস্ত্র কিছুই পড়িনি, বিলেত হতে ফিরে এসে তুমি খাঁটি হিন্দু হয়েছ শুনে আমি যত হিন্দুশাস্ত্র আছে সব পড়েছি। ভগবান্ যা বলেছেন সেই উপদেশ অনুসারে কাজ কর। জানি তুমি বিলাস ত্যাগ করেছ, তুমি সর্ব্বস্ব-ত্যাগের পথে চলেছ, ভোগ তোমার জন্যে নয়। তবু বলছি—মনে কর ভগবানের জিনিস তুমি রক্ষা করছ, তাঁরই ধনসম্পত্তি তুমি পাহারা দিচ্ছ, তাঁরই কাজে ব্যয় করবার জন্যে। জগতে সৎকাজের অভাব নেই, দরিদ্রের হৃদয়েও সৎইচ্ছার নিবৃত্তি নেই। কিন্তু প্রধান অভাব অর্থের জন্যেই তার অনেক বাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। ধনীর হৃদয়ে যদি সৎইচ্ছা জাগে, পূর্ণ করতে দেরী হয় না, কেননা, তার হাতে অর্থ থাকে। তুমি নিজে যদি এখনও বুঝতে না শেখো তোমায় পথের ভিখারিণী হতে হবে, তোমার মনের কোনও ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তোমার উদাসীনতাই তোমার সর্ব্বনাশ করবে, তাই বলছি স্বপন—"

স্বপন হাতখানা ছাড়াইয়া পিছনে সরিয়া গেল, স্থিরকণ্ঠে বলিল, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করছিনে, তারপর ফল ভগবানের হাতে।"

"হ্যাঁ, চেষ্টা করো, আর যদি কোনও দরকার পড়ে আমায় জানিয়ো, আমি তোমার বন্ধু তাই মনে করো—ছোটবেলার মতই তোমার কথা নিঃসঙ্কোচে আমায় বলো। বল জানাবে, বল্‌বে ?"

স্বপন তেমনই অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "বল্‌ব।"

আর একবার স্বপনের শান্ত দীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া প্রভাত বিদায় লইল।

১৫

বহুকাল পরে ভবানীপ্রসাদের একখানি পত্র আসিয়া স্বপনের হাতে পড়িল। তিনি লিখিয়াছেন—

রাণু মা,

তিনটী বছর পরে আজ তোমার কথাটা বিশেষ করে আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে, বুঝতে পারছি নে কেন। কই এতকাল তো হৃদয়ের মধ্যে এমন চাঞ্চল্য অনুভূত হয় নি, মনেও হয় নি স্বপন নামে আমার একটী মা বাংলাদেশের একটী পল্লীতে রয়েছে। আজ মনে পড়ছে এই সুদূর আমেরিকায় বসে সেই শ্যামল তরুলতা-শোভিত পল্লী-খানির কথা, আর মনে পড়ছে আমার মায়ের মুখখানি।

আমার মনে হচ্ছে, ভাগ্যহীনা বালিকা-মাটী আমার সংসার-সমুদ্রের মধ্যে পড়ে ভাসছে ; কখনও ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠে দুই হাত তুলে ডাকছে—"জ্যেঠা মশাই—" তারই সেই করুণ সুরটী আমার বুকের মধ্যে এসে বাজছে, এই শান্ত সমুদ্রের তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করে তুলেছে।

মা আমার, ভুলে গিয়েছিলুম আমার মত সংসারছাড়া জীবের পায়েও ভগবান্ একটি মায়ার বাঁধন পরিয়ে দিয়েছেন। আমার মা আমার দিকে চেয়ে আছে, কবে আমার দেখা পাবে বলে পথ পানে চেয়ে

দেখছে। আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন এই বিশ্রামের সময়ে ঘরের কথা মনে জেগে উঠেছে।

আমার আবার ঘর—শুনে হাসছো কি মা? হ্যাঁ, আমার মত উদাসী ঘরছাড়া লোকেরও ঘর আছে, সে ঘর মা তোমার কাছে। তোমার আকাঙ্ক্ষা আমায় ডাকছে, আমি কি আর স্থির থাকতে পারি? চিকাগোয় যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু যেতে আর ইচ্ছা করছে না। আমার শ্রান্তি জীবনে কখনও আসে নি, চিরদিনই আমি বড় চঞ্চল, কিন্তু আজ কেন মা আমার শ্রান্তি আসছে, কেন আমি নিশ্চল হয়ে পড়ছি?

পাগলা ছেলেটাকে কাছে নিতে চাও মা, মায়ের প্রাণ ছেলেকে কিছুদিন না দেখতে পেলে অধীর হয়ে ওঠে, কিন্তু ছেলের ক্ষতিটা একবার ভাবছ না মা? আমি তোমায় যা দিয়ে এসেছি, বোধ হয় তার ব্যবহার করতে পার নি, সাধনা করতে পার নি, তাই তোমার মন এত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনকে এখনও বাঁধতে পারনি মা, এখনও ভেসে রয়েছ, আমার উপদেশটা কানেই শুনেছ, অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পার নি।

আমি ভগবানের কাছে চেয়েছিলুম একটী মাতৃমূর্ত্তি, তিনি তা দিতে কার্পণ্য করেন নি, আমি তোমায় পেয়েছি। বড় সাধ ছিল আমার বাসনাফুল দিয়ে তোমার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত সাজিয়ে তোমায় পূর্ণ করে তুলব, এখানকার ডাকে সে সাধ পূর্ণ হয় নি, আমায় অর্দ্ধেক সাজিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল। দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার সকল সাধ এইবার পূর্ণ হবে, আমি যখন ফিরব তখন তোমায় আমার মনে যে মূর্ত্তি রয়েছে তাতেই পরিণত হতে দেখব। এই যে তোমার আকুলতা, এই যে তোমার আমার জন্যে চঞ্চলতা—এই তোমায় এগিয়ে দিচ্ছে, তোমায় শক্ত করে তুলছে।

বুঝেছি বিপদ আসছে দেখে ভয় পেয়েছ তাই আমায় ডাকছো। পাগলি, আমি থাকলেই কি তোমায় বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারতুম? মানুষের ক্ষমতা কতটুকু মা, সে যে সীমাবদ্ধ, গণ্ডীর ওপারে পা দেওয়ার ক্ষমতা তো তার নেই। যাঁর অসীম ক্ষমতা তাঁকে ডাকছো না কেন মা, তাঁকে ডাকলে যে ফল পেতে। যিনি সাধুকে আনন্দ দিতে পাপীকে দমন করতে যুগে যুগে আসছেন তাঁকে ডাকো, তিনি তোমার ত্যাগের—সাধনার পুরস্কার দেবেন, তোমার বল দেবেন।

যত দুঃখই আসুক না কেন সয়ে যাও, কেবল সয়ে যাও। যদি সইতেই না পারবে তবে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়ে জন্মেছ কেন মা? ইতর জীব দুঃখের আঘাত সইতে পারে না, তারা চেঁচিয়ে কেঁদে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, মানুষও কি তেমনি করবে? কত জন্ম পরে এবার যে জন্ম পেয়েছ এই জন্মের সার্থকতা করে নাও তোমার জ্ঞান দিয়ে। পেছিয়ে পড়ে থাকবে কেন, মানুষ হয়েছ এগিয়ে যাবার জন্যে। এক জন্মেই যদি সব শেষ হয়ে যেত তাহলে ভাবনা কিছুই থাকত না, তা তো নয় মা, জীবের জন্ম মৃত্যু আছেই—এই মরছে এই জন্মাচ্ছে—এমনি আসা-যাওয়া ব্যাপার নিত্য চলছে। আমাদের চোখে যা বছর যুগ, কালের চোখে তা একটী নিমেষ মাত্র। এই নিমেষটুকুর মাঝে কাজ করে যাও, শুধু কাজ করে যাও, পেছিয়ে যেয়ো না। এক জন্মেই কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না; জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য পাপ সঞ্চয় করতে করতে এক জন্মে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে।

ভোগের নিবৃত্তি নেই মা,—যত পাওয়া যায় ততই পেতে ইচ্ছা হয়। এতেই সর্ব্বনাশ হয়, তাই তোমায় নিয়ে গেছি ত্যাগের পথে, ত্যাগের মন্ত্রেই তুমি দীক্ষিতা। ভোগ মানুষকে অনন্ত নিরয়গামী করে, ত্যাগ

তাকে অনন্ত সুখ দান করে। মা—কেন তোমার মন চঞ্চল হবে, তুমি তো তোমার নও, তুমি তাঁর সেই কথা মনে করে রেখে দাও।

যা যাচ্ছে, যা থাকছে সব ভগবানকে উৎসর্গ করে দাও, দেখবে অসীম তৃপ্তি তাতে, চাঞ্চল্য বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারবে না।

ক্ষুদ্র মানুষের 'পরে এতটুকু নির্ভর করো না রাণী, মানুষ ক্ষণস্থায়ী, কখন পড়ে যাবে ঠিক নেই। নির্ভর কর তাঁর 'পরে—যাঁর ধ্বংস নেই —যিনি অবিনশ্বর।

আমি তোমায় ছেড়ে দিয়েছি, দূরে এসেছি শুধু তোমায় সবলা করবার জন্যে। এখন যাব না—কিছুদিন পরে ফিরব। যখন দেখব তুমি যথার্থ সব ছাড়তে পেরেছ, যথার্থ মানুষ হয়েছ, তখন তোমার কাছে আমায় পাবে।

আমার আশীর্ব্বাদে যেন চিত্তকে জয় করতে পার, যেন বল পাও। আমিও তোমার জন্যে প্রার্থনা করছি—আমার মাকে আমি যেন পূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখতে পাই।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
ভবানীপ্রসাদ।

পত্রখানা স্বপনের জ্বালাময় চিত্তে সুবিমল শান্তিধারা ঢালিয়া দিল। সে দিনের পর দিন ধরিয়া এই পত্রখানিরই অপেক্ষা করিতেছিল, আজ আকস্মিক পত্র সে পাইয়াছে, আজ তাহার সুপ্রভাত।

জ্যেঠামশাই ভাবিয়াছেন সে অন্য কোন কারণে চঞ্চলা হইয়াছে। হায়রে তিনি জানেন নাই তাহার সবই যাইতেছে, সে পথের ভিখারিণী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই বা কি, তিনি থাকিলেও সেই তেমনই করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া হাত দুখানা বুকের উপর রাখিয়া বিভোর প্রাণে গাহিয়া উঠিতেন—

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।

হাঁ, যথার্থ কথাই এ, প্রার্থনা করিতে হইলে এই প্রার্থনাই করা চাই। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক প্রভু। মানুষের কতটুকু শক্তি, কতখানি কাজ সে করিতে পারে যদি না তোমার শক্তি পায়? ওগো অনন্ত অসীম, অনন্ত দয়া তোমার, তোমার ইচ্ছায় পৃথিবী সৃজিত হইয়াছে, তোমারি ইচ্ছায় জীব জন্মে মরে, তোমার ইচ্ছায় সুখ দুঃখ যাওয়া আসা করে। হাঁ, আজ স্বপনও নতজানু হইয়া বসিয়া দুইখানি হাত ললাটে রাখিয়া সজল চোখ-দুইটী অনন্তের পানে তুলিয়া বারবার বেদনাভরা কণ্ঠে বলিতেছে

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।

বাহিরের কোলাহলে তাহার স্তিমিত ভাব দূর হইয়া গেল, প্রজাদের আর্ত্ত রোদন কানে ভাসিয়া আসিল—তাহারা মা মা করিয়া ডাকিতেছে কাহাকে? হৃদয়ের মধ্যে ঘুমন্ত মাতৃমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল,—সেই যে মা আর কে আছে এ হতভাগাদের? সে মা বলিয়াই সন্তানেরা ব্যথা পাইয়া তাহারই দুয়ারে ছুটিয়া আসিয়াছে। মায়ের কর্ত্তব্য তাহাদের কোলে তুলিয়া লওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া, চোখের জল মুছাইয়া দেওয়া।

বিশ্বস্ত আমলা বৃদ্ধ গৌরীসেন দরজার বাহির হইতে ডাকিলেন "মা—একটা কথা আছে।"

স্বপন ত্রস্তভাবে বাহিরে আসিল "কি কথা?"

গৌরীসেন বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "প্রজারা একবার আপনার দেখা পেতে চায়, নীচে আসবেন কি।"

স্বপন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল নীচে যাইবে কিনা। মনে পড়িল হরেনবাবুর কথা, তিনি বলিয়াছেন ইহারা মাটির নীচে টাকা,

লুকাইয়া রাখিয়া জমিদারকে ফাঁকি দিবার মতলবে অনাহারে কষ্ট পায়। সম্ভব হইতেও পারে, এ জগতের উপাদান অবিশ্বাস, এখানকার অধিবাসী সকলেই প্রবঞ্চক।

তথাপি সে নীচে চলিল, কোন এক অজানিত আকর্ষণে যেন সে আকর্ষিত হইতেছিল।

বৈঠকখানার সম্মুখের বিস্তৃত হলটা প্রজায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্বপনকে সেখানে দাঁড়াইতে দেখিয়া তাহাদের নিরাশমগ্ন প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, আনন্দের সুর স্বপনের কানে ভাসিয়া আসিল "ওরে, আমাদের মা এসেছেন, আর কোন ভয় নেই।"

ইহাদের মলিন শুষ্ক মুখ, জীর্ণদেহ, ছিন্ন পরিধেয়, স্বপন ব্যথিত নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল; ইহারাই তাহার প্রজা, ইহারা তাহারই জমিদারিতে বাস করে, ইহাদের দেখাশোনা ভাল মন্দের ভার তাহারই উপরে ন্যস্ত। কিন্তু হায়রে, এই যে দুই বৎসরের অধিককাল সে জমিদারি পাইয়াছে, ইহাদের এতটুকু উপকার সে করিতে পারিয়াছে কি? যখনই দেশের একটা কোন কাজ সে করিতে ইচ্ছা করিয়াছে তখনই হরেনবাবু তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছেন। দেশের লোকের অযোগ্যতা, তাহাদের নিজেদের শৈথিল্য এই কথাই তিনি বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের সাহায্য করা, উপকার করা অর্থে ইহাদের আলস্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। বরং কষ্ট পাইতেছে বলিয়াই তাহারা কর্ম্মঠ হইতেছে; ইহারা যদি সুখের আস্বাদ একবার পায় দুঃখের খাটুনী খাটিতে আর অগ্রসর হইবেনা।

তহবিলে অর্থ নাই, খাজনা যা আদায় হইয়াছিল মামলা মোকর্দ্দমা করিতেই সব ব্যয় হইয়া যাইতেছে, উপরন্তু দেনাও বাড়িয়া উঠিতেছে এ

কথাটাও তিনি স্বপনকে বার বার করিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা অনেক শুভেচ্ছা স্বপনের অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। হরেন বাবু তাহাকে পুতুলের মত যে দিকে ফিরাইতেছিলেন বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই দিকেই ফিরিতে হইতেছিল।

গৌরীসেনের পানে চাহিয়া সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "এরা কি বলতে চায় আমি তা কিছুই বুঝতে পারছিনে। একজনকে সামনে এসে সব কথা বলতে আদেশ দিন।"

গৌরীসেন প্রজাদের স্বপনের কথা জানাইলেন। গোপীনাথ মণ্ডল সাহস করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল; আভূমি প্রণত হইয়া সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার দুইচোখে অশ্রুধারা, গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। বিকৃতকণ্ঠে সে বলিল "মা, জানতে চাচ্ছেন কেন তাঁর ছেলেরা আজ তাঁর দুয়ারে এসে কেঁদে পড়েছে। বড় ব্যথার কথা মা, আমাদের এই ব্যথা আপনার পায়ের তলে উজাড় করে দেব বলে সবাই মিলে ছুটে এসেছি। মা আমরা ম্যানেজার বাবুর পায়ের তলায় কেঁদে পড়েছি, চোখের জলে তাঁর পা দুখানা জনে জনে ভিজিয়ে দিয়েছি কিন্তু একফোঁটা করুণা পাওয়া দূরে থাক, একটী ভাল কথা বলা দূরে থাক তিনি দ্বারোয়ান দিয়ে আমাদের গলাধাক্কা দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই আমরা মায়ের কাছে এসেছি। মায়ের মন গলবেই ছেলেকে তিনি গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে পারবেন না এ বিশ্বাস আমাদের আছে।"

বিচলিত কণ্ঠে স্বপন জিজ্ঞাসা করিল "কেন তিনি গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন?"

চোখ মুছিয়া ফেলিয়া শুষ্ককণ্ঠে গোপীনাথ বলিল "আপনি আদেশ

দিয়েছেন সাতদিনের মধ্যে খাজনা মিটিয়ে দিতে হবে, একটাকা করে জরিমানা দিতে হবে। এই সব দরিদ্র সন্তান আপনার, নিত্য আপনার চাকরদের পীড়নে তাদের পয়সা দিচ্ছে, না দিতে পারলে লাঞ্ছনার একশেষ হবে। সেবার ম্যানেজারবাবু আমাদের কাছ হতে প্রায় দুইশ টাকা নিলেন, জানি নে সে টাকার কথা আপনি জানেন কিনা। তারপর কাছারীর আমলা-গোমস্তা এমন কি পাইক পেয়াদাদের পর্য্যন্ত আমাদের কতরকমে সন্তুষ্ট রাখতে হয় তা আপনি জানেন না। সেবার এই রসিক মণ্ডলের দুইবিঘে জমিতে নানারকম তরকারী জন্মেছিল, ম্যানেজারবাবু সামান্য একটা ছল ধরে সব লুঠ করে কাছারী নিয়ে গেলেন, বেচারা একটী পয়সাও পায়নি। তারপরে—"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্বপন আরক্তমুখে বলিয়া উঠিল "থাক থাক ওসব কথা আর আমি শুনতে চাইনে—"

বুকের উপর দুইটী বাহু পাশাপাশি রাখিয়া অস্থিরভাবে সে দূরে সরিয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া সম্মুখে প্রবাহিতা শীর্ণাকৃতি গ্রাম্য নদীটার পানে চাহিয়া রহিল।

শুনিতে চাহিনা বলিলেই তো চলিবে না, সে না শুনিলে এসব হতভাগ্যদের অভাব অভিযোগ শুনিবেই বা কে? ম্যানেজার বাবুর পীড়নের ভয়ে ইহারা এতকাল তো তাহাকে একটা অভিযোগও জানাইতে আসে নাই, আজ বড় উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়াই পীড়নের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মনে আশা আছে স্বপন এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবে, তাহারা দুঃখের অন্ন সুখে আহার করিয়া বাঁচিবে।

স্বপন ফিরিল, আবার তাহাদের কাছে আসিল, শান্তস্নিগ্ধ কণ্ঠে

বলিল "না, তোমরা বল—যা যা ঘটেছে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে সব আমার কাছে বলে যাও, আমি সব শুনব। আমি তোমাদের জমীদার; নারী হলেও পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা আমার আছে, আমি এ অত্যাচারের প্রতীকার উপায় নিশ্চয়ই করব।"

তাহার অকস্মাৎ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া গোপীনাথ থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল, তাহার আর কথা কহিবার শক্তি ছিল না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল "সে সব ঘটনা আপনি মন করলে একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন মা, আমরা সে সব কথা আর কি বলব। আপনি দয়া করে আমাদের এ দায়টা হতে উদ্ধার করুন। অনেক আশা করে এসেছি, আমাদের ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেবেন না, আমরা বড় কাঙাল যে মা।

স্বপন খানিক চুপ করিয়া রহিল। এই সব হতভাগ্যের পানে তাকাইয়া, ইহাদের বেদনাপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার কোমল বুকখানা ফাটিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিতে লাগিল।

"স্বপন—"

পিছন ফিরিয়াই সে হরেনবাবুকে দেখিতে পাইল। তাঁহার মুখখানা বড় অন্ধকার, দুটি চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

প্রজাদের পানে চাহিয়া অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন "এখানে কি করতে এসেছ তোমরা, ভেবেছ এখানে এসে দু চার ফোঁটা চোখের জল ফেললেই নারীর মন গলে যাবে, তোমরা খাজনার দায় হতে মুক্ত হবে! স্বপন, একবার এ ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মন্ত্রমুগ্ধার মতই স্বপন তাঁহার পিছনে পিছনে কক্ষ প্রবিষ্ট হইল।

হরেনবাবু তাহাকে একখানা চেয়ারে বসাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন "এ সব কি পাগলামি করছ স্বপন, তুমি কি নিজের অবস্থা কিছুমাত্র বুঝতে পারছ না? এই সব গ্রাম্য ভূতদের দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলা দেখে তোমার মন গলে গেছে, তোমার চোখে জল এসেছে। একবার এ সময়টায় নিজের কথা মনে কর, তোমার কি সর্ব্বনাশ হতে বসেছে সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি? এত কোমলা হতে গেলে জমীদারী চালানো যায় না, জমীদারি রাখতে গেলে নিজেকে কঠিন করে তুলতে হয়। ওদের চোখের জল দেখে গলে গেলে নিজের পায় নিজেই কুঠার মারবে সেটা বুঝে নিয়ো।"

স্বপন অন্যমনস্কভাবে খোলা জানালাপথে উপর দিকে চাহিয়া রহিল, হরেনবাবুর গম্ভীর কথাগুলা তাহার মাথার মধ্যে গম্ গম্ করিতেছিল।

হরেনবাবু বুঝিলেন, তাঁহার কথাগুলা স্বপনের মাথার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি মুখখানা তেমনি গম্ভীর করিয়াই বলিলেন "এই প্রজা-গুলো দু বছরের খাজনা দেয়নি। গত বছর অজন্মা ছিল, এ বছর দেবে বলে কাঁদাকাটা করায় মাপ করেছিলাম, সে কথা তোমার অজানা নেই। এ বছরও এরা অজন্মা, জলকষ্ট প্রভৃতির কথা জানাচ্ছে; অর্থাৎ খাজনা যাতে না দেওয়া হয় তারই মতলব। এ রকম করে বার বার ফাঁকি দিতে গেলে তো চলবে না মা। বার বারই যদি ক্ষমা করা যায়, খাজনা না নেওয়া হয়, আমরা গভর্ণমেণ্টকে দেব কি, কেমন করে জমীদারী রাখব? এমনি করেই রংপুরের জমীদারী যেতে বসেছে— শুধু তোমার বাপের দয়ার জন্যে। দয়ারও পাত্রাপাত্র বিবেচনা আছে, সকলকে সব সময় সমানভাবে দয়া করতে গেলে কি চলে মা? তোমার

সাতপুরুষের জমীদারী দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবে, অন্যে তা তোমার চোখের সামনে ভোগ করবে—তুমি তা দেখতে পারবে ?”

বিবর্ণমুখে স্বপন বলিয়া উঠিল “আমায় মাপ করুন কাকা, আমি আর কিছু বলতে চাই নে, কিছু করতে চাইনে। ওরা যে কেন আমার কাছে এসেছে তা আমি বুঝতে পারছিনে। আমার যে এতটুকু ক্ষমতা নেই, আমাকেই পরের আদেশে চলতে হবে, স্বাধীন জমীদার নাম মাত্র—স্বাধীনতা আমার একটুও নেই এ ওরা জানে না। ওরে হতভাগা সন্তানেরা, তোরা কার কাছে এই দয়াটুকু চাইতে এসেছিস্—, আমার যে কিছু দেবার শক্তি নেই রে, আমার যে দয়াটুকু করবার ক্ষমতা নেই।”

স্বপন ছুইহাতে মুখ ঢাকিল, তাহার করাঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু-ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল।

হরেনবাবু সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন “না মা, এমন করে কান্না তোমার মোটেই মানায় না। শিক্ষিতা তুমি, তুমিই যদি এ রকম অল্পেতেই বিচলিতা হয়ে ওঠ, তা হলে শিক্ষা দেওয়া বা পাওয়ার সার্থকতা লাভ হলো কি ? মুখ হতে হাত নামাও স্বপন, ছিঃ, চোখ মুছে ফেল। কেউ যদি এ রকম অবস্থায় তোমায় দেখতে পায়, কি ভাববে বল দেখি ?”

স্বপন মুখ হইতে হাত ছুখানা নামাইল, রুমালে চোখ মুছিয়া উদাস-নেত্রে হরেনবাবুর মুখের দিকে তাকাইল।

হরেনবাবু বলিতে লাগিলেন, “আমার কথাটা আগে শোন, ভাব ; তারপর যা করবার কর—আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। তুমি যে বললে, তুমি স্বাধীনা নও, তোমায় সর্ব্বাংশে অধীনা হয়ে থাকতে

হচ্ছে—কিন্তু কেন থাকতে হচ্ছে সেটা আগে ভাবলে হতো না কি মা? যথার্থই তোমায় তোমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য এখন আমার অধীন হয়ে থাকতে হবে, আমার 'পরেই তোমার নির্ভর করতে হবে। এখন স্বাধীনা হতে চাওয়া অর্থে এই মাঝ দরিয়ায় লাথি দিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া মাত্র, এতে ডুবেই মরবে, ভাসতে পারবে না। তোমার অ্যাটর্ণি রজনীবাবু ডাক্তার গুপ্ত সবাই তো এসেছিলেন, তাঁদের সব কথা যখন বুঝিয়ে বলা হল, তখন এই কথাই কি তাঁরা তোমায় বলে যান নি? সবাই জানছেন, তুমি স্ত্রীলোক, শিক্ষিতা হলেও নারী-হৃদয় তোমার, সেখানে কঠোরতা স্থান পায় না অথচ জমীদারী চালাতে গেলে কঠোরতাই দরকার। এ রকম কোমল মনোবৃত্তি নিয়ে এই ভয়ানক সময়ে জমীদারী নিজের হাতে চালাতে পারা যায় না। সত্যই আমি এখন তোমায় যা বলব তোমায় তাই শুনতে হবে, যে কাজ করাব সেই কাজ করতে হবে, এ আমার আদেশ বলেও জানতে পারো, অনুনয় বলেও জানতে পারো। আমি তোমার বাপের বন্ধু, বিশ্বস্থ কর্ম্মচারী, বিশ্বাসঘাতকতা কখনও করিনি, করতে পারবও না। যেমন করেই হোক—দেনা শোধ দেব, তোমার জমীদারী তোমায় ফিরিয়ে এনে দেব। তারপর আমার এখনকার এই অপরাধগুলোর জন্যে তখন তুমি আমায় কর্ম্মচ্যুত করতে পার। এখন জেনে রাখ জমীদারীর সঙ্গে তোমার যেমন সম্পর্ক নেই; প্রজাদের সঙ্গে যা ব্যবস্থা করবার দরকার সে আমিই করব, তোমার এতে হাত দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আমার আদেশ এখন তোমায় পালন করতে হবে, আমার একটী কথার 'পরে কথা বলতে তুমি পারবে না। মনিবের সাতপুরুষের জমীদারী রক্ষা করতে যদি মনিবের শত্রুতাচরণ করতে হয়, যদি তাকে বেঁধে

একটা ঘরেও ফেলে রাখতে হয়, আমি তাতেও কুণ্ঠিত—পশ্চাৎপদ হব না।"

তাঁহার মুখখানা অসম্ভব রকম দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মনের মধ্যে একভাব রাখিয়া মুখে আর এক কথা প্রকাশ করিতে একমাত্র হরেন-বাবু ব্যতীত আর কাহাকেও স্বপন দেখে নাই।

অসহায় স্বপন ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল "আমি আপনার আদেশই পালন করে যাব; কি করব বলুন?"

মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিলেও হরেনবাবুর মুখে সে ভাব প্রকাশিত হইল না; তিনি আগের মতই গম্ভীর মুখে বলিলেন "ওদের স্পষ্ট বলে দাও তুমি কিছু করতে পারবে না; তারপর যা বলবার তা আমিই বলব। তুমি ওই গোপীনাথ মণ্ডলকে চেনো না তো, ওর মত বদমায়েস ওস্তাদ সয়তান তোমার এ মহালে তার দ্বিতীয়টি নেই। ওই লোকটাই এ মহালের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, যাতে তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। আমি অনেকদিন হতে ওই সয়তানটাকে জব্দ করবার বিশেষ চেষ্টায় আছি, একটা আইন বিরুদ্ধ কাজ দেখলেই পুলিসে দেব, বিশেষ রকম জব্দ করে তবে ওকে ছাড়ব।"

স্বপন উঠিল, শ্লথপদে আবার বাহিরের হলে আসিয়া দাঁড়াইল।

অনেক আশা লইয়াই হতভাগ্য নিপীড়িত দরিদ্র প্রজারা ম্যানেজার বাবুর পীড়নের ভয় উপেক্ষা করিয়া একেবারে জমীদারের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। হরেনবাবু তখন বাসায় ছিলেন, এ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছাইতে একটুও দেরী হয় নাই। হরেনবাবুকে দেখিয়া তাহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি যে তাহাদের কিরূপ নির্য্যাতন করিবেন তাহা তাহারা অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছিল।

স্বপন আসিয়া বারাণ্ডার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহার দেহ তখন কাঁপিতেছিল, পা দুখানা টলিতেছিল।

গোপীনাথ মণ্ডল সাহসে ভর করিয়া ডাকিল—"মা—"

স্বপন শুষ্ক মুখখানা তাহার দিকে ফিরাইল, হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাবটাকে শান্ত করিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে শান্ত করিতে পারিল না; আর্ত্তভাবে ব্যথাভরা কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "কার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ তোমরা অভাগা সন্তান, কে তোমাদের মা? এখানে কেউ তোমাদের মা নেই, যার হৃদয় তোমাদের দুঃখে গলে যাবে, যে তোমাদের এতটুকু উপকারও করতে পারবে। স্বার্থই যে সকলের বড় বাবা, সেই স্বার্থের জন্যে তোমাদের পানে তাকালে আমার চলবে না। তোমাদের পীড়ন করে, লাঞ্ছনা দিয়ে, তোমাদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলে আমার টাকা আগে আদায় করে নেওয়া চাই-ই। ওরে অভাগারা, তোরা ফিরে যা—ফিরে যা, আমার কাছে আর তোরা তোদের দুঃখকথা নিবেদন করতে আসিস্ নে, আমার পানে আর তোরা সজল চোখ মেলে চাসনে। তোরা মনে করিসনে—তোদের বুকের রক্ত খেয়ে আমি বড় সুখী হব। আমি তোদের জমীদার হলেও তোদের চেয়ে বেশী দুঃখ পাচ্ছি—তোদের যা আছে আমার তা নেই। জমীদার বলে নয়—তোদেরই ঘরের দুঃখিনী মেয়ে বলে মনের কোনে আমার একটু স্থান রাখিস। যদি সব হারিয়ে তোদেরই কাছে তোদের মত সামান্য হয়েই আসি, তোদের ঘরের একটী পাশে আমার একটু জায়গা যেন হয়; আমার বুকজোড়া দুঃখে একটু সান্ত্বনা যেন লাভ করতে পারি। তোদের দুঃখে আজ আমি সমবেদনা জানাতে পারলুম না বলে তোরা যেন কৃপণতা করিসনে, মনে করিস্—আমার

সব আমি হারিয়েছি, দয়া-মায়া পর্য্যন্ত হারিয়েছি ; আমার আর কিছু নেই।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ভিতর দিকে চলিয়া গেল।

নিজের কক্ষে বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া, বালিশে মুখখানা লুকাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে সে ডাকিতে লাগিল "বাবা গো, একি দায়িত্বপূর্ণ বোঝা তুমি আমার মাথায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছ ; তোমার চির আদরের স্বপনকে একটু ভার কখনও বইতে দাও নি, আজ এই ভার সে বইবে কি করে ? তোমার বোঝা তুমি নামিয়ে নাও গো, নামিয়ে নাও ; আমায় মুক্ত করে দাও, আমি এ প্রাসাদে থাকতে চাইনে, আমি সম্মানীতা জমীদার হতে চাইনে। আমায় ওই প্রজাদের সমান কর, আমি প্রজা হয়ে নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাব। আমায় দীনা কর, হীনা কর, কাঙাল কর, আমায় ধনীপদে রেখনা, আমি এ চাইনে। আমি যেন সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারি—কেউ যেন আমায় দূর না ভাবতে পারে। নামিয়ে নাও গো, তোমার দেওয়া বোঝা তুমিই নামিয়ে নাও।"

১৬

মনের অশান্তি দূর করিবার মত স্থান স্বপন কোথাও পাইতেছিল না। এখানে বাস করিতে তাহার প্রাণ চাহিতে ছিল না, সে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরেনবাবুকে ডাকিয়া বলিল "কাকা, আমি দিন কতকের জন্যে কলকাতায় যেতে চাই। আপনি এখানে থাকবেন, সব দেখবেন শুনবেন, আমি এখানে থেকে আর কি করব? এখানে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না, মনে হচ্ছে কিছুদিনের জন্যে অন্য কোথাও গেলে আমার মনটা ভাল হয়ে যাবে।"

অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখাইয়া হরেনবাবু বলিলেন "ভাল লাগছে না এখানে থাকতে—তবে তোমার দুদিন অন্য জায়গায় ঘুরে আসাই উচিত। ভাঙ্গা মন ভাঙ্গা স্বাস্থ্যের পরিচয় দেয়। এতদিন মন ভাল ছিল তাই অসুখও করেনি, এবার মন ভাঙ্গলেই অসুখ ধরবে এ জানা কথা। বেশ কথা মা, কিছুদিনের জন্যে তুমি অন্য জায়গাতেই যাও। কলকাতায় যাবে বলছো—সেখানে কেন মা? কলকাতায় গেলে মন ভাল হবে এ অসম্ভব কথা, কেননা সেখানে সেই গোলমাল—নানা তাল। তার চেয়ে বরং দুচার মাস অন্য দেশে বেড়াতে গেলে ভাল হতো, মনটাও ভাল হতো, শরীরটাও সুস্থ হতো। এই কয়দিনে তোমার চেহারা বড় খারাপ হয়ে গেছে, আগে যারা দেখেছে তারা এখন দেখে তোমায় মোটে চিনতে পারবে না। আমি বরং তোমার সঙ্গে যাব এখন, বিকাশ

চৌধুরীকে দিয়ে তোমায় দেখাব, সে যেখানে তোমায় যেতে বলে সেই-খানে তোমায় যেতে হবে।”

স্বপন বলিল “আপনি গেলে এদিকে চলবে কি করে? আপনার যাওয়া হবে না কাকা, আমি গৌরী বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তিনি সব ঠিক করে দেবেন।”

হরেনবাবু গম্ভীর চালে হাসিয়া বলিলেন “তা বললে কি চলে মা, আমি কি তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারি? তোমার বাপ যে তোমায় আমারই হাতে দিয়ে গেছেন, সেকথা তুমি কখনও না কখন ভুলতে পারলেও আমি আমার দেহে প্রাণ থাকতে ভুলব না। আমি তোমায় ভাল করে দেখাব শুনাব তারপর উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক সঙ্গে নিয়ে দেশভ্রমণে পাঠিয়ে দেব। আসল কথা তুমি কিছু ভেবনা মা। যখন আমার ’পরে সব ভার ফেলে দেছ, তখন জেনো তুমি নিরাপদেই আছ। আমি প্রাণপণে সব সামলাবার চেষ্টা করব—যদি নিতান্তই না পারি—সেও ভগবানের হাত বলে ধারণা করে নিতে হবে মা।”

স্বপন তাঁহার কথা শুনিল, কপটভাবে পূর্ণ সে মুখখানা দেখিল। একটা কথাও সে বলিল না, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়া রহিল।

আজ দুই বৎসরের অধিক কাল সে এখানে রহিয়াছে, স্থানটার উপর তাহার মায়া পড়িয়া গিয়াছে। ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া তাহার হৃদয় বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই যে। এখানে থাকিবে সে কি করিয়া, কি আটকাইতে সে পারিবে, কোন অত্যাচার সে দমন করিবে? তাহার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই অথচ প্রজাদের এই হাহাকারধ্বনি নিরন্তর আসিয়া তাহার কাণে বাজিতেছে। হায়রে,

এজগতে ধনী ও দরিদ্র পাশাপাশি বাস করিলেও তাহাদের মধ্যে এ অসমতা কেন? কেন ধনী দরিদ্রের বুক দুই পায়ে দলিয়া যায়, কেন সবাই ধনীর মনোরঞ্জন করে, দরিদ্রের দিকে চাহে না, দরিদ্রের কথা কাণে নেয় না? এই দরিদ্রেরা প্রাণপণে খাটিয়া ধনীর বিলাসের উপকরণ যোগাইয়া চলিতেছে তথাপি ইহারা চির ঘৃণিত, চির লাঞ্ছিত।

ম্যানেজার বাবুর আদেশে স্বপনের যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। শরৎকালী কথাটা শুনিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ মা, তুমি নাকি চলে যাচ্ছো?"

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ মাসীমা, চলে যাচ্ছি।"

শরৎকালী বলিলেন "আবার কবে আসবে মা?

শুষ্ক হাসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বপন বলিল "কি করে বলব মাসীমা, হয় তো নাও আসতে পারি।"

মাসীমা বলিয়া উঠিলেন "ষাট ষাট, অমন কথা মুখেও আনতে নেই মা; আসবে না তো কি? তোমার বাড়ী তোমার ঘর দোর, তোমার ঐশ্বর্য্যিপাট, তুমি আসবেনা বললেই কি চলে বাছা?"

স্বপন মলিন হাসিল। মাসীমা জানেন না তাহার সবই যাইতে বসিয়াছে, আজ যাহা তাহার আছে—কাল তাহা অন্যের হইবে। পিতার কোনকালের দেনার জন্য, এখনকার বাকি খাজনার জন্য তাহার সব সম্পত্তি আজ নীলামে উঠিবার জন্য সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে; দুদিনের মধ্যে সব যাইবে। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মাসীমা, তুমি এখনও কিছুই জানো না, বলার দরকার হয়নি বলেই তোমায় কিছু বলি নি। আমার যা কিছু এখনও দেখছ সব পাতার মত জলের 'পরে ভাসছে, এখন কেবল একটা ঢেউ আসার অপেক্ষা মাত্র, সেই ঢেউটা এলেই সব অগাধ জলের

নীচে তলিয়ে যাবে। আমি আসব মাসীমা, যদিও সব যায় তাও দুদিনের জন্যে আসব, একবার শেষ এদেশটা—এই বাড়ীটা দেখে যাব।”

মাসীমা জামাতা রাধানাথের মুখে সবই শুনে ছিলেন, ভিতরে ভিতরে প্রাণটা তাঁহার শুকাইয়া উঠিতেছিল। স্বপনের কথা শুনিয়া তাঁহার চোখে খানিকটা জল আসিয়া দাঁড়াইল, এই অশ্রুজল শুধু যে স্বপনের জন্যই তাহা নহে, নিজের জন্যও বটে। স্বপনের যদি সব যায় এ বাড়ীও যাইবে, তিনি এতগুলি পোষ্য লইয়া যাইবেন কোথায়, এমন সুখে নিশ্চিন্তভাবে নিরুদ্বেগে দিন কাটিবে কি?

স্বপন ঠাকুরঘরে প্রণাম করিতে গেল। দরজা বন্ধ করিয়া সে গৃহতলে লুটাইয়া পড়িল, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—ঠাকুর, এ কাহার পাপে?

যাহারই পাপে হোক না সে মনে করিতেছিল তাহারই পাপে এতগুলি প্রাণী কষ্ট পাইতেছে। দেবতা শুধু তাহাকেই কষ্ট দিতেছেন না, যাহারা বড় দীন—যাহাদের দেখিতে কেহ নাই তাহাদেরও কষ্ট দিতেছেন। রাজার পাপে প্রজার কষ্ট বলিয়া আমাদের দেশে যে একটা চলিত কথা আছে তাহা যথার্থই সত্য কথা।

ওগো দেবতা, তুমি পাষাণে গঠিত হইলেও ওই পাষাণের অন্তরালে নাকি প্রাণ আছে? সত্যই কি আছে না সেটাও প্রবাদকথা মাত্র? অন্তর বলিয়া যদি কোনও পদার্থ তোমার থাকে—ওগো অন্তর্য্যামী, এই দুঃখীদের অন্তরের ব্যথা তবে অনুভব কর, ইহাদের শান্তি দাও—শাস্তি দিয়ো না।

সে চুপ করিয়া খানিক পড়িয়া রহিল, ধীরে ধীরে মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি শুনিতে পাইতেছেন বই কি। সে নারী, জমীদারী চালনার

অভিজ্ঞতা তাহার নাই, কতকগুলি অর্থভূক নীচমনা কর্ম্মচারীর উপর তাহার জমীদারী নির্ভর করিতেছে, এতগুলি প্রাণীর ভালমন্দ নির্ভর করিতেছে। সে নিজে কোনও কথা শুনিতে পাইতেছে না, তাহার কানে কোন কথা আসিবার এতটুকু ছিদ্র এই দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীরা রাখে নাই। ইহাদের—তথা জমীদারের অত্যাচারে প্রজাদের বুকের সকরুণ প্রার্থনা মূর্ত্ত হইয়া ভগবানের চরণোপ্রান্তে গিয়া পৌছিয়াছে, অটল সিংহাসন বাঁধিয়াছে। তিনি যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহার হাতে এ জমীদারী অর্পণ করিবেন।

"তাই হোক ঠাকুর, তাই হোক, তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। এ অযোগ্যা অক্ষমা নারী যোগ্যা হতে পারলে না, যোগ্য লোকের হাতে প্রজাদের দাও। একজনের ভুলের পরে এতগুলি প্রাণ রেখো না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

বাহিরে বারাণ্ডা হইতে হরেনবাবু হাঁকিলেন "ট্রেণের সময় হয়ে এল স্বপন, আর দেরী কর না।"

স্বপন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার স্বভাব আরক্ত চোখ দুটি তখন একটু বেশী রকমই লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখের পাতায় জল তখনও চক চক করিতেছে।

হরেনবাবু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া একবার তাহার পানে চাহিলেন, বলিলেন "আর দেরী করলে ট্রেণ পাওয়া যাবে না। কুড়ি মিনিট মাত্র দেরী আছে, এই পথখানি যেতে—যেতে—"

"চলুন—আমার হয়ে গেছে—" বলিয়া স্বপন অগ্রসর হইল।

"কাকা, আমার ঠাকুর বাড়ীর বন্দোবস্ত যেন ঠিক থাকে, অতিথি ভিখারী এলে ফিরাবেন না; অন্ততঃ যতদিন আমার নামে জমীদারী

চলবে, ততদিন যেন এই নিয়মটা চলে তারপর দেবতার যা ইচ্ছা হবে তাই হবে। বাড়ীর ভেতর মাসীমাদের খরচ যেন কমারেন না, মাসীমা কাল আমায় বিশেষ করে বলে দেছেন। যতক্ষণ আমার সম্পর্কে এতটুকু মাটীও থাকবে ততক্ষণ আমার এ সব ভার নিতেই হবে। আপনি অন্য সব বাজে খরচ কমাবেন বলেছেন কমান, কিন্তু বিশেষ অনুরোধ আমার— এই দুটো খরচ যেমন আছে তেমনিই থাকে, এতে যেন হাত না দেন।

হরেনবাবু বলিলেন "তাই থাক্‌বো মা। তুমি দুই মাস ঘুরে এসো, দেখতে পাবে সব ঠিক আছে কিনা।"

মলিন হাসিয়া স্বপন বলিল "আস্‌তে পাব তো? যদি এর মধ্যে সব যায় তা হলে আর তো আসতে পাব না।"

হরেনবাবু জোর করিয়া বলিলেন "ও সব মিথ্যে কল্পনা কর না স্বপন, ওতে আরও মনে কষ্ট হয়। এই বলছ তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু যে রকম ভেঙ্গে পড়েছো আগেই—তাতে বিপদের একটা ধাক্কা যে সইতে পারবে সে আশা আমার হয় না।"

স্বপন আর কথা কহিল না, নীরবে পাল্কীতে উঠিল, নীরবে ষ্টেশনে থামিল।

কল্যাণী কাল বেগারঠেলা একবার দেখা করিয়া গিয়াছেন মৃন্ময়ী আসে নাই। তাহাকে দেখবার জন্য স্বপনের একবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বপনের দৃষ্টান্ত লইয়াই মেয়েটী দিন দিব অধঃপাতের পথে যাইতেছে বলিয়া মা তাহাকে স্বপনের সংস্পর্শে আসিতে দিতেন না। স্বপন ইহা বুঝিয়াছিল, সে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল, একটু হাসিয়াছিল।

হরেনবাবুর ব্যস্ততা অস্বাভাবিক; একখানি কামরা রিজার্ভ করার

দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল, স্বপন আগেই নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল "দরকার কি কাকা, মিথ্যে অতগুলো টাকা জলে ফেলে দেওয়া হবে মাত্র, কামরা রিজার্ভ করতে হবে না।"

হরেনবাবু সাহস করিয়া আর রিজার্ভ কামরা করিতে পারেন নাই। এখন আসিয়া বলিলেন "মা, কামরা তো রিজার্ভ করিতে দিলে না, তবে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট একখানা করে আনি ?"

স্বপন মাথা নাড়িয়া বলিল "আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে স্বতন্ত্র হয়ে যেতে পারব না কাকা, আমি থার্ড ক্লাসে যাব।"

"থার্ড ক্লাস—" হরেনবাবুর মুখখানা নিমেষে পাঙাস হইয়া গেল। স্বপন জীবনে কখনও থার্ড ক্লাসে উঠে নাই, আজ সে সেই থার্ড ক্লাসে যাইতে চায়, আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পর মুহূর্ত্তে তিনি বলিয়া উঠিলেন "তাও কি হয় মা, থার্ড ক্লাসে ওঠা কি তোমার সাজে ? ও কামরায় ওঠে সব ছোট লোকের মেয়েরা, ভদ্র লোকের মেয়েরা কেউ ও কামরায় যায় না। থার্ড ক্লাসে ভয়ানক ভিড়, অসহ্য গরম—তুমি একটীবার উঠলে দেখতে পাবে দম বন্ধ হয়ে আসবে।"

স্বপন গম্ভীর মুখে বলিল "আমি থার্ড ক্লাসেই যাব কাকা, অন্য কোনও কামরায় যাব না। যাদের ছোট লোকের মেয়ে বলে উল্লেখ করলেন, তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য কি ? ওই মেয়েরা যে কষ্ট সহ্য করতে পারে আমিই বা তা সহ্য করতে কেন পারব না ? চিরকাল যে আমি ওদের সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে আলাদা ধনীর চালে যাওয়া-আসা করতে পারব এমন কোনও কথা নেই। ভবিষ্যতে যে ওই কামরাতেই ওই মেয়েদের পাশে বসে আমাকেও যাওয়া-আসা করতে হবে। ওদের

চেয়ে আমার উচ্চতা এক বিন্দু নেই কাকা, ভগবান ওদের সঙ্গে আমায় এক করে দিয়েছেন।”

হরেনবাবু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন “যা খুসি তোমার তাই কর মা ; ওই ঠেসাঠেসির মধ্যে বসে যদি যেতে ইচ্ছা কর স্বচ্ছন্দে যেতে পার, আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। আমি তোমার আদেশের চাকর মাত্র, যা বল্‌বে বাধ্য হয়ে তা করতেই হবে। তোমার ইচ্ছামত টিকিট করে নিয়ে আসছি।”

ট্রেণ আসিয়া পড়িলে, স্বপন হরেনবাবুর সাহায্য না লইয়া নিজেই থার্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গীরা ইণ্টারে উঠিল।

সেদিন মেয়েদের কামরায় ভীড়টা খুব বেশী রকমই হইয়াছিল, অনেকে স্থানাভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বপন একবার চারিদিকটা দেখিয়া লইল, স্থানাভাবে সেও দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে রৌদ্র যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ট্রেণের মধ্যে গরমও তত বাড়িয়া উঠিল। স্বপনের ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতে লাগিল, তাহার মনে হইল হরেনবাবু তাহার ভালর জন্যই এ কামরায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিলেই ভাল হইত।

পরক্ষণে তাহার মুখে হাসি ফুটিল,—এই-তো তাহার স্থান। আর দু’দিন বাদে তাহাকে এখানেই আসিতে হইবে, ইহাদের পাশে স্থান না পাইলে তাহাকে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। এই দু’দিনের জন্য তফাতে থাকিয়া তাহার লাভ কি, না হয় দু’দিন আগাইয়াও যাওয়া হইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা দুইখানা ধরিয়া উঠিল ; তাহার বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া একটী মেয়ে দয়া করিয়া একটা পাশ একটু ছাড়িয়া

দিয়া সদয়ভাবে বলিল, "এখানে একটু বসুন না, আপনার মত একটু জায়গা হবে এখন।"

তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রৌঢ়াটী কাংসকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "সরে বস নিলি, ট্রেণের মধ্যে অত দয়া দেখাতে হবে না। এইটুকু তো জায়গা, এর মধ্যে আর একটা মানুষকে জায়গা দিয়ে নিজেরা মরি! ঘুমন্ত ছেলেটার ঘাড়ে এসে পড়ছিস্ যে, সরে বস বাছা।

এই প্রথম সাধারণ হিন্দুগৃহের মেয়েদের সঙ্গে স্বপনের পরিচয়। তাহার ভ্রূ দুইটী মুহূর্ত্তের তরে কুঞ্চিত হইয়া তখনি সরল হইয়া গেল।

মেয়েরা সকলেই তাহার পানে চাহিয়াছিলেন, তাহার অনুপমেয় সৌন্দর্য্য সকলকেই দগ্ধ করিতেছিল। ঈষৎ বঙ্কিম সিঁথিতে তাহার সিন্দূর ছিল না, তাহার বেশ স্বাভাবিক হইলেও তাহার মধ্যে একটু পার্থক্য ছিল। পায়ে তাহার জুতা ছিল না, হরেনবাবু ইহার জন্য অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সে চিরকালের জন্য জুতা ত্যাগ করিয়াছে, আর পায় দিবে না।

নীলা মেয়েটী সকলের মুখপাত্রস্বরূপ কুণ্ঠা সঙ্কোচ দূর করিয়া চটপট জিজ্ঞাসা করিল "আপনি বুঝি বিধবা?"

স্বপন হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল "কিসে জান্‌লে?" নীলা একটু থতমত খাইয়া গেল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল "এরা সব বলাবলি করছেন, আপনার সিঁথেয় সিঁদুর নেই কিনা, তাই—"

স্বপন শান্তমুখে বলিল "আমার বিয়ে হয় নি।"

মেয়েদের মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনা গেল; "ওঃ, খৃশ্চেন।" মেয়েরা কাপড়-চোপড় একটু গুটাইয়া লইলেন, ছোঁয়াটা বিশেষ

ভাবে না, হওয়াই ভাল—হাজার হোক খিশ্চেন তো, ছুঁইলেই জাত চলিয়া যায়, স্নান না করিলে শুচি থাকে না।

বৈকালে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল, হরেনবাবু ত্রস্তভাবে নামিয়া আসিলেন। জানালাপথে কামরার ভিতরকার দৃশ্যটা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, "ইস্, কি ভয়ানক, স্বপন, এ কামরা হতে নেমে এস, বেশীক্ষণ থাকলে মারা পড়বে।"

স্বপন কোমল স্বরে বলিল "কিছু হবে না কাকা, আমায় যতটা কোমল ভাবেন ততটা আমি নই। এঁরা সবাই তো এই কষ্টটা সমান ভাবে ভোগ করছেন, আমিই বা পারবো না কেন বলুন।"

দৃঢ় স্বরে হরেনবাবু বলিলেন "আমি বল্‌ছি পারবে না, তুমি নেমে এসো।"

স্বপন বলিল "বেশ পারব কাকা। আপনি আর এই রোদে দাঁড়াবেন না, আপনার কামরায় যান। আর ঘণ্টা দুই সময় বই তো নয়, আমি এমনি করে বেশ যেতে পারব। ট্রেণ চললে তো বেশ বাতাস আসবে এখন, এত গরম তখন বোধ হবে না।"

অসন্তুষ্ট চিত্তে হরেনবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সোডা লেমনেড কিছু চাই কি?"

স্বপন বলিল "না, দরকার হলে আপনাকে জানাব।"

এই একই ভাবে দাঁড়াইয়া স্বপন শিয়ালদহে আসিয়া পৌছাইল। পা দু'খানা তখন অবশ হইয়া আসিয়াছিল, কোনও ক্রমে সে ট্রেণ হইতে নামিয়া গাড়ীতে উঠিল।

প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে পিতার মৃত্যুর পরে সে যে বাড়ী ত্যাগ

করিয়া গিয়াছিল সেই বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। পুরাতন কর্ম্মচারিগণ সাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল।

আহারাদি সমাপ্তে হরেনবাবু প্রস্তাব করিলেন, অদ্য উঠিলে স্বপনকে ডাক্তার দেখানো দরকার, তাহার পর তাহাকে পুরীতে সমুদ্রের ধারে কিছুদিন থাকিতে হইবে ; যতদিন না তাহার শরীর পূর্ব্বেকার মত সুস্থ সবল না হয়।

স্বপন বলিল "ডাক্তার কাকাকে ডাকার চেয়ে আমিই না হয় তাঁর বাড়ীতে একবার যেতুম কাকা, কাকীমার সঙ্গে আর তাঁর মেয়ে জ্যোতির সঙ্গে একবার দেখাটাও হতে পারত। অ্যাটর্ণি রজনীবাবুর কাছেও দরকার ছিল—"

"আমি এখনি তাঁকে পত্র লিখে দিচ্ছি আসবার জন্যে। ডাক্তার গুপ্তের বাড়ী যখন তখন তোমার যাওয়া আমি তত পছন্দ করি নে মা, এখন তুমি পদস্থ জমীদার, এ রকম ভাবে যেখানে সেখানে গেলে তোমার মান প্রতিপত্তি থাকবে না। বলতে পার তুমি ছোট বেলা হতে তাঁর বাড়ীতে তাঁর স্নেহেই লালিত-পালিত হয়েছ, অবশ্য এ কথা বলে জোর করলে আমি নাচার। তবে আমি পত্র লিখে তাঁকে এখানে আনিয়ে দিচ্ছি, তোমার যা কথাবার্ত্তা থাকে আমাকে গোপন করে তাঁকে জানাবার তা তুমি জানাতে পার, আমি না হয় সে সময়টা বাইরেই থাকব।"

স্বপন অত্যন্ত কুণ্ঠিতা হইয়া বলিল "না কাকা, এমন কোনও কথা নেই যা আপনাকে গোপন করে তাঁকে বল্‌ব। আমার যা কথা আছে, তা সকলের সামনেই বলতে পারি, লুকানর কোনও দরকার নেই।"

হরেনবাবু খুসি হইয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দুখানি পত্র লিখিয়া তখনই

সরকারের হাতে দিয়া একখানা ডাক্তার গুপ্তকে আর একখানি অ্যাটর্নি রজনীবাবুকে পাঠাইয়া দিলেন।

বৈকালে ডাক্তার বিকাশ গুপ্ত যখন আসিলেন, স্বপন তখন ছাদে বেড়াইতেছিল। ডাক্তার গুপ্তের এ বাড়ীতে অবারিত দ্বার ছিল। স্বপনকে তিনি যথার্থই বড় স্নেহ করিতেন। স্বপনের পিতা তাঁহারই নিকটে স্বপনকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতা ত্যাগ করিতেন। ডাক্তার গুপ্তের কন্যা জ্যোৎস্না স্বপনের স্কুলজীবনে সঙ্গলাভিনী ছিল। স্বপন তাহার পর কলেজে প্রবেশ করিয়াছিল। ডাক্তার গুপ্ত জ্যোৎস্না ম্যাট্রিক পাশ করার পরই বিবাহ দিয়াছিলেন।

স্বপনের জন্য ডাক্তার গুপ্তের উদ্বেগের সীমা ছিল না। অনন্ত বসুর মুখে কিছুকাল আগে তিনি শুনিতে পান, জানকীনাথ তাঁহার কাছে যে দেনা করিয়াছিলেন সুদে আসলে ডবল হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার গুপ্ত জানিতেন, জানকীনাথ প্রত্যেক বৎসর সুদের টাকা মিটাইয়া দিতেন। লোকটা সে কথা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিল। এই দেনার ব্যাপারে যাঁহারা সাক্ষী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানাইলেন—সুদ দেওয়ার কথা তাঁহারা জানেন না। এমন কি হরেনবাবু পর্যন্ত বলিলেন সুদ দেওয়া হয় নাই। তখন ডাক্তার গুপ্ত অনুপায় হইয়া পড়িলেন। এমনই সময়ে শুনিলেন, গভর্ণমেণ্টকেও কয়েক বৎসর খাজনা দেওয়া হয় নাই, চারিদিকে দেনা করিয়া গিয়াছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গভর্ণ-মেণ্টের খাজনা না দিতে পারিলে স্বপনের জমিদারী সরকারে যাইবে।

ডাক্তার গুপ্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি কয়েক-বার স্বপনের কাছে যাওয়া আসা করিলেন, সকলের মুখে সব শুনিলেন, অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুই হইল না। আজ স্বপন হঠাৎ কেন

চলিয়া আসিল, তাহার কারণ তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। হরেনবাবুর পত্রখানা পাইয়াই তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন।

দাসীর মুখে শুনিতে পাইলেন, স্বপন ছাদে বেড়াইতেছে। দাসী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে চেয়ারে বসাইয়া বলিল "একটু বসুন, আমি এখনি তাঁকে ডেকে আনছি।"

তিনি বলিলেন "থাক, তাকে ডাকতে হবে না, আমিই ছাদে যাচ্ছি।"

স্বপন রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অস্তগামী সূর্য্যের পানে চাহিয়াছিল। ডাক্তার গুপ্তের জুতার শব্দে সে চমকাইয়া মুখ ফিরাইল।

"আপনি এসেছেন ? আজই যে আসবেন, আমি তা ভাবি নি। কাল এক সময়ে এলেই হতো—" বলিতে বলিতে সে নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

ডাক্তার গুপ্ত তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বড় রোগা হয়ে গেছ মা, হঠাৎ দেখলে তোমায় এখন চেনা যায় না। অসুখ করেছে কি ?"

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল "অসুখ মানে আপনারা বলবেন জ্বর মাথাধরা প্রভৃতি, সে সব আমার কিছুই নয় কাকা। বাবা আমার মাথায় যে ভার চাপিয়ে গেছেন সেই ভারে মাথা ভেঙ্গে পড়েছে। ঘরে চলুন বসবেন, এখানে বসবার জায়গা নেই।"

নিজের কক্ষে আসিয়া তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া স্বপন দাসীকে ডাকিয়া আদেশ করিল, হরেনবাবু আসিলেই যেন তাহাকে আগে সংবাদ দেওয়া হয়।

সামনাসামনি একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল। শুষ্ক মুখে বলিল "আমার অসুখ কিছুই নয় ডাক্তার-কাকা। যা কাণ্ড হচ্ছে তা তো কতক জানেন, সেই জন্যেই মনে ও দেহে শান্তি নেই।"

ডাক্তার গুপ্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ব্যাপারটা কতক আমি আগেই অনুভবে বুঝতে পেরেছিলুম মা, তবে সেটা যে এত শীঘ্র এ রকম ভাবে বিপদে পরিণত হবে তা আমি ভাবি নি। আমি হরেনবাবু আর রজনীবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে এখানে আসার কয়েক দিন পরে একখানা কাগজে পড়লুম, জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি দেনার দায়ে যায়-যায় হয়েছে। খবরটা পড়েই আমি আবার ছুটলুম রজনীবাবুর কাছে। তিনি আমায় যা বুঝালেন তাতে জানলুম আর কোন আশাই নেই। আমি যে কি রকম মর্ম্মাহত হয়েছি মা, তা তোমায় কি জানাব।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার বাপ বোধ হয় তোমায় দেনার কথা কিছুই জানান নি।"

স্বপন মাথা নাড়িয়া বলিল "মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলবার চেষ্টা করে-ছিলেন, আপনিও তখন তাঁর পাশে ছিলেন—দেখেছিলেন তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।"

তাহার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "প্রথমটায় বলেন নি। ভেবেছিলেন ভাল হয়ে উঠবেন, তোমায় না ভাবিয়েই নিজেই আস্তে আস্তে শোধ করে দেবেন। তাঁর কলঙ্ক কাহিনী তোমার কানে না যায় সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল। জগৎ তাঁকে যা ভাবে ভাবুক, তোমার চোখে তিনি কলঙ্কিত হতে চান নি। কোন বাপেই চায়না সন্তানের

চোখে কলঙ্কিত হয়ে প্রকাশ হতে। সন্তান হলে অনেক পিশাচ প্রকৃতি লোকেও নিজেকে সামলে নিতে হয়। তিনি ভেবেছিলেন এ কথা কখনই তোমার কানে যাবে না—যেতও না—যদি তিনি আর পাঁচ বছরও বেঁচে থাকতে পারতেন, তবে সব দেনা নিজেই তিনি শোধ দিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু বিধাতার বিধান অন্য রকম মা, তাই তোমার বাপের আশা পূর্ণ হল না। তিনি নিতান্ত অকালে মারা গেলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র একুশ বছর তখন তুমি জন্মেছিলে ; তোমার কুড়ি বছর বয়সে—তাঁর বয়স যখন মাত্র একচল্লিশ বছর তখন তিনি মারা গেলেন, অল্প বয়স বলতে হবে বই কি ?”

পিতার কলঙ্ক, একদিন এই কথাটা স্বপন হরেনবাবুর মুখেও শুনিয়াছিল। সে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল “একদিন আমি এ কথা একটুখানি শুনেছিলাম, কিন্তু কি কলঙ্ক তা আমি জানতে চাই নি ডাক্তার-কাকা। আজিও জানতে চাই নে, বাপের কলঙ্ক শোনার চেয়ে—”

বাধা দিয়া ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন “না শুনলে তো চলবে না মা, আজ হোক, কাল হোক তোমায় এ কথা শুনতেই হবে।”

একটু উত্তেজিত ভাবে স্বপন বলিল “শুনেই বা কি লাভ হবে ?”

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন “বুঝতে পারবে তোমার বাপ কি পরিমাণে দোষী ছিলেন।”

“না, বাবা আমার দেবতা ছিলেন, ডাক্তার-কাকা, আমার বাবাকে আপনারা অমন করে ঘৃণিতভাবে আমার চোখের সামনে আঁকবেন না। আমার বাপের এতটুকু খুঁত আমার অসহ্য ; তিনি আমার চোখে নির্দোষ, তিনি আমার একমাত্র দেবতা।”

স্বপন আর্ত্তভাবে ডাক্তার গুপ্তের পানে চাহিল।

শান্তকণ্ঠে ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "আমি নিজের মুখে তোমায় কোন কথা বলতে চাই নে স্বপন। তোমার বাপ আমায় তাঁর লেখা কয়েকটী কথা দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন যদি সে দিন উপস্থিত হয় তবে এখানা স্বপনকে দিয়ো; নচেৎ দিয়ো না—আগুনে পুড়িয়ে ফেলো। আমি সেখানা আমার বুকের একখানা পাঁজরের মত সন্তর্পণে নিয়ে বেড়াচ্ছি, এইবার দেওয়ার সময় হয়েছে তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।"

ডাক্তার গুপ্ত তাঁহার জামার ভিতর দিককার পকেট হইতে একখানা ছোট ডায়েরী বুক বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। পরিষ্কার কণ্ঠে বলিলেন "এই দেখ মা, এই সেই ডায়ারী বুক, তুমি এসেছ শুনে আমি এখানা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আর তো গোপন রাখার কোনও দরকার নেই মা। তোমার বাপের আদেশ আমি পালন করলুম, এখন তুমি তোমার কাজ কর। এখানা পড়লে তুমি সব বুঝতে পারবে, তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, এতে তাঁর সব পরিচয় তুমি পাবে। তুলে নাও মা, এখানা এখন রেখে দাও, অবসর কালে পড়ো।"

কম্পিত হস্তে স্বপন সেখানা তুলিয়া লইল, ডেস্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল "রাত্রে পড়ব, এখন নয়। আচ্ছা ডাক্তার-কাকা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাবার কলঙ্কের কথা কে কে জানে—আপনি ছাড়া?"

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "আর জানেন অ্যাটর্ণি রজনীবাবু, আর তোমার ম্যানেজার হরেনবাবু। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, আমরা সকলেই তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, কেউ এ কথা প্রকাশ করব না। তিনি যে দিন মারা যান তার আগের দিন রাত্রে আমাদের তিনজনকেই

তাঁর ঘরে ডাকেন, তোমায় আধ ঘণ্টার জন্যে ঘর ছেড়ে যেতে বলেন, সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। তিনি সেদিন এই প্রতিজ্ঞার কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা তাঁর দেহ ছুঁয়ে আবার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। হরেনবাবু আর সব কথা প্রকাশ করলেও এ কথা যে প্রকাশ করতে পারবেন না তা আমি বেশ বলে দিচ্ছি, সে বিষয়ে তোমার ভাবনা নেই। দেখি মা, তোমার হাতখানা—"

স্বপন হাত বাড়াইয়া দিল—"কি হবে হাত দেখে কাকা, আমার তো কোনও অসুখ হয় নি ?"

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "অসুখ হয় নি, কিন্তু ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ মা, তোমার কিছু দিনের জন্য অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। হরেন-বাবু বলেছিলেন তুমি পুরীতে যাবে, সেখানে সমুদ্রের ধারে কিছুকাল থাকবে ! তোমার স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা খুব ভাল। কিন্তু এদিকে দেখ্‌তে গেলে এখন তোমার দেশ ছেড়ে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। সেখানে না থাকতে পার এখানে থাকলেও অনেক উপকার পাবে, সকল অবস্থা জানতে পারবে, সকলের পরামর্শ পেতে পারবে, কিন্তু দূরে গেলে তোমার যেটুকু সম্পত্তি রক্ষার আশা আছে তাও থাকবে না, হরেনবাবু নিশ্চিন্ত মনে যা খুসি তাই করতে পারবেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, স্বপন বলিল "আমিও তাই বলছি ডাক্তার-কাকা, আমার সর্ব্বনাশ চারিদিক দিয়েই হতে বসেছে। তবু আমি তার জন্যে বেশী ভাবছি নে—এই ভেবে বড় দুঃখ হচ্ছে, দুটি বছর জমিদারী পেলুম, অবাধ কর্ত্তৃত্ব পেলুম, কাজের মত একটা কাজ আমি করতে পারলুম না। অনেক সাধ ছিল ডাক্তার-কাকা, আমার একটা সাধও পূর্ণ হল না।"

সান্ত্বনার সুরে ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "সে দুঃখ করে কি করবে মা ? আশা অনেক করা যায়, কার কয়টা আশা পূর্ণ হয় মা ? ভগবানের যদি ইচ্ছা থাকত তিনি এরই মধ্যে অনেক কাজ তোমায় দিয়ে করিয়ে নিতে পারতেন, সে ইচ্ছা তাঁর নাই, তাইতেই তুমি কোন কাজ করতে পারলে না। মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র। যন্ত্র মাত্র, যিনি যন্ত্রী তিনি না চালালে মানুষ চলবে কি করে ? এর জন্যে তোমার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়, তিনি যখন ইচ্ছুক নন্, তখন তার জন্য তোমার দুঃখ করা উচিত নয়। নিজেকে নিঃশেষ করে তাঁর পায় ঢেলে দাও, নিজেকে উৎসর্গ করে দাও, আশা অপূর্ণ থাকার ব্যথা তোমার বুকে বিঁধতে পারবে না।

স্বপন নত মস্তকে বসিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া দুটি ফোঁটা জল শুধু নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

১৭

কম্পিত হস্তে স্বপন ডায়ারী বুকখানা বাহির করিয়া আনিয়া একখানা কৌচে বসিয়া পড়িল।

দারুণ উদ্বেগে ভয়ে দুঃখে তাহার বুকের ভিতরটা যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। কে জানে এই খাতাখানির পাতায় পাতায় কি লেখা অঙ্কিত,—যাহা হয় তো নিমেষে তাহার দেবতাসম পিতাকে পিশাচ মূর্ত্তিতেই পরিণত করিয়া দিবে।

ঘটনাটী যে নারীজড়িত তাহা সে একটুখানি মাত্র শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। হায়রে, সে তখন যাহা জোর করিয়াই শুনিতে চায় নাই, আজ

তাহাই সাজিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এ ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত আর কি হইতে পারে।

খাতাখানি খুলিবার আগে সেখানা সে ললাটে স্পর্শ করাইল— নারায়ণ, বল দিয়ো, শক্তি দিয়ো, সে যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে। পিতার কলঙ্ক যেন তাহার মনে ছাপ দিতে না পারে, যে কোন কলঙ্কই হোক সে যেন তাহা ধুইয়া দিতে পারে। দেবতার শুভ্র দ্যুতির মত পিতার দ্যুতি যেন কালো কলঙ্কের মাঝে উজ্জল হইয়াই ফুটিয়া উঠে।

এখানা ডায়ারী নয়, স্বপনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার অতীত জীবনের কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"মা স্বপন,

আজ তোকে জানাইবার জন্যই আমার জীবনের অত্যন্ত দরকারী অথচ গোপনীয় কয়েকটী কথা লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি, পড়িয়া তোর পিতাকে তুই যথার্থরূপে চিনিতে পারিবি।

মনে পড়ে আজ এই দিনের শেষে জীবন-সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার বাল্যজীবনের কথা। সারাদিন খেলিয়া কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি, একবারও পিছন ফিরিয়া চাই নাই, কেননা সম্মুখে প্রকৃতির ভাণ্ডারে তখনও প্রচুর আলো জমা ছিল। এখন ধীরে ধীরে দিন চলিয়া গেল। আমি দিনের সংলগ্ন থাকিতে পারিলাম না, কেননা আমি জীব, সে সময় আমার সম্মুখে দেখিতেছি সন্ধ্যা—তাহার পর নিকষ কালো নিবিড় আঁধার, এখন একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলাম, সুন্দর উজ্জল প্রভাত কত পিছনে পড়িয়া আছে। হায়রে, এই এত বড় দিনমানটা আমি কাটাইলাম কি করিয়া? আমার পিছনে চলিয়া

আসার পথে কি দাগ রাখিয়া আসিলাম,—নিন্দার—কলঙ্কের, না প্রশংসার—গৌরবের ?

মা আমার, তোরই মত তখন শুধু খেলিয়া বেড়াইয়াছিলাম, সংসারের কোন জ্ঞান তখন আমার ছিল না, ভাবিতাম এমনি আনন্দের মধ্য দিয়াই জীবনটা আমার কাটিয়া যাইবে, কখনই দুঃখ আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এ ধারণা অন্যায় অসঙ্গত নহে। বাল্যকালে কে মনে করিতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটিবে, কে তাহা দেখিতে চায়। শুধু আশার আলোকই জ্বলে মাত্র, সেই আলো অন্ধকারকেও উজ্জ্বলতা দান করে,—আমার অন্ধকারও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি মা আমার, ভাবিতেছি তোর জন্য কি রাখিয়া যাইব। পারিব কি,—পিতার যোগ্য কাজ আমার দ্বারা হইবে কি ?

যাক, এ কথায় এখন দরকার নাই, যাহা বলিতেছি তাহাই বলিয়া যাই। কারণ, তাহা এখন আমি পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি, সে দিকে চাহিয়া দেখিতে পাই কিন্তু সম্মুখে চাহিয়া কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল নিকষ কালো আঁধার ভরা মাত্র।

পিতার একমাত্র সন্তান আমি, আমায় লেখাপড়া শিখাইবার জন্য তিনি বড় কম চেষ্টা করেন নাই। জলের মত অর্থব্যয় হইয়াছে, কিন্তু আমার লেখাপড়া তাঁহার আশানুরূপ হয় নাই, আমি এক আই-এ ক্ল্যাসেই দুবার ফেল করিয়া অবশেষে পড়া ছাড়িয়া দিয়া গৃহে আসিয়া বসিলাম।

গৃহে নববিবাহিতা তরুণী স্ত্রী ; মা আমার, আজ লজ্জা করিব না।

যেহেতু যখন আমার এ লেখা তুমি পাইবে আমি তখন থাকিব না, আর এক দেশে চলিয়া যাইব। আমার জীবনকালে আমার ঘৃণিত জীবন-কাহিনী আমার সন্তানকে শুনিতে দিব না। জানি না পাপিষ্ঠ পিতার ঘৃণিত পাপ-কাহিনী শুনিয়া তাহার অন্তরের ভাব কিরূপ হইবে! হয় তো সে তাহার সারা অন্তর দিয়া ঘৃণাই করিবে, তাহার সে ঘৃণা বাঁচিয়া থাকিয়া আমি সহিতে পারিব না। আমার মরণের পরে সে জানিতে পারিবে, আমিও লিখিয়া রাখিয়া যাইব, সে তখন বিচার করিয়া লইবে পিতাকে সে ভক্তি করিবে—না ঘৃণা করিবে।

সুরমাকে আমি বড় ভালবাসিতাম, জানিনা তাহাকে যথার্থ প্রেম বলে কিনা। একজন স্বামী তাহার স্ত্রীকে যতটা ভালবাসে আমি তাহার চেয়ে কম ভালবাসি নাই। সেও আমায় ভালবাসিত—স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে। তাহার এই ভালবাসা তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। আত্মপ্রত্যয় তাহার ছিল না, আদর্শ হিন্দুস্ত্রীর মতই সে তাহার স্বামীর উপর তাহার জীবনের সব ভার ফেলিয়া দিয়াছিল। আমি যাহা বলিতাম যাহা করিতাম, সবই সত্য বলিয়া অসঙ্কোচে সে জানিয়া লইত। আমি মন্দ কথা বলিলে—মন্দ কাজ করিলেও সে তাহা মন্দ বলিতে পারিত না, কেননা আমি তাহার স্বামী, হিন্দুনারীর স্বামীই সর্ব্বস্ব।

আমি প্রায়ই দেশে থাকিতাম না, পল্লীগ্রাম আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হইত। পিতা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া আমায় দেশেই থাকিতে হইত; কেননা তখন আমি উপায়হীন, অর্থের জন্য পিতার কাছে প্রার্থী হইতে হইত।

কলিকাতায় যখন আসিতাম, তখন আমার বন্ধু—পাটনার অনন্ত

বন্ধু আমায় হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়া টাকা ধার দিতেন। তিনি জানিতেন, একদিন পিতার বিপুল সম্পত্তি আমার হইবে, তখন তিনি এই সব টাকা তো পাইবেনই উপরন্তু সুদও প্রচুর পাইবেন। এমনই করিয়া তাঁহার নিকট আমার সুদে আসলে অনেক টাকা জমিয়া যাইতে লাগিল।

পিতা যখন মারা যান, তখন আমি বাইশ বৎসরের তরুণ যুবক মাত্র, তুমি তখন এক বৎসরের বালিকা। আমি সুরমাকে কলিকাতায় আনিলাম। ইচ্ছা ছিল তাহাকে আধুনিক মতে শিক্ষা দিয়া তাহার জড়ত্ব ঘুচাইব, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিব। সে অসঙ্কোচে আমার সহিত বেড়াইতে যাইবে, আমার বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করিবে।

কিন্তু কি একজেদি এই স্ত্রীটি ছিল আমার, সে কিছুতেই লেখাপড়া শিখিতে চায় না, কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে চায় না, পিয়ানো হার্ম্মোনিয়ামের কাছে বসিয়া কেবল চোখের জলই ফেলিয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সিঁথীর সিঁন্দুরটা মুছিয়া দিতে পারিলাম না, হাতের লোহাটা খসাইতে পারিলাম না, অথচ এই দুইটা জিনিস আমার দুইচক্ষের বিষ ছিল। সে যতই একগুঁয়েমীভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, আমি ততই তাহার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলাম। যে স্ত্রী স্বামীর উপযুক্তা নয়, উপযুক্তা হইবার চেষ্টাও করে না; সে স্ত্রী যে স্বামীর পরিত্যজ্য আমি তাহাকে স্পষ্ট এই কথা শুনাইয়া দিলাম।

ক্রমেই তাহার সঙ্গ এড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। অন্তঃপুরে যাওয়া আসা কমাইতে কমাইতে একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলাম। সে অনেক

অনুনয় বিনয় করিয়া অনেকবার আমায় ডাকিয়া পাঠাইল। আমি তখন বাহিরে বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আছি, তাহার আহ্বান কানেই লইলাম না। কেননা, তখন তাহাকে আমি জব্দ করিবার চেষ্টাতে ছিলাম।

একদিন মধ্যরাত্রিতে—যখন কোনও সঙ্গী আমার কাছে ছিল না তখন সে আসিয়া আমার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল "তুমি যা বলবে আমি তাই করব, আমায় তুমি এবারকার মত মাপ কর, এমন করে আমায় শাস্তি দিয়ো না।"

তাহার পরদিন হইতে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমটায় তাহার জন্মগত শিক্ষা সংস্কার ত্যাগ করিতে অত্যন্তই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, সে প্রায়ই মলিন হইয়া থাকিত। হায়রে, তখনও যদি আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিত, তখনও যদি জানিতাম আমি কি করিতেছি; কিন্তু আমি তখন ভবিষ্যতে কি আছে দেখিতে পাই নাই—ভাবিতে চেষ্টা করি নাই। একবারও মনে করি নাই ঘরের লক্ষ্মীকে তাহার পবিত্র সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া অপবিত্র পঙ্কের মধ্যে স্বহস্তে বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছি, এ পাপের ফল হাতে হাতে মিলিবে।

তাহাকে শীঘ্রই শিক্ষিতা করিয়া লইবার জন্য গান বাজনা ও লেখাপড়া একসঙ্গেই শিখানো হইতেছিল। আমি প্রত্যহ বৈকালে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতাম। মা আমার, তোমার জন্মের পর দেড় বৎসর মাত্র মায়ের স্নেহ ভালবাসা তুমি পাইয়াছিলে, তাহার পর আর পাও নাই। তোমায় অনাবিল মাতৃস্নেহ বিচ্যুত করিয়াছিল এই হতভাগ্য—তোমারই পিতা। রানু, সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই—জীবনভোর এই বুকের মধ্যে তোমায় নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রাখিয়া,

আত্ম ভুলিয়া ভালবাসা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া ? বল মা আমার, কোনও দিন কি মায়ের অভাব তুমি জানিতে পারিয়াছ ?

নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছিলাম, বুঝিয়াছিলাম পরে, হায় মা, আগে কেন বুঝি নাই, আগে কেন জানি নাই ? প্রতি-বিধানের উপায় যখন রহিল না, ঘরে আগুন লাগিয়া মটকা যখন জ্বলিল তখন আমি জাগিলাম কেন ? আর একটু ঘুমাইয়া থাকিলে আমি পুড়িয়া মরিতাম—সে মরা বোধ হয় ভালই ছিল, চিরজীবন দগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে হইত না।

তুমি দিনরাতই দাসীর কাছে থাকিতে। যখন স্নুরমাকে লইয়া প্রত্যহ বৈকালিক ভ্রমণে বাহির হইতাম, তখন মাকে দেখিয়া তুমি মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে, দুইটী ব্যগ্রব্যাকুল হাত তোমার তাহার দিকে বাড়াইয়া দিতে। সমস্তদিন পড়া গান বাজনা শিক্ষার চাপে সে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে সময়টা তোমাকে সে দেখিতে পাইত না। এই সময়টা তোমায় দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। একবার তোমায় কোলে লইবার জন্য, কিন্তু আমি তাহার সে ব্যাকুলতা—সে কাতরতা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতাম। এমনই করিয়া তাহার অন্তরের মাতৃস্নেহটুকু আমিই যে স্বহস্তে ছেঁচিয়া ফেলিয়াছিলাম মা, তাহার পর একদিন দেখিলাম যথার্থই সে স্নেহের নির্ঝর শুকাইয়া গেছে।

দেবীকে দানবী মূর্ত্তিতে গঠিয়া তুলিল কে—সে আমিই না কি। মা স্বপন, তোর মা নিজে মরে নাই, আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি, তোর মাতৃহত্যাকারীকে কি দণ্ড দিবি মা ? আমি শুধু নিজের স্ত্রীকেই হত্যা করি নাই, তোর স্নেহময়ী মাকেও হত্যা করিয়াছি যে !

ইহার পর একটা দিনের কথা বলি শোন।

আমার সেদিন খুব জ্বর, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, কেহ নাই যে আমার মাথাটায় একটু স্নেহের পরশ দেয়। সে তখন বেড়াইবার পোষাক পরিয়া বাহিরে যাইতে কি মনে করিয়া একবার আমার কক্ষে প্রবেশ করিল। বড় কাতর কণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম "সুরমা, একটু আমার মাথার কাছটায় বসো ; তুমি বসলে আমি বড় শান্তি পাই, আমার রোগের যন্ত্রণা একটুও থাকে না।"

সে হাসিল, তখন সে হাসি আমার কানে কি কর্কশই না শুনাইল ; সে বলিল "তাই নাকি ? তা হলে আমি ঔষধের কাজ করি বল। মিঃ রায়কে বারণ করব—রোগীকে ঔষধ দিতে, কেননা আমি কাছে বসলেই রোগীর রোগ সব সেরে যাবে।"

কে বুঝিবে—কে জানিবে, কি অরন্তুদ ব্যথা আমার, এযে মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। বলার মত মুখ আমি নিজেই যে নষ্ট করিয়াছি—আমি নিজেই যে আমার শান্তি ঘুচাইয়াছি।

আর একদিনকার কথা বলি—

মিঃ রায় আমাদের বাড়ী সেদিন আসিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা ছিল না কি তিনি সেদিন সুরমাকে সঙ্গে লইয়া থিয়েটার দেখাইতে যাইবেন। সুরমা প্রস্তুত হইয়া সেই কক্ষ মধ্যে আসিয়াছে, এমন সময়ে রানু মা তুমি কোনও রকমে দাসীর হাত ছাড়াইয়া টলিতে টলিতে, হাসিতে মুখখানি ভরাইয়া ছুটিয়া আসিয়া তোমার মাকে জড়াইয়া ধরিলে। বড় আনন্দ তোমার, বহুকাল পরে আজ তুমি তোমার মাকে পাইয়াছ। তাহার জানু দুটি কোমল বাহুদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া তিন বৎসরের মেয়ে আমার—ডাকিলে—"মা—"

আহা হা, কে তোর মা অভাগিনী? জানিস নে কি তোর সে মা মরিয়া গিয়াছে, তোর মায়ের সেই দেহের মধ্যে এক প্রেতিনীর আবির্ভাব হইয়াছে?

"আরে গেল, মেয়েটা আবার কোথা হতে এসে জুটল?"

সে তোমায় ছাড়াইতে গেল, তাহার সুন্দর ড্রেস নষ্ট হইয়া যাইবে এই ভয়ে সে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এযে বড় শক্ত বন্ধন, কোমল বাহুপাশ সে নিষ্ঠুরা নারী ছাড়াইল কি করিয়া আমি তাই আজ ভাবি। একটু বেশী জোরে ধাক্কা দিতেই তুমি পড়িয়া গেলে, আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিয়াছিলে "মা আমি তোর কোলে যাব।"

সেই দিন—ক্ষুদ্র শিশুর চোখের জলধারা আমার কঠিন অন্তরকে বিগলিত করিয়া ফেলিল, আমার চোখেও জল আসিল। রুদ্ধকণ্ঠে আমি বলিলাম নাও সুরমা, একটু কোলে তুলে নাও, পড়ে গেছে বড় কাঁদছে।

নিষ্ঠুরা নারী সে—সন্তানকে স্পর্শও করিল না। দাসীকে ডাকিয়া তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিল। পুনরায় যদি দাসী তাহাকে কোনও রূপে ছাড়িয়া দেয়, সন্তান যদি মাতাকে বিরক্ত করিতে আসে, তাহা হইলে দাসীকেই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, এই কি সেই সুরমা—মেয়ের জন্য যাহার ভয়-ভাবনা উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না? সামান্য এই কয়টা দিনে—কয়টা মাসে তাহার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল কি করিয়া?

আর একদিন একটী দৃশ্য দেখিলাম—তাহাও বলিবার মত।

সন্ধ্যার পর সুরমা তাহার সঙ্গীতশিক্ষক অবিনাশ বাবুর নিকট গান শিখিতেছে। হার্ম্মোনিয়ামের সহিত অবিনাশ বাবুর মোটা সুর ও

তাহার মিহিসুর উঠিতেছিল, আমি আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম, সুরমা বড় সুন্দর গান শিখিয়াছে। অনেক বড় বড় মজলিসে তাহার গান গাহিবার নিমন্ত্রণ হয়। তাহার ন্যায় তাল লয় মানযুক্ত গান নাকি খুব কম মেয়েই গাইতে পারে।

দরজার কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দৃষ্টি পড়িল পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী ছোট মেয়ে, পর্দ্দার ফাঁক দিয়া সে ভিতরের দিকে চাহিয়া আছে।

আমার জুতার শব্দ পাইয়া সে অতিরিক্ত রকম চমকাইয়া উঠিল, সে যেন চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া গেছে, তাহার মুখখানায় সেই ধরণের ভাবটা তখন জাগিয়া উঠিল। একটুখানি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ছুটিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সময়ে আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে কি করছিলি তুই ?"

সে কথা কহে না, কাঁদ কাঁদ মুখে আমার হাত হইতে তাহার কচি কোমল হাতখানা ছাড়াইয়া লইবার জন্য আঁকিয়া বাঁকিয়া বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে এত জিজ্ঞাসা করিলাম, সে একটী কথারও উত্তর দেয় না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম "চল তুই সুরমার কাছে। আমি তাকে বলে দেব, তুই চুপ করে এখানে দাঁড়িয়েছিলি।"

এবার আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া সে আমার কোলে মুখ লুকাইল। "আমি মাকে দেখছিলুম বাবা, মা জানতে পারলে মারবে বলে আর মার সামনে যাই নে।"

হরি হরি, ঐ মা আর এই সন্তান ? ভগবান, তুমিই কি ইহাদের

সৃজন করিয়াছ? সন্তান মাকে লুকাইয়া দেখিতেছে, মায়ের কাছে যাইবার অধিকার তাহার নাই, তাহা একদিনকার প্রহারের ফলে সে বেশ বুঝিয়াছে। আমার বুকখানা অনুতাপে ভরিয়া উঠিল—ওরে অভাগা সন্তান, তোকে জগতের শ্রেষ্ঠ মাতৃধন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে কে রে, সে কোন পিশাচাধম,—সে কোন রাক্ষসাধম?

আমার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া ক্ষুদ্র বালিকা মাথার উপর পড়িতে লাগিল, আমি তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই মত কাঁদিতে লাগিলাম।

১৮

এমনই করিয়া দিন আসিতে লাগিল, যাইতে লাগিল। আমি নির্ব্বাকে শুধু দেখিয়া যাইতেছিলাম, একদিনও একটা কথা বলিতে পারি নাই।

ছোট মেয়েটী ব্যারামে পড়িল। মায়ের অনাদরে সন্তানের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, প্রলাপেও তাহার সেই মা মা স্বর—সেই রোদন, কেবল মার কাছে যাব। ডাক্তার বিকাশ গুপ্ত বালিকার প্রলাপ শুনিয়া আমায় বলিলেন "এর মাকে এনে কাছে দিন, নইলে মেয়েকে ভাল করতে পারবেন না।"

আমার তখন জ্ঞানচক্ষু ফুটিতেছিল। দিনরাত মেয়েটীকে বুকে লইয়া বসিয়া থাকিতাম, দেখিতেছিলাম সন্তানের এই ব্যারামের সংবাদে মায়ের প্রাণ গলে কিনা,—আমার যথেষ্ট দেখা হইল, সে আসিল না।

চোখের জল মুছিয়া মেয়েটীকে কোল হইতে নামাইয়া সেই

রাক্ষসীকেই ডাকিতে গেলাম। তাহাকে আনা চাই, একটীবার দেখান চাই, না হইলে স্বপন আমার বাঁচিবে না। অনুতাপে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছিল, আমি মেয়েটীকে ততই আকড়াইয়া ধরিতেছিল, আমার হৃদয় দিয়া তাহার ব্যথা মুছাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

ডাকিতে গেলাম, কিন্তু কোথায় সে ? কোথায় কোন পার্টিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সে চলিয়া গিয়াছে, সঙ্গে গিয়াছেন মিঃ রায়। সত্য কথা সেই দিন আমার মাথায় যেন দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, আমার বুকের মধ্যে ভীষণ একটা যন্ত্রণা ধরিল, আমি চোখে অন্ধকার দেখিয়া দুই হাতে আহত বুক চাপিয়া ধরিয়া টলিতে টলিতে মেয়ের কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

"মা—মাগো—"

উঃ, কি চীৎকার এ! কাহাকে ডাকিতেছিস রে—ওরে অভাগিনী তোর মা নাই, তোর মা নাই।

আমি না তাহার স্বামী, এই ক্ষুদ্র বালিকাটী না তাহার কন্যা! ভগবান, কোথা হইতে কোথায় আনিয়া ফেলিলে। এ কি নরক সৃজন করিলাম, নিজেই যে এ আগুনে দগ্ধ হইলাম। রক্ষা কর প্রভু, তুষানলে আর দগ্ধ করিয়ো না। আমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, ওগো আমার খুব হইতেছে।

মেয়ে আমার কেবল তাহার মাকেই ডাকিতেছিল, মায়ের কোলে যাইবার জন্য অধীর হইয়া কাঁদিতেছিল। আমি তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলাম, চোখের জলে ছোট মুখখানা তাহার ভিজাইয়া দিয়া বলিলাম "তোর মা মরে গেছে মা, সে যদি বেঁচে থাকত তা হলে আসত, সে মরে গেছে বলেই আসছে না। আর তাকে ডেকে অমন করে

কাঁদিস নে মা, আমি এখন হতে তোর কাছে দিনরাত থাকব; তোকে খুব ভালবাসব।"

সে দুইহাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার কাঁধের 'পরে ছোট মুখখানা রাখিয়া কান্নাভরা সুরে বলিল "হ্যাঁ বাবা, আমার মা তে আছে, সেদিন দেখেছি যে।"

বলিলাম "কাল মরে গেছে মা।"

বোধ হয় সে বিশ্বাসই করিল, তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলাম, আমার বুকে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই দিন আমি একখানা পত্র লিখিয়া দাসীর হাতে দিয়া সুরমাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহার সম্মুখে যাইতে, তাহার মুখ দেখিতে আমার বড় ঘৃণা হইতেছিল। পত্রে লিখিয়া দিলাম, এই মুহূর্ত্তে সে যেন আমার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এক মিনিট যেন আমার বাড়ীতে না থাকে। যেখানে খুসি সেখানে সে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। তাহাকে একদিন বিবাহ করিয়াছিলাম, এই জন্যই আমি তাহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া হাত খরচা দিব, ইহাতেই তাহার নিজের খরচ চালাইতে হইবে।

পত্রখানা পাইয়া তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামী কন্যাকে ছাড়ার জন্য নিশ্চয়ই নয়। কেননা, সে মায়া তাহার ছিল না। মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সে কি করিয়া দিন চালাইবে তাহাই ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। আমিই তাহাকে অত্যন্ত বিলাসিনী করিয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার বিলাসের ব্যয় বহন করিতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিলাম।

সে আমার সহিত দেখা করিতে চাহিলে, আমি দেখা করিলাম না;

আদেশ দিলাম, এই মুহূর্ত্তে যদি আমার গৃহ সে ত্যাগ না করে, ভৃত্য দ্বারা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব।

হাঁ, তখন আমার মনের গতি যেরূপ ছিল তাহাতে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে এরূপভাবে তাড়াইয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হইতাম না। সে দূর হইতে আমার কথা শুনিয়া ভয় পাইয়াছিল,—নিঃশব্দে মহাপাপিনী আমার গৃহত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল সে খোঁজ লইলাম না। আমার ক্যাশিয়ারকে আদেশ দিলাম, সে যেখানে থাকিবে সংবাদ পাইলে যেন প্রতিমাসের প্রথমেই তাহাকে পঞ্চাশটী করিয়া টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আমাকে জানাইবার কোনও দরকার নাই, বৎসরের শেষে হিসাব দিলেই হইবে।

সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল, সকল বাঁধন খসিয়া গেল, আমার বুকের উপর কি একটা গুরুভার বোঝা চাপানো ছিল সেটা পড়িয়া গেল। আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন-টাকে একদিক দিয়া টানিয়া যেমন করিয়াই হোক শেষস্থানে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে পা তুলিতে গেলাম। কিন্তু পায়ে একটী বাঁধন অনুভব করিলাম। সে বাঁধন অল্পেতেই ছেঁড়া যায় কিন্তু ছিঁড়িতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জীবন-তন্তুটাও বুঝি ছিঁড়িয়া যায়।

মেয়েটী দুটি হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোমল মুখখানা আমার মুখের উপর রাখিয়া ব্যথিত চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর ফেলিয়া ভাঙ্গাসুরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথায় যাবে বাবা, তা হলে আমি কার কাছে থাকব?"

তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিলাম, ওরে ক্ষুদ্র বালা, কেমন করিয়া জানিবি তুই, কেমন করিয়া বুঝাইব

তোকে, আমার সুখের নীড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আমার বুক শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

কিছুতেই আমি কলিকাতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে হইতেছিল, এখানে থাকিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। অনেক বুঝাইয়া ডাক্তার গুপ্তের কাছে মেয়েটীকে রাখিয়া আমি একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম।

একবার দেশে গেলাম, সেখানে সকলেই জানিল, সুরমা মারা গিয়াছে। কলিকাতার লোকে জানিল সুরমা দেশে গিয়া মারা গিয়াছে, দেশের লোক জানিল সে কলিকাতায় মারা গিয়াছে। কথাটা আমিই রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার গৃহত্যাগের কথা জানিত শুধু তিনজন—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার বিকাশ গুপ্ত, হরেন্দ্রনাথ আর অ্যাটর্ণি রজনীবাবু। আমার কলঙ্ক গোপন রাখিবার জন্য এই তিনজনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবন আরম্ভ হইল। মা আমার, একমাত্র বাঁধন ছিলে তুমি, তোমার আকর্ষণে আমি যেখানেই থাকিতাম, বৎসরে তিন চারবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতাম। তুমি তখন কত আদরে কত সোহাগে আমায় জড়াইয়া ধরিতে, আমার কলঙ্কিত মুখখানার 'পরে তোমার পবিত্র ছোট মুখখানা রাখিতে, সেইটুকু সময়ের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র ও ধন্য জ্ঞান করিতাম, তোমায় বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতাম। আমার চির অন্ধকারময় দিশাহারা জীবনের ধ্রুবতারা—আমার বড় বেদনার সান্ত্বনা—আমার মা, আমার সোণার স্বপন।

দেনার পর দেনা কেবল বাড়িয়াই চলিতে লাগিল, ম্যানেজার আমায় সতর্ক করিবার জন্য বার বার পত্র দিতে লাগিলেন, আমার যথার্থ

বন্ধু ডাক্তার গুপ্ত আমায় সৎপথে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কত উপদেশ দিতে লাগিলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন আমি যে অধঃপতনের পিছলপথে পা দিয়াছি, নামিয়াই চলিয়াছি, উপরে উঠার ক্ষমতা আমার নাই।

একটী নারীকে হত্যা করিয়াছিলাম—হাঁ, সে হত্যাই বটে। সুরমাকে আমি স্বহস্তে হত্যা করিয়া তাহার দেহে দানবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। সেই নারীহত্যার অসহ্য যন্ত্রণা আমায় দিনরাত্রি পীড়ন করিত, আমার বুকে তুষানল জ্বালাইয়াছিল। তাহাকে ভুলিবার জন্য—মা আমার, আজ লজ্জা করিবনা, আজ সত্য কথাই বলিব—আমি সুরা ও নারীর আশ্রয় লইয়াছিলাম।

নারীর মোহিনীশক্তিতে ভুলিলেও এতটুকু আমার জ্ঞান ছিল—ইহারা ডাকিনীর জাতি, সময় পাইলেই নিজমূর্ত্তি ধরিবে। রাজা ভতৃহরির সেই কথাটী আমার মনে ছিল—

নারীর মুখেতে মধু, অন্তরেতে হলাহল,
মুখেতে পিয়ায় সুধা হৃদে জ্বালে দাবানল

নারীকে একবার অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিয়া ফল পাইয়াছিলাম—সেই জন্য নারীকে আর বিশ্বাস করিতে পারি নাই, সতর্কদৃষ্টিতে তাহাকে কেবল দেখিয়াই যাইতেছিলাম।

রমার চরিত্রে সেদিন সন্দিহান হইলাম, সেইদিন হইতে তাহার উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিলাম। অবশেষে একদিন—মা স্বপন-শিহরিয়া উঠ, ঘৃণা কর, সত্য কথাই বলিতেছি—সন্দেহে উন্মত্ত প্রায় আমি—স্বহস্তে তাহার বক্ষে ছোরা বসাইয়া দিলাম। তাহার বুকের ক্ষত দিয়া উত্তপ্ত রক্ত ঝলকে ঝলকে বাহির হইতে লাগিল, আমি তখন মনের আনন্দে

পৈশাচিক হাসি হাসিতেছিলাম। মাথায় তখন খুন চাপিয়া গিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম—সুরমাকে কেন এমনই করিয়া হত্যা করি নাই, তাহা হইলে আমাকে এ যন্ত্রণা তো সহিতে হইত না, আমার বুকে এ আগুন জ্বলিত না, আমি একেবারেই নিশ্চিন্ত হইতাম।

তখন আমি ভাগলপুরের নিকটস্থ একটী জনবিরল পল্লীতে বাস করিতাম, রমা এই স্থানটীই পছন্দ করিয়াছিল। হত্যাকাহিনী প্রচার হইবার অনেক আগেই আমি পলাইলাম। মনে পড়িল এখন ধরা পড়িলেই আমায় ফাঁসি যাইতে হইবে। অবশ্য মরিতে তখন আমার ভয় ছিলনা, মরিলে আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত, কিন্তু আমার যে স্বপন আছে। সোনার স্বপন আমার—আমার প্রতীক্ষায় সে যে পথপানে চাহিয়া থাকিবে। সম্মুখে পূজা আসিতেছে, তাহার প্রবাসী পিতাকে সে কাছে পাইবে। না, মরিলে আমার চলিবে না, স্বপনের যে কেহ নাই।

কলিকাতায় আসিয়া পড়িলাম।

ডাক্তার গুপ্ত, বন্ধু হরেন্দ্রনাথ, রজনীবাবু আমার কথা শুনিলেন। ডাক্তার গুপ্ত কালবিলম্ব না করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে চলিলেন।

ভবানীপ্রসাদ তখন হরিদ্বারেই ছিলেন, তিনিই ডাক্তার গুপ্তের গুরুদেব। ডাক্তার গুপ্ত তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন—আমি তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলাম। সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগী মহান্ পুরুষের চক্ষু দুইটী মুহূর্ত্তের তরে একবার দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার পরই সে চোখ জলে ভরিয়া আসিল, ঠিক যেন চিকিমিকি বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে এক পসলা বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল। তিনি অপরিসীম ভ্রাতৃস্নেহে আমায় বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

তাপিত বুকটা যেন আমার জুড়াইয়া গেল। চিরনাস্তিক আমি

তাঁহার উপদেশ পাইয়া কবে আস্তিক হইয়া পড়িলাম। ভগবানে বিশ্বাস আসিল, প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিলাম—বড় শান্তি পাইলাম। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম, দুই তিন বৎসর তাঁহার শিষ্য হইয়া ত্যাগী সন্ন্যাসীরূপে জাপানে কাটাইলাম। যখন বুঝিলাম, রমার মৃত্যু-ব্যাপার যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেছে—কেহ তাহার মৃত্যু লইয়া নাড়াচাড়া করে নাই, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় তোমার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

মা আমার, আমার জন্য তোমায় বড় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাহা জানি, আমার পাপের ফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া চলিয়া যাইব, শেষটা রাখিয়া যাইব তোমার জন্য। হরেন্দ্রনাথ বড় স্বার্থপর, বড় চালাক, সে আমার এই ছিদ্র পাইয়া আমায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহার শ্যালক প্রভাতের সঙ্গে তোমার বিবাহ আমায় দিতে হইবে বলিয়া সে আমায় কথা দিয়া রাখিয়াছে। নচেৎ—যদি আমি অস্বীকার করি, সে আমার গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

মা, তোমার মনটা স্বর্গীয়ভাব দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি, তোমায় পাশ্চাত্য শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি। বরাবর তোমায় যে শিক্ষা দিয়া অসিয়াছি, তাহা ভোগের নয়, ত্যাগের ; তাহাই যথার্থ মহান শিক্ষা। তোমায় জানাইয়াছি—তুমি জগতের নও, তুমি মানবের নও, তুমি নারায়ণের উৎসর্গ করা একটী ফুল মাত্র। তুমি মানবের ভোগের জন্য সৃজিত হও নাই। মানব তোমায় ধর্ম্ম-সঙ্গিনী রূপে লাভ করিতে পারে—বিলাসসঙ্গিনী রূপে লাভ করিতে পারে না। এই সংসারে সকলের মাঝে বাস করিয়াও তোমাকে তোমার স্বাতন্ত্র বাঁচাইয়া চলিতে হইবে।

নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন তোমার চরিত্রের মধ্যে দিয়া দেখাইতে চাই ; তাই তোমায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝামাঝি রাখিয়াছি। এখন তোমার যে দিকে ইচ্ছা তুমি যাইতে পারিবে, এ দিকে আসিতে চাও এসো—ও দিকে যাইতে চাও যাও। মা, তোমার পিতার ইচ্ছা তো তোমার অজানা নাই। এখন তোমার যাহা অভিপ্রায় তাহাই সিদ্ধ হউক। নিজের ইষ্ট আমার চেয়ে নিজেই তুমি বুঝিবে, সেই জন্যই তোমায় শিক্ষিতা করিয়া তুলিবার আমার এত ইচ্ছা।

প্রভাতকে বিবাহ করা, সেও তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। আমি কলঙ্ক প্রকাশের ভয়ে হরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে মত দিয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে ইহাও বলিয়া দিয়াছি, স্বপন সাবালিকা হইবার পর বিবাহ হইতে পারে—তাহাও স্বপনের মতের উপর নির্ভর করে। পিতা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই—নির্ব্বাচিত পাত্র সৎ হোক অসৎ হোক তাহাকেই যে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবে এমন কোনও কথা নাই।

বড় দায়ে পড়িয়াছি মা, বড় বিপদেই পড়িয়াছি। তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছি, আমার বিপদ তুমিই ত্রাণ করিতে পারিবে। যদি প্রভাত সৎ হয়, যদি তাহাকে বিবাহ করার ইচ্ছা তোমার হয় বিবাহ করিয়ো। তুমি হিন্দু সে খৃশ্চান্ বলিয়া এ বিবাহে কোনও ব্যাঘাত হইতে পারে না। এ বিবাহ গুরুদেব ভবানীপ্রসাদ নিজে দিবেন বলিয়াছেন।

অনেক দেনা বাধিয়া গিয়াছে, জানি—হয়তো আমার জমিদারী থাকিবে না, সব যাইবে। খাজনা অনেক বাকি পড়িয়াছে, প্রজাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে, অনন্তবাবু টাকার

জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছেন। যায় যদি—সে তোমার জন্য নয়, তোমার পিতার পাপে। তোমার কিছুই থাকিবে না মা, তোমায় যে শিক্ষা দিয়াছি—সেই শিক্ষাই মাত্র রহিয়া গেল। প্রভাতকে যদি বিবাহ না কর, তোমার নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়ো। কোনও স্কুলে কাজ লইয়া, মনকে সর্ব্বদা ভগবানের পানে ফেলিয়া রাখিয়ো।

জগতে একমাত্র ভবানীপ্রসাদ ছাড়া আর কেহই বিশ্বাসপাত্র নাই, আমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি সেই অবিশ্বাসী হইয়াছে। আর বিশ্বাস করিয়ো ডাক্তার গুপ্তকে--যিনি পিতৃস্থানীয় হইয়া তোমায় এত-টুকু বেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন। মা, আমার গুরু ভবানীপ্রসাদের এখনও পরিচয় পাও নাই, জানিয়া আসিয়াছ তিনি আমার শুভানুধ্যায়ী গুরু—সেই টুকুর জন্যই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়াছ। যখন পরিচয় পাইবে তখন জানিবে তিনি কে, তিনি কি, তিনি কতটা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যদি সংসারে প্রবিষ্ট না হইতে চাও তিনিই তোমায় পথ দেখাইয়া দিবেন।

মহাপাপী পিতা তোমার, নারী হত্যাকারী—ক্ষমা কি করিবে মা, তোমার পিতার পাপ কি তুমি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিবে?

আমার মৃত্যুর পরে এই লেখা তুমি পাইবে, তোমার হতভাগ্য পিতার পতিত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়ো মা, তোমার চোখের দুটি ফোঁটা জল, আমার তৃষ্ণাকাতর বক্ষে শীতল অমিয় ধারা হইয়া ঝড়িয়া পড়িবে। আজ তবে আসি মা, বিদায়।

হতভাগ্য—জানকীনাথ।”

স্বপনের শ্লথহস্ত হইতে খাতাখানি খসিয়া পড়িল।

১৭

স্বপনকে কিছুদিনের জন্য দেশ ছাড়া করিয়া হরেন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ততা উপভোগ করিতেছিলেন। ডাক্তার গুপ্তকে তিনি সঙ্কোচ করিয়া চলিতেন। ডাক্তার গুপ্ত তাঁহাকে যথার্থ ঘৃণার চোখে দেখিতেছিলেন। নিজের সরকারী কাজে তিনি ছুটি পাইতেন খুবই কম। সেই জন্য কিছুকাল এখানে চাপিয়া থাকিয়া হরেন্দ্রনাথের জুয়াচুরি তিনি ধরিতে পারিতেছিলেন না। রজনীবাবু লোকটা বিলক্ষণ অর্থলোভী ছিলেন। বন্ধুদের জন্যই যে তিনি জানকীনাথের গুপ্তকথা ব্যক্ত করেন নাই তাহা নহে, প্রচুর অর্থ উৎকোচ লইয়া এবং এত বড় একটা জমীদারকে হাতে লইয়া তিনি কথাটা চাপিয়া গিয়াছিলেন। যখন যত টাকারই আবশ্যক হোক না জানকীবাবু দিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। তাঁহার ভয় ছিল পাছে হত্যার কথাটা রাষ্ট্র হইয়া যায়, স্বপন শুনিতে পায়, পুলিস স্বপনের সমক্ষে তাঁহার হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরাইয়া লইয়া যায়। রজনীবাবু হরেন্দ্রনাথের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ; সেই জন্যই হরেন্দ্রনাথ এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

অনন্ত বসু নালিশ করিয়া দিয়াছেন, রংপুরের মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া গিয়াছে, একপয়সাও তাহারা খাজনা দিবে না, এই মর্ম্মে স্বপনকে পুরীর ঠিকানায় একখানা পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাগজ পত্র দেখিতে লাগিলেন।

কল্যাণী চিন্তিতমুখে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "শুনছো মিন্টুর যে আজও বড্ড জ্বর এসেছে।"

হরেনবাবু কাগজ পত্র নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ম্যালেরিয়া হয়েছে দেখা যাচ্ছে।"

কল্যাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা অনেককাল আগেই জানা গেছে। এত ওষুধ দেওয়া হল, কিছুতেই ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিনের জন্য চেঞ্জে পাঠানো দরকার ডাক্তার বল্‌ছিলেন।"

হরেনবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "দরকার তো বুঝছি, কোথায় পাঠাব তাই ভাবছি।"

কল্যাণী বলিলেন, "স্বপন পুরীতে গেছে বলছ, তার কাছে পাঠালে হয় না?"

মুখ বিকৃত করিয়া হরেনবাবু বলিলেন "না, তার কাছে পাঠানো হবে না।"

কল্যাণী বলিলেন, "তাই বটে। আজ কাল মেয়েটার একটু সুমতি হয়েছে, যা বলছি চুপ করে শুনে যাচ্ছে, কোন কথার উত্তর করে না। কাল রাত্রে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অনেক বুঝিয়েছি, শশাঙ্ককে বিয়ে করবার কথা বললুম, তাতে একটা কথাও বললে না, এতে বুঝলুম সে আর অমত করবে না, তার মন নরম হয়েছে। তাকে বুঝালুম সে বিয়ে তার বিয়েই হয় নি, সে একটা ছেলেখেলা হয়েছে মাত্র; তার পরে সে ছেলে বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে। একটা রাত্রে যাকে সে দেখেছে তার স্মৃতি নিয়ে আজীবন কাটানো মূর্খতা মাত্র। তুমিও যেমন, তাই সেই সব কথা মনে করে রাখছো—আমি সে কথা ভুলে গেছি, মনেও করিনে।"

হরেনবাবু কাগজপত্রগুলি সরাইয়া একপাশে রাখিয়া চোখের

চশমাটা খুলিয়া রুমাল দিয়া কাঁচ দু'খানা মাজিতে মাজিতে সন্দেহের ভাবে মাথা দুলাইতে লাগিলেন।

কল্যাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাই, সেখানে একটু ভাল হলে তার বিয়েটা দিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবো। শশাঙ্ক ছেলেটী সব রকমে ভাল, আমি তাকে বড় ভালবাসি। আমাদের আর কে আছে বল এই মেয়েটি ছাড়া, কত আশা, কত সাধ মনে, মেয়ে জামাই নিয়ে সংসারী হব। ভগবানের ইচ্ছায় দিনটা এলে বাঁচি।"

পার্শ্বের কক্ষে মিনু শুইয়া জ্বরের প্রবল কম্পকে প্রাণপণে দমন করিয়া সে পিতামাতার সব কথাই শুনিতেছিল। জ্বরের প্রাবল্যে মুখখানা সাদা হইয়া উঠিয়াছিল, দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া সে তবু কম্প চাপিতেছিল।

"মাগো—"

দাঁত ছাড়িয়া গেল, থর থর করিয়া সে কাঁপিতে লাগিল।

কল্যাণী দরজার উপর দাঁড়াইয়া কন্যার পানে চাহিয়া ছিলেন, ছুটিয়া হরেনবাবুর কাছে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি একবার এসো, মিনু বড় কাঁপছে।"

বিষয়ী হরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বরে অমনি করেই কাঁপ ধরে, ওতে ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্বরটা আজ তা হলে বেশীই হবে দেখছি। কমলাকে ওর কাছে বসতে বল গিয়ে।"

কল্যাণী আবার ফিরিলেন।

কমলা বালবিধবা হিন্দুর ঘরের মেয়ে। কোন শুভ গ্রহ হেতু সে কল্যাণীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়া এইখানেই রহিয়া গিয়াছিল। বড় শান্ত

প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে, তাহার শ্যাম মুখখানায় অন্তরের পবিত্রতা প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। মৃন্ময়ীর সমবয়স্কা ছিল সে, মৃন্ময়ী তাহাকে পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল। কমলার শিক্ষয়িত্রী ছিল সে, অবশ্য ছাত্রী শিক্ষয়িত্রী সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে ছিল না—সখী-সম্বন্ধই ছিল।

কমলা মৃন্ময়ীর কম্পমান দেহটা চাপিয়া ধরিয়াছিল।

কল্যাণী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া কন্যার পানে চাহিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞসা করিতেছিলেন, "কাঁপাটা কম পড়ল কি কমলা ?"

কমলা মৃদুকণ্ঠে উত্তর না দিতেই আবার প্রবল কম্প আসিয়া মিনুর ক্ষীণ দেহখানা বিপর্য্যস্ত করিতেছিল, মায়ের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যাইতেছিল।

যখন মৃন্ময়ী তাঁহার বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিতেছিল, তখন বড় দুঃখে মনের কষ্টে তিনি তাহার মরণ কামনাই করিতেছিলেন। এ কামনা করার জন্য আজ তিনি কি রকম অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। আজ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, একদিন তিনি যে কামনা করিয়াছিলেন, কোন অশুভক্ষণে সে কামনা হয়তো ভগবানের চরণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনি নিজেকে নিজে বুঝাইতে পারিলেন না, কাতর কণ্ঠে কমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ কমলা, মিনুর হঠাৎ এমন অসুখ হল কেন বলতো ?"

কমলা উত্তর দিল, "অসুখ হওয়ার তাই হয়েছে মা। এ রকম জ্বর কত লোকের নিত্যি হচ্ছে তাতে কেউ কি আপনার মত ভাবে ?"

কল্যাণী খানিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, হঠাৎ আর্ত্তভাবে বলিয়া

উঠিলেন, "না কমলা, আমি কামনা করেছিলুম মিনু যেন—সেই জন্যেই মিনুর জ্বর হয়েছে। মিনুর যদি কিছু হয়—"

বাধা দিয়া কমলা বলিল "কি বলছেন মা, আপনি যান এ ঘর হতে, এ ঘরে আপনার মত লোকের থাকা উচিত নয়। ভারি দুর্ব্বল মন আপনার; সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে তাতেই আপনি কত কি ভাবছেন। বিকেলের দিকে এ ঘরে আসবেন—দেখবেন তখন মিনুর জ্বর ছেড়ে এসেছে।"

সে এক রকম প্রায় জোর করিয়াই কল্যাণীকে সে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

সমস্ত দিনটা মৃন্ময়ী প্রবল জ্বরে হতজ্ঞান হইয়া রহিল, কমলাও সমস্ত দিন তাহার পার্শ্ব ত্যাগ করিল না।

সন্ধ্যার দিকে জ্বর কমিয়া গেল; মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কমলা বাধা দিয়া বলিল "এখন উঠনা মিনুদি, আর ঘণ্টা দুই চুপ করে শুয়ে থাকো, জ্বরটা আগে ছেড়ে যাক তারপর উঠো।"

ক্ষীণকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিল "আমি আর শোব না কমলা দি, আমায় একটু ধর, আমি উঠে বসি।"

তাহার একান্ত বসিবার ঝোঁক দেখিয়া কমলা তাহাকে আস্তে আস্তে উঠাইয়া বসাইয়া দিল।

"কমলা দি, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাওনা, বড় ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে।"

দুইহাতে কমলার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া সে তাহার স্কন্ধের উপর মাথাটা রাখিল। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কমলা বলিল "মাকে ডাক্‌বো মিনুদি ?"

চমকাইয়া উঠিয়া মৃন্ময়ী বলিল "না না, কেন, কি হয়েছে আমার যে মাকে ডাকবে? মাকে ডাকতে হবেনা কমলাদি' তুমি বস, আমার বুকের ব্যথা সেরে গেছে।"

কমলা জানিত মৃন্ময়ী মায়ের সঙ্গ প্রাণপণে এড়াইয়া চলিতেই চাহিত, মা তাহাকে ডাকিয়াও সাড়া পাইতেন না। সে বলিল "না, মাকে ডাকব না, তুমি শুয়ে পড় মিনুদি। সমস্ত দিনকার জ্বরে বেশী-রকম দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ কিনা তাই বুক ধড়ফড় করছে।"

মৃন্ময়ী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "আর শুতে পারছিনে কমলা দি, খানিক বসে থাকি তারপর শোব এখন।"

দেয়ালের গায়ে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, মৃন্ময়ীর চোখে তাহার দীপ্তি আসিয়া পড়িল; সে বলিল "ওটা কমিয়ে দাও না কমলা দি, বড় চোখে এসে লাগছে।"

কমলা আলোটা কমাইয়া দিয়া আবার আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

"দেখ কমলা দি, জ্বরের ঝোঁকে আমি স্বপ্ন দেখছিলুম, মা এসে যেন আমার গা দেখলেন, আমার মাথার কাছে বসে আইসব্যাগ আমার মাথায় ধরে কতক্ষণ বসে রইলেন। এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন, সত্যি কখনই নয়। মা কখনই এ ঘরে আসেন না। আমার সঙ্গে কাল রাত্রে ছাড়া আর কথাই বলেন নি। তিনি একদিন স্পষ্টই তো বলেছেন আমায় দেখতে পারেন না, আমি মরিলেই তাঁর সকল আপদ যায়। আমার জন্য তিনি কলকাতায় আর যেতে পারছেন না—সেখানে আমার জন্যেই তাঁর মুখ নত হয়ে পড়েছে। আচ্ছা কমলাদি, কেন আমার জ্বর ছাড়বে? আমার এ জ্বর ছাড়ে এ ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। ভগবানের কাছে

দিন রাত প্রার্থনা করছি আমার যেন মরণ হয়, আমি যেন বাবা মাকে শান্তি দিতে পারি।”

তাহার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভিজিয়া উঠিল।

কমলা বলিল “অমন কথা মুখে আনতে নেই মিনুদি। মা তোমার মরণ কামনা করবেন একি সত্যি কথা হতে পারে? মা হও নি তাই মা কি জিনিষ—সন্তান মায়ের কাছে কি বস্তু তা তুমি জান না। মা রাগের মাথায় সন্তানকে যা খুসি বলে যান, শেষটায় কতদূর অনুতপ্তা হন, গোপনে কত ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ে তাতো জানো না মিনুদি। সারাদিন তোমার এই অজ্ঞান অবস্থা দেখে মা কেঁদে ছুটো-ছুটি করছেন, এর মধ্যে তিন চারবার ডাক্তার এসেছে। কখনও তোমার এ রকম বেহুঁস জ্বর হয় নি, আজ তোমার অবস্থা দেখে মার মাথার কি ঠিক আছে? তাঁর মনে জাগছে কবে কোন্ দিন তিনি তোমাকে মরতে বলেছিলেন, সেই জন্যেই বুঝি তোমার জ্বর হয়েছে। মার যা কান্না—সে যদি দেখতে মিনুদি, আমি জোর করে তাঁর এ ঘরে আসা বন্ধ করেছি। বলেছি জ্বর ছাড়লে খবর দেব, তখন এসে তোমায় দেখে যাবেন।”

মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল “কাল রাত্রে তিনি আমায় অনেক কথা বলেছেন তা জানো কমলাদি। আমি একটা কথাও বলি নি। তিনি তাই জেনে নিলেন বিয়েতে আমার মত আছে। আজ বাবার সঙ্গে সকালে সেই সব কথাই বলছিলেন, আমি সব শুনেছি।”

আবার সে খানিক চুপ করিয়া রহিল, একটু পরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল “তাই কি হয় কমলাদি, তা কখনো হতে পারে? আমি এখানে

আর থাকব না, একটু ভাল হয়েই আমি কাশীতে ঠাকুরদার কাছে যাব এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব, আমি সত্যিই মরার অধম হব।"

কমলা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহের স্থরে বলিল "আগে ভাল হও ভাই, তারপর যা করবার করো। এখন এত দুর্ব্বলতার পরে এ সব কথা ভাবাই তোমার অন্যায়। তুমি অত বকো না মিনুদি, চুপ করে এখন খানিকটে ঘুমোও। মা যা বলছেন চুপ করে শুনে যাও, উত্তর দিয়ে অনর্থক আবার একটা গণ্ড-গোল বাধিয়ে তুলো না। মনে করো ভগবান আছেন, তিনিই সব দিক রক্ষা করবেন। ভগবানের 'পরে সব ভার ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো, আর তোমায় কিছু দেখতে শুনতে ভাবতে হবে না।"

মৃন্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চোখের জলে গণ্ড বহিয়া কমলার হাতের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল "না কমলা-দি, ও কথা বললে আর বিশ্বাস করব না। ভগবান নেই বলেই আমার ধারণা জন্মে গেছে ; আমি আর ভগবানকে ডাকব না। এতদিন ধরে ঠেকিয়ে আসছি, আর ঠেকানোর ক্ষমতা আমার নেই, আমার সাহস গেছে, বল গেছে, শক্তি গেছে। যার ইচ্ছার 'পরে আমার জীবনখানা দেহখানা রাখব, তাঁর যা খুসি তিনি করুন, আমি আর একটী কথা বলব না।

কল্যাণীর পদ শব্দ শুনা গেল ; দরজার পর্দ্দা সরাইয়া প্রবেশ করিতে করিতে বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন "একি মিনু, তুমি উঠে বসেছ যে ? জ্বর ছাড়ার সময় শরীর যে রকম দুর্ব্বল হয়, তাতে হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে। কমলা, আমি কতদিন তোমায় এ কথা বলেছি যে,— দেখছি তুমি আমার কথা মোটে শুনতেই চাও না। তাড়াতাড়ি করে আগে শুইয়ে দাও বলছি, আর একটী মিনিট বসতে দিয়ো না।"

মৃন্ময়ী নিজেই শুইয়া পড়িল।

কন্যার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার ললাটে হাত দিয়া তাপ লইয়া কল্যাণী প্রফুল্ল মুখে বলিলেন "জ্বর প্রায় ছেড়ে এসেছে—না কমল? টেম্পারেচার নিয়েছিলে, কত দেখলে—"

কমলা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বলিল "টেম্পারেচার নেওয়া হয় নি তো মা?"

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিলেন "ওই তো তোমাদের দোষ; বললে যদি তোমাদের জ্ঞান হয়। ডাক্তার বাবুকে খবর পাঠাতে হবে বলে গেছেন—; থাক, থাক—এখন নিতে হবে না, আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার বাদে নিয়ো এখন।"

মায়ের অত্যধিক স্নেহাদর মৃন্ময়ীকে তাঁহার পানে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তাহার মন প্রথম হইতেই মায়ের উপর বিরূপ হইয়াছিল, সে বুঝিতেছিল এই আদর যতটুকুও স্বার্থের জন্য। হায় রে, জগতে মায়ের স্নেহই ছিল নিঃস্বার্থ, তাহাও এমন খাদ মিশানো হইল কি করিয়া?

জ্বরটা দু দিন বাদেই বন্ধ হইয়া গেল। কন্যাকে পথ্য দিয়া কল্যাণী তাহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, কমলাও তাঁহার সঙ্গে গেল।

২০

প্রভাতে স্বপন যখন গৃহের দরজা খুলিয়া বাহির হইল, তখন যে তাহার পানে তাকাইল, সেই বিস্মিত হইয়া গেল। একটা রাত্রি তাহার দশ বৎসরের আয়ু লইয়া সরিয়া গিয়াছে। সে কাল যেমন সরল ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছিল, আজ সে রকম সরল ভাবে কিছুতেই দাঁড়াইতে

পারিতেছিল না, সম্মুখের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহার বড় বড় ভাসা চোক দুটি ভিতরে বসিয়া গিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আজ বড় উদাস। মুখখানার উপর জগতের মলিনতা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, রুক্ষ চুলগুলা অসংযত ভাবে মুখে চোখে আসিয়া পড়িতেছে।

প্রভাতের তরুণ সূর্য্যালোক বারাণ্ডায় পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছিল, আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলা সূর্য্যালোকে উজ্জল শুভ্র মূর্ত্তি ধরিয়া বাতাসে ভাসিতে ভাসিতে এদিক হইতে ওদিকে যাইতেছিল। অন্য দিন এই প্রভাত স্বপনের চোখের সম্মুখে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধরিয়া বিকশিত হইয়া উঠে, আজ প্রভাতের সেই একই মোহময় রূপ দেখিয়া সে দুই হাতে চোক ঢাকিল।

বারাণ্ডার ধারে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া সে উদাস দৃষ্টিতে খানিক কোন দিক পানে চাহিয়া রহিল। খাতাখানি সে কাল রাত্রেই পুড়াইয়া ফেলিয়াছে, ছাইগুলা নিজের হাতে কুড়াইয়া লইয়া জানালা-পথে একেবারে বাহিরে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। সব চিহ্ন সে বাহির হইতে বিলুপ্ত করিয়া অন্তরে লইয়াছে। এ বিষ সে নিজের কণ্ঠেই রাখিয়াছে, উপরেও উঠিবে না, নীচেও নামিবে না।

দাসী আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাহার বিষাদিত অথচ গম্ভীর মুখখানার পানে চাহিয়া সে সহজে কথা বলিবার সাহস পাইতেছিল না। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল "দিদিমণি, আপনার মুখ ধোওয়ার জল—"

তাহার পানে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বপন বলিল "মুখ ধোব এখন, তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি করতে হবে না। শশধরবাবুকে আগে খবর দাও, তাঁকে আমি এখনি ডাকছি।"

শশধরবাবু এই বাড়িতেই থাকিতেন, স্বপনের এখানকার যা কাজ তাহা তিনিই করিতেন।

স্বপন ডাকিতেছে শুনিয়া স্থূলকায় শশধরবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে ছুটিয়া আসিলেন। স্বপন তখন আবার কক্ষ মধ্যে গিয়া বসিয়াছে, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্যমনস্ক ভাবে কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে।

শশধরবাবু অভিবাদন করিয়া দরজার উপরে দাঁড়াইলেন, প্রত্যভিবাদন করিয়া স্বপন বলিল "ম্যানেজার বাবুর মঙ্গলবারে এখানে আবার আসার কথা ছিল, কাল মঙ্গলবার গেছে, তিনি এসেছেন কি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শশধরবাবু বলিলেন "সে কথা আমি ঠিক বলতে পারছি নে মা, খবর আমি পাই নি। তবে খোঁজ করলে খবরটা এনে দিতে পারি।"

স্বপন বলিল "আপনি তবে খোঁজটা নিন, নিয়ে আমায় জানান। যদি কাল তিনি এসে থাকেন তবে এই মুহূর্ত্তে যেন আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যান, আমার বিশেষ দরকার। কাউকে এখনই পাঠিয়ে দিন তাঁর বাসায়, একটুও দেরী করবেন না।"

শশধর বাবু চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ না তিনি ফিরিয়া আসিলেন, স্বপন ততক্ষণ সেখানেই বসিয়া রহিল।

আধঘণ্টা পরে শশধর বাবু ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন হরেন্দ্রনাথ আসেন নাই, তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা কন্যাকে লইয়া কাল সন্ধ্যায় আসিয়াছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বপন বলিল "এখন তাঁকেই আমার দরকার ছিল, তাঁর স্ত্রী কন্যাতে কোন দরকার নেই। আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন, আপনাকে আমার আর কোনও দরকার নেই।"

শশধর বাবু চলিয়া গেলেন।

মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া স্বপন শান্ত হইয়া বসিল। তাহার কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, দারুণ চিন্তা তাহাকে একমুহূর্ত্তের জন্যও অব্যাহতি দেয় নাই।

সন্তান সকলেই, জগতে পিতামাতা ছাড়া সন্তানের সান্ত্বনার বস্তু আর কিছু নাই। একটু ব্যথা পাইলে—একটু কষ্ট পাইলে মানুষ আগে পিতামাতাকেই ডাকিয়া থাকে, তাঁহাদের মূর্ত্তি সে সময়ে হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে, তাহাদের স্নেহের কথা ভাবিয়া হৃদয় ভরিয়া যায়। সে এতদিন ব্যথা পাইয়া সান্ত্বনার আশায় ডাকিয়াছে কাহাকে, এতদিন দেবী জ্ঞানে পূজা করিয়াছে কাহাকে? ছদ্মবেশে সাজিয়া কোন রাক্ষসী তাহার হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়াছে? কে তাহার মা? ঐ যে বৃহৎ তৈল চিত্রখানা তাহারই হাতের গাঁথা হৃদয়ের ভক্তিতে আপ্লুত ফুলের মালায় সজ্জিত হইয়া এখনও চোখের উপর রহিয়াছে ঐ কি তাহার স্নেহময়ী জননীর চিত্র?

"মাগো—"

আর্ত্তকণ্ঠে স্বপন কাঁদিয়া উঠিল—মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয় জুড়াইবার সান্ত্বনাটুকুও আমায় দিলে না? সন্তানের হৃদয় জয়ই করিয়াছিলে—সে তো সকল মায়েই করিয়া থাকে, সেই সকল মায়ের মত মন বশে রাখিতে পার নাই অভাগিনী? তোমার ও মূর্ত্তি তো মাতৃমূর্ত্তি নয়, বিলাসে সজ্জিতা এ বিলাসিনী মূর্ত্তি মায়ের নয়। চোখে তোমার মাতৃস্নেহ কই, ও চোখে যে বিলাস লালসা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তোমার এ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া সন্তান যে মা বলিয়া ডাকিতে পারিতেছে না—কণ্ঠ যে নীরব হইয়া আসে। কি করিয়াছ নারী, কোথায় ছিল তোমার আসন,

কোথায় গড়াইয়া আসিয়া পড়িয়াছ? তুমি ছিলে সহস্রদল পদ্মের উপরে সযত্নে রক্ষিত; যেন ময়লা তোমার গায়ে না লাগিতে পারে, তুমি গড়াইয়া স্বেচ্ছায় পড়িয়া গেলে পঙ্কের মাঝখানে? তুমি একজনের ধর্ম্মসঙ্গিনী, জীবনের সহচারিণী—সহধর্ম্মিণী ছিলে, সন্তানের মা ছিলে, কেমন করিয়া সব বিসর্জ্জন দিলে নারী? স্বামীর অফুরন্ত প্রেম ভালবাসা, সন্তানের স্নেহ, কিছুই কি তোমায় আবদ্ধ রাখতে পারিল না।

"রাক্ষসী—"

স্বপন চোখ মুছিতে মুছিতে গর্জ্জিতে লাগিল—না, এ মূর্ত্তি আর রাখা উচিত নয়। এ বিলাসিনী নারী মূর্ত্তির ধ্বংস করা উচিত, আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। পিতা লোকের সন্দেহের ভয়ে এ মূর্ত্তি দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে ভয় ছিল স্বপন মায়ের মূর্ত্তি না দেখিতে পাইয়া কারণ জানিতে চাহিবে। উঃ, এই মূর্ত্তির পানে যখন তিনি তাকাইয়াছেন, কি নিদারুণ যন্ত্রণাতেই না বুকটা তাঁহার ভাঙ্গিয়া যাইত—তথাপি তিনি রাখিয়াছিলেন, পাছে স্বপন কিছু ভাবে, জানিতে চায়, কেন তাহার মায়ের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, লোকে পাছে কোনও রকম সন্দেহ করে। হায় রে, অনুক্ষণ তিনি এই নারীর জন্য হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্তর তাঁহার ফাটিয়া যাইত তথাপি তিনি মুখে দিব্য হাসিতেন।

সে নিজের হাতে এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিবে, মায়ের মূর্ত্তি সে কোথাও রাখিতে দিবে না, মায়ের নাম সে একবারে ভুলিয়া যাইবে। সে যে বড় হইয়া সে রাক্ষসীকে দেখিতে পায় নাই সে তাহার অশেষ পুণ্যবলে—নচেৎ কখনই সে স্থির থাকিতে পারিত না। সন্তান আর সব সহ

করিতে পারে মায়ের কলঙ্ক সহিতে পারে না। সন্তানের চোখে মা যে কি জিনিস তাহা জানে শুধু সন্তান।

স্বপন উঠিল, নিদারুণ জীঘাংসায় তাহার বুক জ্বলিয়া যাইতে ছিল, আজ সে স্বহস্তে মায়ের চিহ্ন লুপ্ত করিবেই এই তাহার প্রতিজ্ঞা। সে চেয়ার সরাইয়া আনিল, তাহার উপর টুল দিল, তাহার পরে দাঁড়াইয়া ছবিখানা দেয়াল হইতে নামাইয়া লইল।

মাটির উপর সেখানা রাখিয়া সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। লালসার প্রতিমূর্ত্তি এ, হীনভাবটাই ফুটিয়া উঠিতেছে ইহার চোখে মুখে; দেবীত্ব ইহার কোথায়? অন্ধ সে, এতদিন ধরিয়া এই মূর্ত্তিই তো দেখিয়া আসিয়াছে, কালও এই মূর্ত্তিরই পূজা করিয়াছে। ইহার মুখখানার দিকে কি ভাল করিয়া চায় নাই। এই লালসা কি দেখিতে পায় নাই। হায় নারী, নারীর নামে এমন করিয়াও কলঙ্ক দিতে হয়, নারীর মুখে স্বহস্তে কেমন করিয়া এ কালী লেপন করিয়া দিলে? নরকে নামিয়া কি সুখ পাইয়াছ, কি তৃপ্তি লাভ করিয়াছ, একবার বলিয়া দিতে পার কি? তোমার গর্ভজাত সন্তানও তোমায় এতটুকু শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারিতেছে না, তোমার দিকে চাহিলে ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে; এই কি সন্তানের কাছে মায়ের পাওয়ার জিনিষ? সন্তানের ঘৃণা সহার চেয়ে তুমি বিলুপ্ত হও, একেবারে ধূলার সাথে ধূলা হইয়া মিশিয়া যাও, স্বপন ভুলিয়া যাক সে তোমার মত মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছে।

সে দুই হাতে ছবিখানিকে বিপুলবলে টানিয়া লইয়া ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল, দেয়ালের গায়ে বৃহৎ ভারি ছবিখানি পড়িল, ঝন ঝন করিয়া কাঁচখানা সহস্রখণ্ডে পরিণত হইয়া গেল।

সে শব্দ নীচের তলে পর্য্যন্ত গিয়া পৌছাইল, দাসী চাকরেরা ছুটিয়া আসিল, স্বপন সকলকে হাঁকিয়া তাড়াইল দিল।

কাঁচের টুকরাগুলি সরাইয়া ছবিখানা সে তুলিয়া লইল ; একটা বাতী ধরাইয়া কতকগুলি পুরাতন সংবাদ পত্র এক করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়া তাহার উপর ছবিখানা ফেলিয়া দিল।

ধূ ধূ—ধূ ধূ, আগুন জ্বলিতে লাগিল, ছবিও পুড়িতে লাগিল—অগ্নি গর্জ্জন করিয়া চিত্রাঙ্কিতা অনুপমা সুন্দরীর মুখ চোখ হাত সব গ্রাস করিতে লাগিল।

হাঁ, এই তোমার দণ্ড ; বড় কষ্ট যে স্বপন তোমার চিত্রটাকেই দগ্ধ করিতে পারিল, যদি তোমার সত্য রূপটাকে এমনই করিয়া দগ্ধ করিয়া দিতে পারিত তবে কত না সুখী হইত সে। হয় তো এখনও তুমি বাঁচিয়া আছ, এখনও তোমার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মানব নয়নকে প্রলুব্ধ করিতেছ পাপিয়সী। তুমি যে স্বামীর স্ত্রী তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি যে সন্তানের মা তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার আসন কোথায় ছিল তাহাও ভুলিয়াছ, শুধু মনে তোমার জাগিয়া আছে তুমি সুন্দরী—অতুল অসীম সৌন্দর্য্য তোমার। তাই কি—ওরে মোহান্ধা নারী, সৌন্দর্য্য অসীম কি? যখন ধ্বংশ আসিবে তখন তাহার স্পর্শে কোথায় চলিয়া যাইবে অতুল রূপ, যাহারা রূপের উপাসক তাহারাই, তখন ঘৃণায় মুখ ফিরাইরা চলিয়া যাইবে।

সে দিন আসিবে—কিন্তু সে কাল-দণ্ড, সন্তানের দণ্ডতো নয়। সন্তানের হাতে যদি ওই রূপের ধ্বংস হইতে পারিত, তবেই না সন্তান শান্তি পাইত, পাপিনীর গর্ভজাত বলিয়া তাহার মনে যে ঘৃণা জাগিতেছে সে ঘৃণা কতকটা সরিয়া যাইত।

ভেজানো দরজাটা সশব্দে খুলিয়া গেল, দরজার উপর দাঁড়াইয়া ডাক্তার গুপ্ত।

বিস্মিত নয়নে এই চিত্রদগ্ধ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বিস্মিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি হচ্ছে স্বপন?"

স্বপন মুখ ফিরাইয়া অধর দন্তে চাপিয়া পরুষ কণ্ঠে বলিল "দুর্ব্বিনীতা নারীর সৎকার করছি!"

"দুর্ব্বিনীতা নারী—তোমার মা—?"

স্বপন তাঁহার হাতখানা সবলে চাপিয়া ধরিল, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল "আমার মা? আমার মা নয়, আমার জন্মের পরেই আমার মা মরে গেছে কাকা। বাবা আমায় যে দিন বলেছিলেন তোর মা মরে গেছে, আমি সেই দিনই জেনেছি আমার মা নেই। মা ভেবে এতদিন যে দানবীর পূজা করেছি, ভক্তিতে যার পায়ে চোখের জল ঢেলেছি, আজ তার ছদ্মবেশ খসে পড়েছে, দেখছি—সে আমায় শুধু ঠকিয়েই এসেছে। আজ নিজের হাতে তার সৎকার করছি ডাক্তার কাকা আজ—"

কথা সমাপ্ত হইল না, কাঁপিতে কাঁপিতে ডাক্তার গুপ্তের হাত ছাড়িয়া দিয়া সে মাটীতে পড়িয়া গেল।

"স্বপন, স্বপন—"

মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল সে। অনেকদিন হইতেই তাহার মন ও দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নিজের মায়ের ঘৃণিত চরিত্র ভাবিয়া কাল তাহার একটুও ঘুম হয় নাই, সারারাত্রি সে কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে। এই সময়টায় অত্যধিক উত্তেজনার বেগ সে সহ্য করিতে পারে নাই, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ডাক হাঁক করিতে দাস দাসীগণ আসিয়া পড়িল, ডাক্তার গুপ্ত

সকলকে বাহির করিয়া দিলেন, একটী দাসী মাত্র তাঁহার সাহায্যার্থে রহিয়া গেল।

খানিকটা চেষ্টার পর স্বপনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ মেলিল।

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাক্তার গুপ্ত ডাকিলেন "স্বপন—"

রুদ্ধকণ্ঠে স্বপন বলিয়া উঠিল "ডাক্তার কাকা, আমি এসব কি শুনলুম, এ কাহিনী শুনবার আগে আমি মরলুম না কেন? আমার মা দুশ্চারিণী, গৃহত্যাগিনী, আমার দেবতা বাপ নারী হত্যাকারী, এ আমি বেঁচে থেকে কেমন করে শুনলুম ডাক্তার কাকা? আমায় স্বর্গ হতে কে কোথায় ফেলে দিলে? আদর্শচ্যুতা হয়ে এখন এই দুঃসহ জীবন যাপন করব কেমন করে আমি বলুন।"

সে উঠিয়া বসিল, ডাক্তার গুপ্তের কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় উচ্ছসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার গুপ্ত দাসীকে কক্ষত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন, সে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

স্বপনের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন "আমার দিব্য, একটু সংযত হও মা। যা সাধারণের কাছে অজ্ঞাত আছে তা প্রকাশ করো না। ভগবান তোমায় শক্তি দিতে কার্পণ্য করেন নি, পরের শক্তির সাহায্য নেওয়ার তোমার একটু দরকার নেই, তুমি নিজের শক্তির 'পরে নির্ভর কর—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। এতদিন এ সত্য গোপন ছিল, তোমার বাপের আদেশ না পেলে আমি আজও এ সত্য প্রকাশ করতুম না। অপরাধী আমি মা কিন্তু—"

স্বপন মুখ তুলিল। অশ্রু সজল দুইটী চোখের দৃষ্টি ডাক্তার গুপ্তের

মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আপনি কেন অপরাধী হবেন ডাক্তার কাকা, আপনি আপনার বন্ধুর আদেশ পালন করেছেন মাত্র। ডাক্তার কাকা, বড় বেদনা পেলে লোকে সান্ত্বনার জন্যে মায়ের নাম করে ; আমি যখন বুকে বড় ব্যথা পাব তখন কাকে ডাকব ?"

তাহার মাথাটা ঘুরিয়া আবার ডাক্তার গুপ্তের কোলের উপর পড়িল। এ কথার উত্তর দেওয়া ডাক্তার গুপ্তের অসাধ্য। সত্যই সন্তান ব্যথা পাইলে সন্তাপহারিণী মাকেই আগে ডাকিয়া থাকে ; এ অভাগিনী ডাকিবে কাহাকে ? মা নাম মুখে আনিতে গিয়া ঘৃণায় তাহার কণ্ঠ এড়াইয়া যাইবে যে, জিহ্বা আপনিই সঙ্কুচিত হইবে যে।

স্বপন আবার মুখ তুলিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "ডাক্তার কাকা, মায়ের কলঙ্ক সন্তানে সইতে পারে না। বইতে পড়েছি অনেক পতিতা মা নাকি সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার সৎচরিত্র গড়ে তুলবার জন্যে নিজেদের পথ পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু আমার মা—"

তাহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, অনেক্ষণ পরে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া সে বলিল "আর আমি মা নাম মুখে আনব না ডাক্তার কাকা—বুক ফেটে গেলেও আর মা বলে কাউকে ডাকব না।"

কি মর্ম্মভেদী কথা, ডাক্তার গুপ্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

"ডাক্তার কাকা, আমার দেবতার মত বাপ, চরিত্রে জ্ঞানে শিক্ষায় তাঁর সমান আর তো কাউকে দেখতে পাইনি। আমি যে স্বপ্নেও কখনও জানি নে তিনি—"

ডাক্তার গুপ্ত রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আমি বলছি মা, আমার কথায় বিশ্বাস কর। তিনি যে ভুল পথে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলেন, অনেকেই

তেমনি গিয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দেখে তিনি নিয়ে গেলেও শেষটায় তার জন্যে বড় কম কষ্ট পান নি, বড় কম অনুতাপ তাঁকে করতে হয় নি, সে অনুতাপে সে ভুল সুধরিয়ে গেছে। তিনি হত্যা করেছিলেন, নারী রক্তে তাঁর হাত রঞ্জিত হয়েছিল। কিন্তু এ রকম অবস্থায় পড়লে সকলেরই একই পথে চলতে হতো—নারী হত্যা করতে হতো। কেননা, মস্তিষ্ক তখন প্রকৃতিস্থ থাকে না। তোমার বাপ দেবতাই ছিলেন মা, তাঁর চরিত্রে প্রথমটায় দানবীয় শক্তির বিকাশ হলেও শেষটায় তিনি নিজেকে সামলাতে পেরেছিলেন, তোমার প্রতি তাঁর অসীম স্নেহই তাঁকে আবার সুপথে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। তাঁকে তুমিও অপরাধী করো না মা। শেষজীবনটা তিনি কেবল প্রার্থনাতেই কাটিয়ে গেছেন, অনুতাপে তাঁর হৃদয় জর্জ্জর হয়েছিল, তাঁর লেখা পড়ে তাকি তুমি বুঝতে পারনি ?

“আঃ, তাই বলুন ডাক্তার কাকা, এতটুকু সান্ত্বনা আমায় দিন, আমার বাবা তাই ছিলেন—তিনি দেবতাই ছিলেন। আমি তাঁর কোনও দোষ দেখতে চাইনে, আমি চাই তাঁকে যেমনভাবে আমি দেখেছিলুম ঠিক তেমনিটী দেখতে, তেমনিটী পেতে। বাবা আমার বড় অভাগা ছিলেন ডাক্তার কাকা, জীবনে কখনও তিনি শান্তি পাননি। তাই দেখতে পেতুম, বাবা পূজো করতে বসতেন, তাঁর পূজোর ফুল চন্দন যেমন তেমনই পড়ে থাকত,—চোখের জলে নারায়ণের পূজো করে তিনি উঠে পড়তেন। বাবা আমার দিন রাত তুষানলে পুড়েছেন, তবু আমায় দেখলে তাঁর মুখে হাসি আর ধরত না। বলুন ডাক্তার কাকা, তাই বলুন—যাকে আমার জীবনের সামনে আদর্শরূপে আমি পেয়েছিলুম, তিনি দেবতাই ছিলেন, তিনি প্রবঞ্চনা করে আমার ভক্তি লুটে নেন নি।”

ডাক্তার গুপ্ত তাহার চোখের দরবিগলিত অশ্রুধারা নিজের রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিয়া ধীর কণ্ঠে বলিলেন "হ্যাঁ মা, পরে তিনি যথার্থই মানুষ হতে পেরেছিলেন, যথার্থ মনুষ্যত্ব তাঁর মধ্যে বিকশিত হতে পেরেছিল। স্বপন, তুমি এত অধীর হয়ে পড়ছ কেন, একটু শান্ত হওয়ার চেষ্টা কর না মা।"

স্বপন ভাঙ্গা সুরে বলিল "শান্ত কি করে হব কাকা? যার একসঙ্গে সব যেতে বসেছে সে শান্ত হবে কি করে? আমার জমিদারী যায় যাক, আমি গাছতলায় পড়ে থাকব, ভিক্ষা করে খেতেও রাজি আছি, সে কষ্টকে আমি কষ্ট বলে মনে করিনে,—তাকে আমি যাওয়া বলে মনে করতে পারিনে। এই যে আমার যথার্থ যাওয়া ডাক্তার কাকা—আমি যে একটী নিমেষে আমার আসল যা জিনিস আমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেললুম।"

অনেক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার দৃষ্টি পড়িয়া ছিল দগ্ধ চিত্রের ছাইগুলার পানে।

তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া ডাক্তার গুপ্তও সেই দিকে চাহিলেন, ধীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, শিক্ষিতা তুমি কিন্তু শিক্ষার প্রধান গুণ যে সহ্যশীলতা তা তোমার নেই। এই যে কাণ্ডটা হঠাৎ করে ফেললে— এই ব্যাপারে বাড়ীর ঝি চাকর গুলো, কর্ম্মচারীগুলো নিজেদের মধ্যে বেশ একটা জটলা করে বসবে—ওরা এমনি ছুতোই তো চায়। যা তোমার মনে আছে তা মনেই থাক—লোককে এতটুকু সন্দেহ করবার অবকাশ দিয়ো না। আজ ঝোঁকের বশে যে কাজ করে ফেলেছ আর কখনও এ রকম কাজ করো না, তোমায় সতর্ক করে দিচ্ছি। এরকম ব্যাপারে লোকের মনে কৌতূহলই উদ্দীপ্ত করে দেবে। তারা

গোপনে জানবার চেষ্টা করবে, কেন তুমি এ রকম কাজ করছো। বুড়োর কথায় কান দাও মা, উড়িয়ে দিয়ো না। বুড়োরা অনেক দেখে শুনে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যে কাজ করে সেটা ভেবে চিন্তেই করে' থাকে—তোমাদের মত চট করে' করে ফেলে না।"

স্বপনের চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহার লজ্জিত মুখে একটু হাসি ভাসিয়া উঠিল মাত্র। সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, আর কখনও সে এ রকম করিয়া লোকের সন্দেহ জাগিবার সুযোগ দিবে না।

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, "তুমি দুদিন আমার বাড়ী গিয়ে থাকবে চল মা। কাল পুরী যাওয়ার কথা ছিল, সে এখন থাক, এ রকম মনের অবস্থায় একা তোমার কোথাও থাকা উচিত নয়, আমিও যেতে দিতে পারিনে। তোমায় নিয়ে যাবেন বলে তোমার কাকিমা আজ আসছিলেন। আমি বলে এসেছি তোমায় নিয়ে তবে বাড়ী যাব। জ্যোৎস্নাও শ্বশুরবাড়ী হতে কাল এসেছে, তোমার কাছে আসবার জন্যে সেও ছট্‌ফট্ করছে। চিরটাকাল একসঙ্গেই তো কাটিয়েছ মা, এখন না হয় দু পাঁচ দিন আমার ওখানে গিয়েই থাকলে! বল মা, যাবে আমাদের বাড়ী?

স্বপন শুধু বলিল, "আজ থাক ডাক্তার কাকা।"

ডাক্তার গুপ্ত একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি আজ থাকবে কেন, আজ তুমি একা ঘরে পড়ে কাঁদতে চাও—কেমন? কিন্তু এ সুযোগ তোমায় আমি দিতে পারিনে মা, আমি তোমায় জোর করে আমার বাড়ী নিয়ে যাবই। এ রকম অবস্থায় এ বাড়ীতে একা থাকা তোমার উচিত নয়, আমাদের বাড়ীতে ওদের সঙ্গে মিলে মিশে অনেকটা ভাল থাকবে।"

স্বপন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আজকের দিনটা আমি ভাবতে চাচ্ছিলুম কাকা, বেশ—আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়ীতেই যাচ্ছি, একটা কথা আছে—"

ডাক্তার গুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা বল ?"

স্বপন বলিল, "আমি বাবার সব দেনা শোধ না দিয়ে কোথাও যাব না ; আমার ট্রাষ্টি যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের ব'লে দেবেন, খুব তাড়াতাড়ি করে আমার বাবার দেনা যেন শোধ দেওয়া হয়, আর বেশী দিন ফেলে রাখতে চাই নে। আমার জমিদারী, বাড়ী সব বিক্রী করে দেওয়া হোক—দেনা আগে শোধ হয়ে যাক, আমি নিশ্চিন্ত হই—আমার বুকরে বোঝা নেমে যাক। আমি শুনেছি—পড়েছি, ঋণগ্রস্ত লোকের আত্মার গতি হয় না, সে কিছুতেই মুক্তি পায় না, হাহাকার করে ফেরে। বাবার দেনা যতদিন শোধ না হবে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে না। আমি আমার জমিদারী রক্ষা করতে চাই নে—আর এও জানা কথা—দেনা শোধ করতে সব বিকিয়ে যাবেই। আপনি সব ঠিক করবেন তো ডাক্তার কাকা, বলুন ?"

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, "এ তো করতেই হবে মা। অনন্ত বোস নালিশ করেছে—তার দেনা এখন সুদে আসলে অনেক হয়েছে, সময় যেতে আর একমাস মাত্র দেরী রয়ছে। হরেনবাবু তাকে সাফ জবাব দিয়েছেন নালিশ করতে, সেও নালিশ করেছে।"

স্বপন মলিন হাসিয়া বলিল, "সবই যাবে, এ বাড়ীও যাবে,—আমি তখন—"

বাধা দিয়া গভীর স্নেহের সুরে ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, "আমি তো হরেনবাবু নই মা, আমার কাছে তুমি থাকবে। কতদিন আমার কাছেই

তো ছিলে, তোমার বাবা বিশ্বাস করে আমার কাছে তোমায় রেখেছিলেন। তোমার অসময়ে সকলে তোমায় ত্যাগ করলেও আমি তোমায় ত্যাগ করব না। আমার জ্যোতির এক কোল, তোমার এককোল সে কথা কি ভুলে গেছ স্বপন ?"

স্বপনের চোখ দিয়া দুটি ফোঁটা জল উছলাইয়া হঠাৎ পড়িয়া গেল, সে নত মুখে গভীর সুরে বলিল, "ভুলি নি ডাক্তার কাকা, জানি এককোল আমারই আছে, এ কোল আমি সম্পদে বিপদে কখনই হারাব না।"

একটু নীরব থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠামশাই এখন আসবেন না কি ?"

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, "তাঁর কথা ছেড়ে দাও মা, সংসারের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই নেই। তিনি এসেছেন কতকগুলি বিমুখ চিত্ত ফিরিয়ে আনতে, ভগবানের কাজ করতে—তাই করে যাচ্ছেন। মায়ার সম্পর্ক তাঁর কারও সঙ্গে নেই। যখন যার কাছে আসেন সে তখন একান্ত ভাবে তাঁকে পায়, দূরে গেলে তার কথা তাঁর আর মনে থাকে না, তখন আবার নূতন নিয়ে ব্যস্ত হন। তোমার কাছে যখন এসেছিলেন, তখন তাঁকে পেয়েছিলে শিশুর মত সরল অথচ জ্ঞানদীপ্ত—তোমারই নিজস্ব করা জ্যেঠামশাইরূপে। তখন তাঁকে যা বুঝিয়েছ, যা শুনিয়েছ, তাই বুঝেছেন, তাই শুনেছেন—এখন তাঁর সে মূর্ত্তিতে দেখতে পাবে না। এখন তিনি সিংহের মত দীপ্ত, একটী কোনও স্বতন্ত্র লোকের কথা তিনি ভাবেন না, এখন তিনি সকলের,—কারও নিজস্ব করা নন।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বপন বলিল, "তিনি এলে আমি বাঁচতুম কাকা, সব ব্যথা ভুলে যেতুম, এ সব কোনও কথা মনে হতো না।"

"তিনি মহাপুরুষ মা, তাঁর কথা আলাদা, কোথাও কিছু নেই এক-দিন হয়তো আচমকা এসে পড়বেন। এখন তুমি ওঠো মা, আমার গাড়ী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমায় বাড়ীতে রেখে আমি কলে যাব। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমার রোগীরা এতক্ষণ ব্যস্ত হয়ে উঠছে।"

"হ্যাঁ চলুন," বলিয়া স্বপন উঠিয়া দাঁড়াইল।

২১

প্রভাত আশায় আশায় প্রবাসের দিনগুলা কাটাইয়া দিত, স্বপনের একখানি পত্র নিশ্চয়ই সে পাইবে। বিলাতে থাকিতে স্বপনের পত্র সে পাইয়াছে, আর এই দেশে থাকিয়াও সে তাহার পত্র পাইবে না, এ অসহ্য। হরেনবাবুর পত্রে সে শুনিতেছিল, স্বপনের বিষয় সম্পত্তি আর থাকে না। সে তাহার দেনা শোধ করিয়া দিবার জন্য ট্রাষ্টির হাতে বিষয় দিয়া কলিকাতায় ডাক্তার গুপ্তের বাটীতে রহিয়াছে। জানা যাইতেছে, দেনা শোধ করিতে তাহার গ্রামের বাটী, কলিকাতার বাটী সবই বিক্রয় হইয়া যাইবে। হরেনবাবুর একান্ত ইচ্ছা তিনি প্রভাতের নামে অন্য কাহাকেও দিয়া এই বিষয় ও বাড়ী দুখানি ক্রয় করেন। তিনি নিজে কিনিতে গেলে, লোকে কথা কহিতে পারে। কেননা, তিনি বহুকাল জানকীনাথের ম্যানেজার ছিলেন এবং স্বপনের ট্রাষ্টি তিনিই হইয়াছেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রভাত ভাবিতেছিল, স্বপন তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে নাই, কিন্তু একি সত্যই গুরুতর অপরাধ? সে নিজেও তো স্বীকার করিয়াছে, ভালবাসা মানুষের হৃদয়ের ধর্ম্ম, ইহার

জন্য মানুষকে অপরাধী করা যায় না। তবে—তবে সে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না কেন, কেন তাহাকে একখানা পত্র দিল না? এই সহজ সরল একখানি পত্র পাইলে প্রভাত যে নিঃসন্দেহ হইতে পারিত।

সেদিন রবিবার ছিল, কোর্টে যাইতে হয় নাই, আহারাদি সমাপ্তে প্রভাত একখানা বই লইয়া সময়টা কাটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বসিতে-ছিল, সেই সময় তাহার আর্দ্দালি সসম্ভ্রমে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া টেবলের উপর একখানা পত্র রাখিয়া গেল।

এনভেলাপের উপর মেয়েলি অক্ষরে ঠিকানা লেখা, এ যে স্বপনের হাতের লেখা নয়, তাহা প্রভাত দেখিয়াই বুঝিয়াছিল। মিনুর নয় তো? হাঁ, মিনুরই বটে। প্রভাত অনেককাল তাহার হাতের লেখার সঙ্গে অপরিচিত, অতীতের কথা মনে করিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া খানিক কোনদিকে চাহিয়া রহিল।

মনের গুরুভার একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে কতকটা হালকা করিয়া ফেলিয়া সে পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুদীর্ঘ পত্র সে, মৃন্ময়ী তাহার যত গোপন ব্যথা সব আজ স্নেহময়-চিত্ত মামার কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। এ জগতে আসিয়া সে মনের কথা কাহাকেও বলিতে পারে নাই, প্রভাতের সহানুভূতি পাইয়া তাহার জমাট ব্যথা গলিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—

মামা—

তোমার অনুযোগপূর্ণ একখানি পত্র পেয়েছি। আমি তোমার ওখানে পত্র দেই নি বলে তুমি রাগ করেছ, দুঃখ করেছ। বাবা মা তোমায় পত্র দেন, তুমি যে পত্র দাও সে পত্রও আমি দেখতে পাই।

সব খবরই তুমি পাচ্ছো জেনে আমি আর তোমায় আলাদা পত্র দেই নি। আর আমার মনের অবস্থাও বড় খারাপ মামা, জানি নে, সে সব খবর তুমি পেয়েছ কিনা ; একে একে সব আমি জানাচ্ছি, প্রথম তুমি যা যা লিখেছ তার উত্তর আগে দেই। তুমি যে আলাদা আমায় পত্র দিয়েছ সে কথা আমি বাবা মা কাউকেই জানাই নি, জানাবার দরকার দেখি নি।

স্বপনদি'র কথা জানতে চেয়েছ ; কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে তার একদিন মাত্র দেখা হয়েছিল। স্বপনদি এখন ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীতে আছেন। আমি এখানে এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা মাকে বলেছিলুম, মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন দেখে আর কোন দিনই দেখা করার কথা বলি নি।

আমি জোর করতে পারি নি মামা, সে সাহস আমার নেই। একদিন আমি বাপ মায়ের শাসন বিরক্তি উপেক্ষা করে ঠাকুরদার কাছে গিয়েছিলুম, সে কথা আজ ভুলে গেছি অথবা জোর করেই ভুলতে হয়েছে।

মায়ের বিরক্তি দেখলেও আমার ব্যাকুলতা যায় নি। গ্রামে থাকতে এবার আমি একদিনও স্বপনদির দেখা পাই নি। কতদিন যাওয়ার কথা বলেছিলুম, মা যেতে দেন নি, অথচ নিজে তিনি কয়দিনই গিয়েছিলেন। তাঁর মনে সর্ব্বদাই ভয় ছিল, পাছে আমি কোনও গোপন কথা স্বপনদিকে বলে ফেলি। আমাকে তাঁরা এতটুকু বিশ্বাস করেন নি। স্বপনদিকে তাঁরা পান নি, কেমন করে স্বপনদি তাঁদের হাত এড়িয়ে চলে গেছেন। তাঁর উপদেশ শুনে আমি আরও বেঁকে বসি তাই তাঁদের সদাই ভয়। তাঁদের মনের ধারণা জন্মেছে স্বপনদির পরামর্শেই আমি এ রকম

হয়েছি। বড় ব্যথা বুকে বাজে মামা—মা-বাপের এ রকম নীচ অন্তঃকরণ দেখে ;—কিন্তু থাক সে কথা—সে সব পরে হবে, এখন যা বলছি তাই বলে যাই।

একদিন আমার এক বাল্যসখী আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল, তাদের বাড়ী ঠিক ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীর পাশেই। তুমি তো জান মামা, আমি কোথাও নিমন্ত্রণে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি ; এ নিমন্ত্রণ সাগ্রহে নিলুম, এই সুযোগে স্বপনদির সঙ্গে দেখা হবে, মা জানতে পারবেন না। প্রতারণা করেছি, কিন্তু ইচ্ছাকৃত ঠিক বলা যায় না, এতে বোধ হয় পাপ হবে না।

আমার বাল্যসখীকে আমার অভিপ্রায় জানাবামাত্র সে অবাক হয়ে গেল। সে জানে না স্বপনদিকে আমি চিনি, তাকে আমি এত ভাল-বাসি। দেখলুম তারা স্বপনদিকে দেবীর চোখে দেখে। সে নিজে আমায় সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

ডাক্তার গুপ্তের মেয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, সে আমায় স্বপনদির ঘরে নিয়ে গেল। দরজার 'পরে দাঁড়িয়ে আমি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখতে পেলুম। আমি কখনও স্বপনদির এমন মহিমময়ী মূর্ত্তি দেখি নি। তাই অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম। একখানা আসনে সে বসে', তার মাথার চুলগুলো পেছনে মাটীতে লুটোচ্ছে, পরণে তার এক-খানা গরদের শাড়ী, যেন তার শুভ্র মনের ভাবটা বাইরে ফুটে বার হচ্ছে। তার হাতে একখানা বই, সে পড়ছে—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥

দেখছিলুম তার মুখে তখন যে ভাবটা ফুটে উঠছে, তা এ পৃথিবীর

নয়, আমি তেমন জ্যোতি কারও মুখে কখনও দেখতে পাই নি। শুনেছি স্বর্গের অধিবাসীদের স্বর্গীয় দীপ্তি বিকশিত হয়—এই কি তাই?

দেখলুম স্বপনদি আর সে স্বপনদি নেই। সে এখন অনেক দূরে সরে গেছে, তার নাগাল পাওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। বুক ফেটে আমার কান্না এলো। আমার সে স্বপনদিকে এ বেশে সাজাল কে, এ উদাসীনতা দিল কে, সে কি আমার বাবা নয়? বাবা যদি প্রথম হতে দেখতেন, তা হলে জমিদারী রক্ষা হতো, দেনার দায়ে সব বিকিয়ে যেত না, স্বপনদিকে পরের বাড়ীতে বাস করতে হতো না।

এই যোগিনীর সমাধি ভাঙ্গতে পারলুম না, এই সময়টুকু স্বপনদি শান্তিতে থাকে, তার সে শান্তিটুকু কেড়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি হলো না। আস্তে আস্তে ফিরতে গিয়ে কি একটা জিনিসে পা লেগে শব্দ হওয়ায় স্বপনদির ধ্যান ভেঙ্গে গেল, সে চোখ মেলে তাকালে।

আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমার কপালে একটা চুমো দিয়ে সে বললে, "তুই চলে যাচ্ছিলি মিনু, এতখানি এসে একটা কথা না বলে—আমায় দেখা না দিয়ে চলে যেতে পারতিস্ তুই? আচ্ছা স্বার্থপর তুই বটে, তোর নিজের দেখা হয়ে গেল, সম্পর্ক ফুরিয়ে গেল—কেমন?

আমি তার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকিয়ে ফেললুম, চোখের জল আর রাখতে পারলুম না, আমার অজ্ঞাতে ঝর ঝর করে ঝরে পড়তে লাগল।

এর পর কথায় কথায় তার সর্ব্বস্ব যাওয়ার কথা উঠল, আমি বাবার সব কথা বলে ফেললুম, বললুম, "বাবা যদি আগে চেষ্টা করতেন স্বপন দি, তা হলে আজ তোমায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে উদাসিনী সাজতে হতো না।"

স্বপনদি একটু হেসে আমার মাথায় হাতখানা বুলিয়ে দিতে দিতে

বললে, "দূর পাগলী, ও একটা কথার কথা রে—আর কিছু নয়। কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না, কেউ কারও কিছু নিতে পারে না। দেওয়া নেওয়ার কর্ত্তা সেই একজন রে—যিনি আমার হাতে এই অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়েছিলেন, আবার অযোগ্যতা বুঝে নিজেই কেড়ে নিচ্ছেন। তোমার বাপের দোষ দেখো না মিনু। লোকের কথা শুনে দেবতা বাপকে অপরাধী করো না। তিনি দুরদৃষ্ট বশতঃ জড়িয়ে পড়েছেন বলেই অকারণ একটা মিথ্যে কলঙ্ক ঘাড়ে নিচ্ছেন। জগতে নিত্যকার ঘটনা এ—কেউ বা আজ কোটিপতি হচ্ছে, কেউ বা পথের ভিখারী হচ্ছে, এর জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় কি ভাই? জগৎটা মরে রয়েছে, এর মধ্যে জীবন্তের খেলা তিনিই দেখিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কেমন ছোটবেলায় পুতুল নিয়ে খেলেছি, আমাদের নিয়ে তেমন করে তিনিও খেলাচ্ছেন পাগলী। এত-টকু বুঝবার জ্ঞান করতে হয়, এ সব ব্যাপারের জন্যে কাউকে দোষী করা সাজে না—নিজেকেও অভিভূত করে রাখা সাজে না।"

অবোধ আমি, তার এই জ্ঞানপূর্ণ কথাগুলো শুনেও জ্ঞানহীনার মত জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা দিদি, এই যে তোমার সব যাচ্ছে এর জন্য তোমার কি এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না? তুমি কেমন করে কোন্ মুখে এমন প্রশান্ত হাসি হাসছ—সব বিসর্জ্জন দিয়ে, আমি কেবল তাই ভাবছি। কোথায় এক দিন ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে ছিলে—হঠাৎ গড়িয়ে কোথায় এসে পড়লে—একেবারে পথের ভিখারিণী হয়েছ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ সব কেমন করে সহ্য করলে স্বঁপনদি?"

স্বপনদির মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য মলিন হয়ে গেল, বাতাসে দীপশিখা আন্দোলিত হয়ে মুহূর্ত্তের তরে বিমলিন হয়ে আবার যেমন দ্বিগুণবেগে জ্বলে ওঠে, তার সেই মুখখানা তেমনিভাবে জ্বলে উঠল। ধীর স্বরে সে

বললে, "ওরে, এর চেয়ে কত বড় ক্ষতি আমি সহ্য করেছি, কত বড় আঘাত বুকে ধরেছি তা যদি জানতিস। আমার এ জীবনে এতটুকু লাভ হয় নি রে, একটানা লোকসানই কেবল চলেছে। এতটুকু সান্ত্বনা আমার ছিল না, তারপর ভগবান্ নিজেই আমায় সান্ত্বনা দিলেন। বুক-খানা একেবারে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল রে, বিষয় যাওয়ার জন্য নয়—অন্য কারণে, দাঁড়াবার সামর্থ্য মোটে ছিল না, সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলো আবার সাজাতে হয়েছে, আবার গায়ে বল করে দাঁড়াতে হয়েছে। প্রথমটার এতটুকু ধাক্কাও বেশী হয়ে লাগে, ক্রমে সবই সয়ে যায়, আঘাত সইতে সইতে মানুষ পাথর হয়ে যায়, নইলে বুকের ধন একটি-মাত্র ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়েও মা কখনও বেঁচে থাকতে পারে? আমি সব দিয়ে আশার পথে একটী জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি বোন, এ জিনিষ কিছুতেই খোয়া যাবে না, কেউ কখনও নিতে পারবে না, এর নাম জ্ঞান। বড় ব্যথাই পেয়েছিলুম—সান্ত্বনা পেলুম, জানলুম এ জগতে কেউ কার' নয়, কারও কিছু থাকে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর মিনু, আমার এ হাসি যেন অটুট থাকে, আমার পবিত্রতা যেন বজায় থাকে।"

আর কথা বলতে পারলুম না, স্নেহে ভক্তিতে আমার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। আমি তার দুটি পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললুম, "আমায় আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমার সকল বিপদের অবসান হোক।"

মামা, স্বপনদি সত্যই এখন আর একলোকের জীব হয়েছে, সে যে জীবন পেয়েছে, সেই জীবনই মানুষের প্রার্থিত সত্যজীবন। সত্যই সে সব হারিয়ে আসার পথে যে জিনিষ পেয়েছে তা তাকে পৃথিবীর

তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের চেয়েও বেশী সম্পদ দান করেছে। আমি এখন বুঝেছি সে নিজেকে নিজের বিবেক দিয়ে বশীভূত করে নিজের মিত্র হয়েছে, সে অবিবেচনার বশে চলে নিজেকে নষ্ট করে নি, সে মুখস্থ গীতা-পাঠ করে নি, তার সারা অন্তর ঢেলে দিয়ে গীতাপাঠ করেছে।

কথায় কথায় তোমার কথা উঠে পড়ল, আমি গোপন করে রাখতে পারলুম না, তুমি বলেছ বিয়ে করবে না, এমনি ভাবে জীবনটা তোমার কাটিয়ে দেবে। স্বপনদি খানিক চুপ করে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "এইটাই আমার বড় কষ্ট রইল, আমি প্রভাতদার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করে দিতে পারলুম না। আমি কখনও চাইনি কেউ আমার এই ক্ষণস্থায়ী দেহটার মোহে মুগ্ধ হয়ে আমায় ভালবাসে, আমার জন্যে কেউ এতটুকু ত্যাগ করে, এখনও তা চাইনে। জানি আমি—আমার মনের ভাব জেনে তিনি তাঁর মনের ভাব ফিরিয়ে নেছেন, আমায় পেতে চান না, তবু যখন তাঁর কথা ভাবি—তাঁর কতটা সুখ আমি নষ্ট করেছি সেই কথা মনে করি, তখন যেন পৃথিবীতে থাকতে আমার আর ইচ্ছা করে না। আমি চাই নে কেউ আমার জন্যে এতটুকু ক্ষতি স্বীকার করে। সকলের ভাল হোক, সংসারী সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করে যাক, আমার অদৃষ্টের সঙ্গে কেউ যেন অদৃষ্ট মিশাতে না আসে।"

স্বপনদি তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়; আমায় বলে দিয়েছে, যখন তুমি বাংলায় ফিরবে, তখন তার সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা করো। স্বপনদি আর কারও সাহায্যের প্রত্যাশিনী নয়। কেননা, সে একটানা দিয়েই চলেছে, যদি কিছু আটক কোরে রাখার প্রয়োজন তার হতো তা হলে সাহায্যের আবশ্যক হতো।

আমার বড় ইচ্ছা মামা, আমিও স্বপনদির মত উচ্চ জীবন লাভ করি, কিন্তু আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তুমি বলছো, আমি যেন স্বপনদির আদর্শ নেই। হায়রে এখানকার কথা জানো না বলেই বলতে পেরেছ। আমি যে কতদূর দীনভাবে জীবন যাপন করছি, তা তুমি জান না মামা!—বেচারী কমলা—আহা, তার কথা ভাবতে আমার বুক ফেটে যায়, আমার চোখে জল আসে ; আমার এ দুঃখপূর্ণ জীবনে সঙ্গিনী ছিল সে, মা তাকে আজ মাসখানেক হল তাড়িয়ে দিয়েছেন। এতদিন পরে তাঁর সন্দেহ হয়েছে কমলার পরামর্শেই আমার অধঃপতন হচ্ছে, আমি হিন্দুয়ানীকে আঁকড়ে ধরছি। আমার সামনেই মা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন, কাঁদতে কাঁদতে সে তার দেশে চলে গেল।

সেইদিন হতে আমি নিঃসঙ্গ। কেউ নেই যে আমার সঙ্গে আমার হয়ে দুটি কথা বলে, অসহ্য যাতনায় বুকটা আমার ফেটে গেলেও—কেউ নেই যার কাছে একটা কথা বলতে পারি।

কেন মামা—কেন আমার বিয়ে দেবার জন্যে মা বাবা এত ব্যগ্র? তাঁরা সকলকে জানিয়েছেন আমি কুমারী। বেশ কথা, কুমারী হয়েই আমায় থাকতে দিন, আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে কেন তাঁরা এ রকম করছেন? পাগলামী—আমার না তাঁদের?

মামা, জগতে তুমি আমায় যাথার্থ স্নেহ কর। যথার্থ ভালবাস। তাই তোমার কাছে অসঙ্কোচে সব কথা বলে যাচ্ছি। বেশী পীড়াপীড়ি করলে কেউ আমায় পাবে না। আমার সতীধর্ম্মকে অটুট রাখতে বাধ্য হয়ে আমায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে। জীবন থাকতে দ্বিচারিণী হতে পারব না। আমি বিলাসিনী মায়ের মেয়ে হতে পারি, দ্বিচারিণী মায়ের

মেয়ে নই। মা আমার অত্যধিক স্নেহের খাতিরে এ কথাটা ভুলতে পারলেও আমি ভুলি নি।

যে দেশের মেয়ে স্বামীর শব বুকে নিয়ে হাসতে হাসতে জ্বলন্ত চিতায় উঠত, আমি সেই দেশের মেয়ে। যে দেশের মেয়ে স্বামী নিন্দা শুনে জীবনত্যাগ করেছিল, যে দেশের মেয়ে মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিল, যে দেশের মেয়ে স্বামীর আজ্ঞায় আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল, আমি সেই দেশের মেয়ে। এ দেশের মেয়েদের সতীধর্ম্ম মজ্জাগত, এ দেশের মেয়েরা ছোটবেলায় বিবাহিতা এবং বিধবা হয়েও সারাজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে কাটিয়ে দেয়। আমি কেন পারব না মামা? স্বামী যদি কখনও আসেন তাঁকে পাব, যদি না আসেন সারাজীবন এমনিই ভাবে কাটিয়ে দেব। এতে যদি পীড়ন হয়, আমার সতীধর্ম্ম পালনার্থে আমায় মরতেই হবে।

আজ বিদায় নিচ্ছি মামা, জানি তুমি আমার পত্রের কথা প্রকাশ করবে না, তবুও আবার সাবধান করে দিচ্ছি, এর বিষয় উল্লেখ কর না।

আমার প্রণাম নাও। আশীর্ব্বাদ কর যেন অটুট থাকতে পারি।

তোমার স্নেহের—মিনু।

২২

দিন কত ডাক্তার গুপ্তের বাড়ী কাটাইয়া স্বপন প্রস্তাব করিল, সে একবার দেশে যাইবে।

এই কয়েকটা দিন আগে ডাক্তার গুপ্ত দিন পাঁচেকের ছুটি লইয়া তাঁহার দেশের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেখানে আবশ্যকীয় কয়েকটা কাজ সারিয়া আজ তিন চার দিন হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বপনের কথা

শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তা হলে আগে কেন মা আমার সঙ্গে গেলে না, যখন আমি সেখানে গেলুম ?"

স্বপন বলিল, "কাল মাসীমার একখানা পত্র পেয়েছি কাকা, তিনি একটীবার একদিনের জন্যে আমায় সেখানে যেতে বলেছেন। আমারও সেখানে একবার যাওয়ার বড় ইচ্ছা আছে কাকা। হয়তো আর দেখতে পাব না। বাড়ীটা বিক্রি হয়ে গেলে সেখানে আর যাব না, একটা দিনের জন্যে—"

তাহার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে ব্যথিত ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, "না না মা, তোমার ইচ্ছা হয়েছে, একবার ঘুরে এসো, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।"

ডাক্তার-পত্নী বলিলেন, "রমেনকে সঙ্গে নিয়ে যাও স্বপন, সে সব দিকে আছে। কিন্তু মা, দুদিনের বেশী সেখানে থাকতে পাবে না, দুদিনের পরেই তোমায় ঘুরে আসতে হবে বলে দিচ্ছি।"

রমেন ছেলেটী বি-এ পড়িতেছিল, উপস্থিত তাহার পূজার ছুটি আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে বলিবামাত্র সে আনন্দের সহিত সম্মত হইয়া গেল এবং প্রচুর উৎসাহে চট্‌পট্ নিজে প্রস্তুত হইয়া লইল। এখন কেবল স্বপনদি প্রস্তুত হইলেই হয়।

ডাক্তার গুপ্তের মোটরখানা চলিল, ঠিক স্বপনের আজন্ম পরিচিত বাড়ীখানির পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া। এ বাড়ীখানি মাস খানেক আগে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, হরেনবাবুর দূর সম্পর্কীয় এক ভগিনীপতি এ বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও হরেনবাবুর পরিবারবর্গ উপস্থিত এই বাড়ীতেই রহিয়াছেন।

এই বাড়ীখানির পানে চাহিয়া স্বপনের মনে সব কথা ভাসিয়া

উঠিল। এই সেই বাড়ী, জ্ঞান হইয়া অবধি এই বাড়ীখানাকেই সে দেখিয়াছিল। ইহার প্রতি কক্ষ, বারান্দা, বাগানের গাছ-লতা সব তাহার চিরপরিচিত। তাহারা সব যেমন তেমনিই আছে, যাহাকে তাহারা একদিন সায়াহ্নে বিদায় দিয়াছিল, সেই কেবল আজ সেখানে প্রবেশলাভে বঞ্চিতা।

সংযতচিত্তা স্বপন মুহূর্ত্তের জন্য সংযম হারাইয়া ফেলিল, একবার বাড়ীখানার দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত্তের দৃষ্টি ইহার কক্ষ বারান্দা দরজা জানালা প্রভৃতির উপর বুলাইয়া সে চোখ ফিরাইয়া লইল, জল যে চোখে আর থাকিতে চাহিতেছে না!

এই বাড়ীর দ্বিতলের ঐ কক্ষটিতে তাহার পিতা—এই বাড়ীর অধিকারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখনও সেই শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপনের কথা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার বদ্ধদৃষ্টি স্বপনের মুখের উপর সংবদ্ধ ছিল। তিনি ঠিকই জানিতেছিলেন স্বপনের সব যাইবে, স্বপনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহার চোখের কোণ বহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবুও হয় তো তাঁহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল, সব গেলেও স্বপন ভিটাচ্যুত হইবে না, পরের বাড়ীতে কোন রকমে তাহাকে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে না। হইতও তাই, যদি হরেনবাবু এরূপ একটা কুচক্র না করিতেন, অ্যাটর্নি এরূপভাবে তাঁহার সাহায্য না করিতেন। একমাত্র ডাক্তার গুপ্ত ও ভবানীপ্রসাদ স্বপনের হিতকাঙ্ক্ষী, কিন্তু কোথায় ভবানীপ্রসাদ? ডাক্তার গুপ্ত একা কতদিক সামলাইয়া উঠিবেন?

রমেন স্বপনের মনোভাব বুঝিয়াছিল। সর্ব্বস্বত্যাগ করিলেও তাহার হৃদয়ের যে স্থানটী এখনও কাঁচা ছিল সেখানে আঘাত লাগিয়া

তোলপাড় করিয়া দিয়াছে। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখুন স্বপনদি, সংসারে এসে মানুষ চেনা বড়ই দুষ্কর। কথায় বলে মানুষের সঙ্গে খুব বেশী রকম ঘনিষ্ঠতা না করলে তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় না; তা হলে আপনি যে হরেনবাবুর কাছে বরাবর বাস করে এসেছেন, সত্যিকার পরিচয় তাঁর পান নি কি?"

স্বপন মুখ ফিরাইয়া তাহার পানে চাহিল, "হ্যাঁ, কতকটা পেয়েছিলুম বই কি।"

রমেন বলিল, "পরিচয় পেয়েও তাঁর 'পরে এতটা নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন?"

স্বপন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, মলিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "বলতে চাও বড় বোকামীর কাজ করেছি? অবশ্য বোকামীর কাজ বই কি, বাধ্য হয়ে তাই আমায় করতে হয়েছে। জানতুম না জগতে কেউ আমার যথার্থ হিতৈষী আছে, বিশ্বাসঘাতকতা দেখে আমি সকলকেই অবিশ্বাসী মনে করেছিলুম। মিথ্যা কথা বলব না, ডাক্তার কাকাকেও আমি আগে বিশ্বাস করতে পারি নি। যাক এখন সে সব কথা রমেন, অতীতকে খুঁচিয়ে রক্তমাখা করে তোলবার আজ আর আবশ্যকতা নেই; বর্ত্তমানকে নিয়ে চলছে তাই চলুক। ওই যে কথাই রয়েছে—যা আসছে আসুক—যা যায় যাক, তাতে ক্ষতি ভাববার কি অধিকার আছে আমার, কেননা আমিও তো আসা-যাওয়ার পথের যাত্রী। ও সব কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমার আর শুনতে ভাল লাগে না।"

রমেন একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দেশে যাওয়ার আপনার তো কোন দরকার নেই, তবে—"

একটু হাসিয়া স্বপন বলিল, "দরকার নেই বটে, এখনও আমার নিজের কাজ আছে সেখানে—গেলেই দেখতে পাবে।"

সন্ধ্যার পরে উভয়ে ট্রেণ হইতে নামিল।

চার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা স্বপনের মনে পড়িয়া গেল, সে দিন সে প্রথম এই ষ্টেশানে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অনাবিল জ্যোৎস্নার আলোকে সে দিন সমস্ত গ্রামখানা হাসিতেছিল, কোথায় বসিয়া পাপিয়া গান গাহিতেছিল। আজ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি থাকিলেও চাঁদ ক্ষণেকের তরে আকাশে ভাসিয়া নামিয়া গিয়াছে, চারিদিক নিকষ-কালো অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। আজ দূরে গাছের পাতার মাঝে পাখীর গান ছিল না, ষ্টেশানে অভ্যর্থনাকারী জনগণের কোলাহলও ছিল না। হরেনবাবু আজও এখানে আছেন, দিন পাঁচ ছয় পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিবেন। স্বপনের সঙ্গে অনেককাল তাঁহার পত্রের আদান প্রদান ছিল না, তাঁহার পত্রাদি ডাক্তার গুপ্তের কাছে যাইত। স্বপন হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে, ডাক্তার গুপ্ত একখানি টেলিগ্রাফ করার কথা বলিয়াছিলেন, স্বপন তাহাতে আপত্তি তুলিয়াছিল, কাজেই টেলিগ্রাফ করা হয় নাই।

পল্লীগ্রামের জমাট-বাঁধা নিকষ-কালো অন্ধকারের পানে চাহিয়া আবাল্য কলিকাতায় প্রতিপালিত রমেন চমকাইয়া উঠিল, "উঃ, এই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে পথ চলবেন দিদি?"

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার কিন্তু বড় কষ্ট হবে রমেন।"

"আর আপনার হবে না বুঝি? আমার পায়ে তবু জুতো আছে, আপনার পা যে খালি। কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বেন তা স্পষ্টই জানা যাচ্ছে। শুনেছি পাড়াগাঁয়ের পথ উঁচু নীচু, খোয়া তোলা অথবা কাঁচা—"

স্বপন বাধা দিয়া বলিল, "উঁচু নীচু নয়, বাঁকাও নয়, বেশ সটান সরল পথ, চলতে বিশেষ কিছু কষ্ট হবে না। না হয় এক কাজ কর রমেন, ষ্টেশান মাষ্টারের কাছ হতে একটা লণ্ঠন চেয়ে নিয়ে এসো, আমি পথ দেখিয়ে তোমায় নিয়ে যাব এখন। অবশ্য আমার জন্যে আলোর কিছু-মাত্র দরকার নেই, আমি এ পথে যাওয়া আসা করেছি, পথ চলা অভ্যাস হয়ে গেছে। তোমার কষ্ট হবে, কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়বে সেই জন্যে বলছি। আমি এ রকম পাতলা অন্ধকারে বেশ পথ চলতে পারব।"

সে নারী হইয়া অন্ধকারে বেশ পথ চলিতে পারে আর সে পুরুষ হইয়া জুতা পায়ে দিয়াও পারিবে না এই লজ্জাটা হঠাৎ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া রমেনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিল, সে বলিল, "চলুন দিদি, আলো চাইতে হবে না। আমি আপনার পাশে পাশে চল্‌ব—কেমন ?"

"তাই ভাল—এসো" বলিয়া স্বপন অগ্রসর হইয়া পড়িল।

খানিক দূর চলিতে একটা বাঁকের মুখে একটু আলোর রেখা ভাসিয়া উঠিল, বাঁকটা ঘুরিতেই আলোকধারী লোকটী সম্মুখে পড়িয়া গেল। অন্ধকার গ্রাম্যপথে একটী নারী ও একটি পুরুষকে দেখিয়া সবিস্ময়ে সে লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিল।

"দিদি, দিদিমণি—"

হাতের লণ্ঠনটা মাটীতে ফেলিয়া সে পথেই জানু পাতিয়া বসিয়া স্বপনের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

বেদনাভরা সুরে স্বপন ডাকিল, "সতীনাথ—"

"হ্যাঁ দিদিমণি, আমি সতীনাথই বটে, এই দেড় বছরের মধ্যে আমায় ভুলে গেলেন দিদি ?"

স্বপন বলিল, "ভুলি নি ভাই, এখানকার কোনও কথা ভুলিনি,

এখানকার কারও কথা ভুলি নি। তোমার স্বপন দিদিমণি যাকে একবার দেখে তাকে আর ভুলতে পারে না, একে তোমরা গুণও বলতে পার—দোষও বলতে পার। তোমরা সব ভাল আছ সতীনাথ ?"

সতীনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভাল যা রয়েছি দিদি, তা একমাত্র ভগবান্ ছাড়া আর কেউ জানে না। চলুন আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিয়ে যাচ্ছি। এই অন্ধকার পাড়াগাঁয়ের পথ, একটা খবর দিয়েও আসতে হয় তো ?"

স্বপন হাসিল, "পাগল, খবর দেব কাকে ? আমার সবই গেছে, জানোই তো সব জবাব দিয়েছি। এখন আমি তোমাদের জমিদার নই সতীনাথ, তোমরা যেমন সাধারণ প্রজামাত্র, আমিও তাই। খবর না দিয়েই আসা ভাল হয়েছে সতীনাথ, আমি যা পেতে পারি নে তা পাওয়ার দাবী আর আমি করতে পারি নে।"

সতীনাথ আগে আগে আলো লইয়া পথ দেখাইয়া চলিতে চলিতে বলিল, "আর কাউকে খবর না দিতেন, আমায় দিলেও হতো। জমিদার প্রজা হিসাবে নয়, ভাই বোন সম্পর্ক নিয়ে, ভাইয়ের কাছে বোনের দাবী নিশ্চয়ই আছে। আমাকে যখন ভাই বলেছেন, একটা খবর দিয়ে দেখতেন ভাই আসে কি না।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "হরেনবাবু আপনার সর্ব্বস্ব নিয়ে বড়লোক হয়ে গেছেন দিদি, দেখে শুনে মনে হচ্ছে আপনার সব জমিদারী তিনিই নেবেন। আপনার রংপুরের মহাল কে কিনেছে জানেন ? তাঁর ভগ্নীপতির নামে তিনিই নিয়েছেন, আপনার কলকাতার বাড়ীও তিনি নিজে নিয়েছেন। এখানকার জমিদারী বাড়ী শুনছি প্রভাতবাবু কিনবেন। বুঝুন ব্যাপারখানা কি রকম দাঁড়িয়েছে সব।"

স্বপন স্থিরকণ্ঠে বলিল, "সে সব আমি জানি।"

উত্তেজিত রমেন বলিল, "এমন অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক লোককেও আপনি জেনে শুনে কাজে রেখেছিলেন দিদি? আমি যদি হতুম তা হলে—"

তাহার দিকে ফিরিয়া স্বপন শান্তকণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, চুপ কর রমেন, যা হয়ে গেছে তার জন্যে অনুশোচনা করা বৃথা। তোমরা বলছ হরেন-বাবু আমার সর্ব্বনাশ করেছেন, আমি বলছি তিনি আমার ভালই করেছেন, আমায় প্রকৃত গুরুর মত শিক্ষা দিয়েছেন, আমায় প্রকৃত জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি আমার সব নিয়েছেন বলে তোমরা অনুযোগ করছো, ধরছি তিনি আমার শত্রুতা করছেন, কিন্তু সেই শত্রুতার মধ্যে আমি তাঁর মিত্রের মতন আচরণ পেয়েছি। তিনি আমায় একেবারে মারতে পারতেন তা মারেন নি। তাঁকে আমি শত সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি সেই করুণাটুকুর জন্যে।"

রমেন চুপ করিয়া গেল, আর কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না।

সতীনাথ উষ্ণ হইয়া বলিল, "আপনার 'পরে এত অন্যায় করেও যদি তিনি ধন্যবাদের পাত্র হতে পারেন সে খুব ভাল কথা। আপনার মন খুব উঁচু বলে আপনি তাঁর শত্রুতার মধ্যেও মিত্রতা দেখতে পাচ্ছেন, দুস্থ প্রজারা তাতো পার্‌ছে না দিদিমণি! তাদের বুক যখন বাঁশ দিয়ে ডলা হয়, তাদের হাত পা বেঁধে রেখে যখন সামনে ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাদের স্ত্রী কন্যার লজ্জাশীলতার হানি করা হয়, তখন তারা তো তার মধ্যে মিত্রতা দেখতে পায় না দিদিমণি, অতখানি উচ্চ জ্ঞান তারা লাভ করতে পারে নি বোধ হয়। শুনছি তিনিই নাকি এখানকার জমিদারী বাড়ী সব নেবেন, তা যদি হয়—যদি তাঁকেই সব বিক্রী করেন

দিদিমণি—আপনার ঠাকুরবাড়ীতে ভূতের নাচন সুরু হবে আর এই সহস্র সহস্র দুস্থ প্রপীড়িত প্রজার অভিশাপ আপনাকে কুড়োতে হবে। শুনেছি ডাক্তার গুপ্ত এখানকার বাড়ী হিন্দু ভিন্ন আর কাউকে বিক্রী করবেন না বলে গেছেন, তবে—”

স্বপন স্থিরকণ্ঠে বলিল, “এখনও আমার হাতে সব রয়েছে সতীনাথ, আমার ইচ্ছার ’পরে বিক্রী নির্ভর করছে। আমি সে সব ভেবে দেখব তারপর মত দেব।”

অন্ধকার প্রায় বৃহৎ বাটী, বৃহৎ গেটে একটী আলো টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছিল, সে আলোতে বহির্ব্বাটীর অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে নাই, আরও বাড়িয়াছে মাত্র। যে বহির্ব্বাটীতে একদিন লোক ধরিত না, আজ সেই বাটী জনশূন্য—বাতাস শুধু হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে। স্বপন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

বহির্ব্বাটী পার হইয়া ভিতর বাটীর দরজায় গিয়া সতীনাথ দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল—“মাসীমা—”

“কে, সতীনাথ নাকি ?”

সতীনাথ উত্তর দিল, “হ্যাঁ আমি, দরজাটা খুলে দাও।”

একটা ল্যাম্প হস্তে শরৎকালী দরজা খুলিয়া দিলেন, সম্মুখেই স্বপনকে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বপন তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল, “আমায় চিনতে পারছ না মাসীমা, আমি স্বপন।”

মাসীমা প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, তাঁহার রোদনে স্বপন ভারী বিব্রত হইয়া পড়িল। ছেলে মেয়ে যে যেখানে ছিল সকলে সেখানে আসিয়া জুটিয়া গেল।

সতীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "নাও একটা কাণ্ড, মানুষটা এল ট্রেণ হতে—কোথায় তাকে বসাবে—কথাবার্ত্তা বলবে, তা না করেই চেঁচিয়ে গাঁ রাষ্ট্র করতে বসলে।"

মাসীমা তাহার তিরস্কারে রোদন সামলাইয়া লইলেন, "এসো মা, ঘরে এসো। আর কি ঘর দোর তোমার রইল মা? কি কাল দেনাই তোমার বাবা করে রেখে গেছেন—চারটী বছর গেল না—বিষয়-আশয় সব পরের হাতে গেল, বাস্তু ভিটেটুকুও যে থাকবে এমন বুঝিনে, এ ভিটেয় বেহ্মদত্যিই নাচবে জানা যাচ্ছে। আর কিছু না মা—আমাদের রাধা-মাধবকে কে টান দিয়ে ফেলে দেবে পথের মধ্যে, সেই আমার বড় দুঃখ! আহা, মা লক্ষ্মী আমার মনের কষ্টে একেবারে আধখানা হয়ে গেছে গো, গায়ের তেমন কাঁচা সোণার মত রং একেবারে কালি হয়ে গেছে, দেখে আর চেনা যাচ্ছে না। এসো মা, এখনও তবু তোমার ঘরবাড়ী, দুদিন বাদে আর তোমার থাকবে না।"

আঁচলের কোণে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া ল্যাম্পটা সেখানে রাখিয়া তিনি একটা লণ্ঠন লইলেন। লণ্ঠনটীতে প্রচুর ধূমোদ্গীরণ হইতেছিল, চিমনীর ভিতর দিয়া অতি কষ্টে ম্লান আলো বাহির হইতে পাইতেছিল। সেই লণ্ঠনটী লইয়া তিনি উপরে চলিলেন, স্বপন তাঁহার পিছনে চলিল; সতীনাথ রমেনের পথপ্রদর্শকরূপে খানিক পরে অগ্রসর হইল।

দ্বিতলে যে সুসজ্জিত কক্ষটীতে স্বপন থাকিত, সে কক্ষটী শূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার অবস্থা বাঙ্গালীর ঘরের বিধবা নারীর মত। আসবাব পত্রাদি কতক হরেনবাবুর দ্বারা, কতক বাড়ীর লোকের দ্বারা আগেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহার পর অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল ডাক্তার গুপ্ত আসিয়া সেগুলি বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন।

স্বপন শূন্য কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া শূন্য নয়নে চারিদিকে চাহিল। কিছু নাই, হায় রে—কিছু নাই, সব গিয়াছে ; হৃদয়ে দাগ রাখিয়া আছে স্মৃতি। সে যে এই গৃহের অধিকারিণীরূপে দিন কাটাইয়া গিয়াছে, পিতা যে এই কক্ষটীকে বড় ভালবাসিতেন।

শরৎকালীর দিকে ফিরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "এই ঘরটায় রমেনের শোওয়ার জায়গা করে দিয়ো মাসীমা, আমি পাশের ছোট ঘরটায় শোব।"

মাসীমা বলিলেন, "সে সব হবে এখন মা, আগে খাওয়া দাওয়া হোক, তারপর তো শোওয়ার কথা। সতরঞ্চিখানা বিছিয়ে দেই—বসো।"

এক কোণে জড়সড় ভাবে সতরঞ্চিখানা পড়িয়াছিল, সেই অত বড় সতরঞ্চিখানা টানিয়া আনিতে তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন, রমেন ও সতীনাথ নারী দুইটীকে সরাইয়া দিয়া ঘর জোড়া করিয়া সেখানি পাতিয়া ফেলিল।

সে রাত্রিটা এক রকম ভাবে কাটিয়া গেল। পরিশ্রান্ত স্বপন শুইবা-মাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ভাবনার অবকাশ সে রাত্রি সে আর পায় নাই।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে যখন চাহিল, তখন জানালার ফাঁক দিয়া শরতের প্রথম সূর্য্যের লাল আলো খানিকটা তাহার কক্ষতলে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই দিকে চাহিতেই স্বপনের মনে পড়িয়া গেল সে আজ কলিকাতায় নাই, এখানে তাহার পূর্ব্বপুরুষের ভিটায় শুইয়া আছে।

বিছানা ছাড়িয়া সে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শরৎকালী নীচে তখন কি কাজ করিতেছিলেন, রমেন তখনও উঠে নাই।

বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য নয়নে সে চারিদিকে একবার চাহিল। নদীর ধারে বহুদূরে শিবমন্দিরটি তেমনিই ভগ্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া কবে কালের কঠোর করস্পর্শে স্থাপিত শিব-লিঙ্গের উপর খসিয়া পড়িয়া শিবের অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দিবে কে জানে। বড় ইচ্ছা ছিল এই বহুকালের প্রচীন মন্দিরটা সে সংস্কার করিয়া দিবে, কিন্তু তাহা হইল না। এই না হওয়ার ব্যথাটাই নড়িতে চড়িতে তাহার বুকে খচ খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

দুপুরে মাসীমা তাহাকে আহার করাইতে বসাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। যিনি নূতন জমিদার হইতেছেন হরেনবাবু নাকি তাঁহার ভগিনীপতি, হরেনবাবু নিজের ঘাড়ে সব ভার লইতেছেন এইরূপ একটা প্রবাদ তাঁহার কানে ভাসিয়া আসিয়াছে। কাল বৈকালে একখানা আদেশ পত্র আসিয়াছে দশদিনের মধ্যে সকলকে এবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

স্বপন একগ্রাস ভাত মুখে দিয়া কোনক্রমে গলাধঃ করিতে করিতে বলিল, "কই সেখানা, মাসীমা—দেখি।"

মাসীমা চোখ মুছিয়া বলিলেন, "খেয়ে ওঠ মা, সেখানা রাধানাথের কাছে আছে আমি এনে দিচ্ছি।"

স্বপন মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তুমি সেখানা এখনি নিয়ে এসো, আমি এখনি দেখতে চাই।"

শরৎকালী চলিয়া গেলেন, মিনিট পাঁচেক বাদে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, স্বপন তখন আচমন সমাপ্তে মুখ হাত মুছিতেছে। থালায় ভাত তরকারী সবই প্রায় যেমন তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে ; সামান্য দু চার গ্রাস প্রথমটায় সে খাইতে পারিয়াছিল মাত্র।

বিস্ময়ের সুরে শরৎকালী বলিলেন, "এ কি মা, কিছুই খাওনি যে ? যেমন আমি উঠে গেছি তেমনিই খাওয়া শেষ করলে ?"

মলিন হাসিয়া স্বপন বলিল, "তুমি বড় বেশী ভাত তরকারী দিয়েছিলে মাসীমা, সেইজন্য খেতে পারলুম না। যাক গিয়ে—পত্রখানা এনেছ ?"

"এই যে—" বলিয়া মাসীমা কাগজখানা স্বপনের হাতে দিলেন।

স্বপন সেখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল মাত্র, একটু হাসি তাহার অধরে আবার ফুটিয়া উঠিল, "তা হলে তো তোমাদের দশদিনের মধ্যেই এ বাড়ী ছেড়ে উঠতে হবে মাসীমা ?"

কান্নাভরা সুরে মাসীমা বলিলেন, "উঠতেই তো হবে মা, যাব যে কোথায় তাই ভাবছি। কত কাল আগে এসেছি এ বাড়ীতে—সে আজ উনিশ কুড়ি বছরের কথা, দেশের বাড়ী ঘর আর কি আছে ? সে ঘর তুলতে গেলে অনেক টাকার দরকার, আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে মা, কোথায় কি পাব ?"

স্বপন তাঁহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল। এই অসহায়া নারীর কথা ভাবিয়া তাহার অন্তর অনেকখানি ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হায়রে, সান্ত্বনা দিবে সে কি করিয়া ? তাহার যেখানে যাহা ছিল ডাক্তার গুপ্ত সব ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন, সুদটাই সে মাসে মাসে পাইবে, জমানো টাকায় বিশেষ দরকার ব্যতীত হাত দিতে পারিবে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মুখ ফিরাইল।

২৩

একটা দিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া জন্মের মত সব দেখিয়া নিয়া স্বপন যেমন গোপনে আসিয়াছিল, তেমনি গোপনে কাল সকালেই চলিয়া যাইবে কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না।

সন্ধ্যাবেলায় সে পথের উপরকার বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল, রমেন সতীনাথের সঙ্গে গ্রামখানা দেখিবার জন্য বৈকালে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মাসীমার ছোট মেয়েটী এতক্ষণ স্বপনের কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল, মায়ের ডাক শুনিয়া একটু আগে চলিয়া গিয়াছে।

মাসীমার জামাতা রাধানাথ বেচারা হাঁপানিতে বড় ভুগিতেছিল, সম্প্রতি তাহার উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছিল। ইহার উপর অর্থাভাবে তাহার রীতিমত চিকিৎসা হইতেছিল না, পথ্যও যথারীতি জুটে নাই। মাসীমার একটীমাত্র ছেলে মোহিত রেল আফিসে কাজ করিত, মাস তিনেক আগে সে নিজের স্ত্রী পুত্রকে নিজের কর্ম্ম-স্থলে লইয়া গিয়াছে। রাধানাথের স্ত্রী উর্ম্মিলা ব্যায়রামে ভুগিতেছিল, মাসের মধ্যে পঁচিশদিন সে বিছানায় পড়িয়া থাকিত। তাহার কোলের ছেলেটীও জ্বরে প্লীহা লিভারে খুব ভুগিতেছিল।

এইরূপ অবস্থায় ইহারা যে কোথায় যাইবে তাহার ঠিক নাই। স্বপন এখন ইহাদের কথাই ভাবিতেছিল, ইহারা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে —কি খাইবে!

মোহিত উপার্জ্জনক্ষম হইলেও মাকে কোনকালে আমল দেয় নাই। এবার বাড়ীতে আসিয়া সে নাকি ঝগড়া করিয়া গিয়াছে, মা যদি মেয়ে জামাতাকে কাছে রাখেন সে মাসে এক পয়সাও দিবে না, অবিবাহিতা ছোট বোনটীর বিবাহে এতটুকু চেষ্টা করিবে না। শরৎ-কালী তাই চোখের জলে ভাসিয়া স্বপনকে বলিয়াছিলেন, "তুমিই বল দেখি মা, ওদের আমি এখন এ রকম অবস্থায় কি করে তাড়িয়ে দেই? রাধানাথের যদি এতটুকু যোগ্যতাই থাকবে তবে কি সে এমন ভাবে হীন হয়ে আমার কাছে পড়ে থাকে? তোমার মেসোমশাই তো এই সর্ব্বনাশ করে গেলেন, নিজের চোখে ঘরের অবস্থা না দেখে মেয়ে দিয়ে এই কাণ্ডটা করে গেছেন, ভাবেননি এর পরে কি হবে; এমনি করে আমাদের দেশের কত মেয়ের জন্মই না মিথ্যে হয়ে যায়, তা তো কেউ দেখে না মা, কেউ ভাবে না। এখন আমি করব কি তাই তোমরা সবাই আমায় বল।"

সত্যই ভাবিবার কথা। রাধানাথ মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়াছে, তাহা স্বপন আগেই জানিয়াছে। এই লোকটী তাহার বড় কম অনিষ্ট করে নাই। হরেনবাবুর সাহায্য পাইয়া সে তাঁহার পরামর্শে অনেক সময় স্বপনের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কাগজ পত্রাদি নাড়াচাড়া করিয়াছে। স্বপন কয়দিন তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; প্রথম দুইদিন তাহাকে ভাল কথায় নিষেধ করিয়া দিয়াও যখন ফল পায় নাই, তখন তাহার উপরে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।

তাহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইলেও—তাহার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া থাকিলেও এবার হতভাগ্যের অবস্থা দেখিয়া সে তাহাকে অন্তরের

সহিত ক্ষমা করিয়াছিল। রাধানাথও সজলনেত্রে করযোড়ে তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য্য তখন ডুব দিয়াছে, অন্ধকার আস্তে আস্তে ধরার বুকে নামিয়া আসিতেছে। স্বপন দেখিতেছিল নদীর জলে আকাশের ছায়া, ঢেউয়ের তালে তালে সে ছায়া কাঁপিতেছিল।

হায়রে, কাল সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে। বিদায়—হ্যাঁ, চিরবিদায়ই বটে। কাল সে একেবারেই চলিয়া যাইবে, আর সে আসিবে না। সে কলিকাতায় আবাল্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তবু সে গ্রামকেই ভালবাসিত। শিশু যেমন স্বর্গের গল্প শুনিয়া তাহার একটা ছবি কল্পনায় মনে আঁকিয়া লয়, সেও পিতার মুখে গ্রামের কথা শুনিয়া গ্রামের ছবি কল্পনায় মনে আঁকিয়া লইয়াছিল। এই গ্রামখানির জন্যই তাহার হৃদয়ের ভালবাসা—স্নেহ পুঞ্জীভূত ছিল, গ্রামে আসিয়া সবটা সে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিল।

এখানকার সঙ্গে তাহার সকল সম্পর্কই চুকিয়া যাইতেছে, তাই আর একবার সে দেখিতে আসিয়াছে কাহাকে সে বিদায় দিতেছে, কাহার নিকট বিদায় লইতেছে।

ওগো সুন্দর কলস্রোতা নদী—যাহার বুকে আপ্রভাত সন্ধ্যা আকাশের ছায়া জাগিয়া থাকে, ছোট বড় কত ঢেউ উঠে, কাল আর ইহাকে দেখিতে পাইবে না। নদীর ও পারে ওই যে ধানের ক্ষেত—দিনে দেখা যায় হরিৎ বরণ ধানে ভরিয়া গিয়াছে, এখন মৃদু অন্ধকার যাহার উপর ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে, কাল হইতে উহার অতুল ঐশ্বর্য্য শুধু স্মৃতির ভাণ্ডারেই জমা থাকিবে, চক্ষে আর কখনও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। গ্রাম্যপথে অবগুণ্ঠিতা পল্লীবধূকে কলসী কক্ষে ত্রস্তভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দূর হইতে পল্লীবৃদ্ধার—আয়রে

কাজলী শ্যামলা শব্দ আর কানে ভাসিয়া আসিবে না, সবই শুধু স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা থাকিয়া যাইবে। হায়রে, জগতে সবই যায়, স্মৃতি কেন যায় না ?

“দিদি—”

স্বপন একটু হাসিয়া কণ্ঠকে বাক্ কথনের উপযুক্ত করিয়া উত্তর দিল, “এই যে আমি, বারান্দায় এসো রমেন, আমি এখানে।”

রমেন আসিতে আসিতে বলিতেছিল, “আচ্ছা দিদি, আপনার ভূত-পূর্ব্ব ম্যানেজার কি সব বিষয়েই চৌকশ লোক ? কাল তিনি এমন এক কাণ্ড করেছেন—ইস্, সব যে অন্ধকার হয়ে গেছে দিদি, এই অন্ধকারে একলাটী চুপ করে বসে আছেন ?”

স্বপন একটু হাসিয়া বলিল, “তুমি আলো হতে ঘরে এসেছ বলে এ রকম জমাট-বাঁধা গাঢ় অন্ধকার দেখতে পাচ্ছো রমেন। যতটা অন্ধকার হঠাৎ এসেই দেখতে পাচ্ছো ততটা যে নয়, তা তিন মিনিট দাঁড়ালেই দেখতে পাবে।”

রমেন বলিল, “আমি দেখতে চাইনে, আপনি ঘরে চলুন।”

স্বপন বলিল “এই যে যাচ্ছি। কি জানো ভাই, আলোর চেয়ে অন্ধকারটাকেই আমার খুব বেশী রকম ভাল লাগে, এই অন্ধকারের ভীষণতার মধ্যে আমি বিশ্বের আদি ও অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য দেখতে পাই। তোমরা বলবে আলোর সৌন্দর্য্য বেশী, কিন্তু যথার্থ তাই কি ভাই ? মনে কর রাত্রি যদি না থাকত, দিনের আলোর কোন সৌন্দর্য্য থাকত কি ? অমাবস্যা যদি না থাকত, পূর্ণিমার এতটুকু আদর হতো না, দুঃখ যদি না থাকত, সুখের কথা কেউ বলত না। তোমরা আলোর ভক্ত, আলোই চাও, আমি অন্ধকার ভালবাসি, অন্ধকার চাই।”

রমেন ব্যথিত চোখে তাহার পানে চাহিল, অন্ধকারে সে দৃষ্টি স্বপন দেখিতে পাইল না।

স্বপন বলিয়া চলিল, "অন্ধকারের যে অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্য তা তোমরা বুঝবে না, আমি তা বুঝি, আমি তার অনন্ত রূপের ধারণা করতে পারিনে, তার অসীমতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এটা ঠিক কথা, মানুষের জীবনে আলো চিরকাল থাকে না,—অবশ্য এটা আমার এই সামান্য জীবনকালের অভিজ্ঞতার ফলে জানা মাত্র। কোন না কোন সময়—না, যাক এ সব কথা, এদেশে যাকে বলে—"ধান ভানতে শিবের গীত" এনে ফেলা—আমার হয়েছে তাই; সামান্য এতটুকু কথা নিয়ে মস্ত বড় একটা দামী কথার অবতারণা করছি। তারপর—তুমি কি বলছিলে হরেনবাবুর কথা? তিনি কি এখানেই আছেন নাকি?"

রমেনের সে কথাটা এই আলো আঁধারের প্রসঙ্গে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, স্বপনের প্রশ্নে সেটা আবার জাগিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, সে কথাটা বলি শুনুন। আমি সতীনাথের মুখে শুনছি, তিনি নাকি তাঁর সম্বন্ধী প্রভাতের নামে সব কিনেছেন। কথাটা সেদিন পিসেমশাইও আপনাকে বলছিলেন, মনে পড়ে কি? যাক সে কথা, এখন যে কথা বলতে চাই, তাই বলে যাই শুনুন। প্রজারা সব আপত্তি তুলেছে,—তারা তো জানে না, হরেনবাবু চক্ষুলজ্জার দরুণও বটে—লোকের সন্দেহ হতে মুক্ত থাকবার জন্যেও বটে, নিজের নামে জমিদারী কিনে ফেলতে পারেন নি, তারা নাকি স্পষ্টই বলেছে হরেনবাবু থাকলে খাজনা দেবে না। এদের কর্ত্তা একজন গোঁয়ার গোছের লোক, তাকে জব্দ করার জন্যে হরেনবাবু অনেক চেষ্টা করেও বিফল হয়ে

অবশেষে কাল রাত্রে জনকত ছোটলোক দিয়ে তার ঘরের বেড়া কাটিয়ে তার পাশ হতে ঘুমন্ত স্ত্রীকে নিয়ে এসে—"

"কি—তুমি কি বলছো রমেন ?"

উত্তেজনার আধিক্যে স্বপনের মুখখানা সাদা হইয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল, "না না, হরেনবাবু এমন কাজ করতে পারবেন না আমি তা জানি।"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া রমেন বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আপনি সবই জানেন। হরেনবাবু মেয়েটীকে নিয়ে এসে তিন মাইল দূরে মাঠের কাছারীতে বন্ধ করে রেখেছেন—সতীনাথ এ প্রমাণ দিতে পারে। তুমি এখানে এসেছ এ কথা তোমার আদেশে বাইরের একটী প্রাণীও জানে না। আজ বিকেলে আমরা যখন পাশের গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই সময় দেখতে পেলুম, সেখানে এক জায়গায় হুলস্থূল কাণ্ড পড়ে গেছে ; পুলিসও এসেছে, গ্রামের ছোট বড় সবাই গিয়ে জুটেছে। হরিহর—সেই লোকটী, যার স্ত্রী গতরাত্রে অপহৃতা হয়েছে, সে বলেছে, যারা সেই নিঝুম আঁধার রাতে ঘরের বেড়া কেটে ঘরে ঢুকে তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে, তাদের সকলকেই সে চিনতে পেরেছে, তারা কাছারীতে কাজ করে। তারা মুখে কালি ছাই মাখলেও মশালের আলোয় তাদের দিকে তাকিয়ে হরিহর তাদের চিনতে পেরেছিল। দারোগা হরেনবাবুর হাতধরা, কেন না তিনি জানেন বেনামীতে কিনলেও হরেনবাবুই এখন জমিদার। দুদিন বাদে গোলমালটা একটু মিটে গেলেই নিজের নামে সব কাজ চালাবেন। কাজেই তিনি উল্টে দোষ বেচারা হরিহরের ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন। তাকে বেত খেতে হল, যেন এ রকম কথা আর সে মুখে না আনে। কিন্তু এ কি গোপন করে রাখবার দিদি, অন্তর তার সত্য চিনেছে,

মিথ্যের মুখোস সে পরতে পারছে না। ঘণ্টাখানেক পরে পুলিস চলে গেলে পর তাদের গ্রাম্য মীমাংসা হয়ে গেল—অর্থাৎ স্ত্রীকে যখন পাওয়া গেলেও আর নেওয়া যাবে না, তখন ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই ভাল, হরেনবাবুর মত লোককে চটিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলুম, অত্যাচারীর অত্যাচার, পুলিসের ন্যায়বিচার আর গ্রামবাসীর ন্যায়পরায়ণতা। তারপর উত্তেজিত সতীনাথ কোন মতে আপনার আসা গোপন করতে পারলে না। আপনি এখানে এসেছেন শুনে হরিহর আপনার কাছে সব কথা বলবার জন্যে ছুটে এসেছে।”

“আমি—আমি কি করব রমেন ?”

অজ্ঞাতে টক্ কুলে কামড় দিয়া মানুষ যেমন করিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া ফেলে, রমেন ঠিক তেমনিই করিয়া মুখ বিকৃত করিল। বিকৃত কণ্ঠে বলিল, “ও কথা বলবেন না দিদিমণি, আপনি সব করতে পারেন। জমিদার আপনি নন, কিন্তু নারী তো বটে, নারীর প্রতি এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করবে নারী, নারীই নারীকে রক্ষা করবার জন্যে উঠে দাঁড়াবে, নারীই নারীকে অভয় দেবে। পুরুষ এখানে অত্যাচারী, নারীকে সে নির্য্যাতন করছে—দলন করছে—পীড়ন করছে, এরকম স্থানে নারীর নারীত্ব রক্ষা করতে নারীকেই যে জাগতে হবে দিদি। নারী বলতে সমস্ত নারী-সমাজকেই বুঝোচ্ছে ; নির্দ্দয় পুরুষ শুধু একটী নারীকেই অপমান করছে না এতে—সমস্ত নারী-সমাজকে অপমান করছে। উঠুন শক্তিময়ী নারী, আপনার বুকে আগুন জ্বলে উঠুক, নারীকে রক্ষা করতে আজ নারীই দাঁড়াক। নারী তো দুর্ব্বলা নয় দিদি, নারী যে শক্তিময়ী জননী ; নারী হতে নরের উদ্ভব, একি বড় কম কথা

দিদি, যে নর আবার সেই নারীকে—তাদের মাকে ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা করে? এ কি আপনার ধর্ম্ম নয়, আপনার ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলছে, চোখের 'পরে অমানুষিক অত্যাচার যদি চলে, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধ্যানেই থাকবে? ক্ষমতা থাকতেও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে যে শাস্ত্র উপদেশ দেয় না সে কি তবে ধর্ম্মশাস্ত্র হতে পারে দিদিমণি, আপনি নিজের উন্নতিই করে যাবেন? পাশে আছে যারা তাদের টেনে নিতে পারবেন না এই কি আপনার ধর্ম্ম? আপনার দেবতা কি সব ভুলে কেবল পূজাতেই তন্ময় হয়ে থাকতে উপদেশ দেন, জড় হয়ে থাকতে বলেন? না দিদিমণি, সে ধর্ম্ম আপনাকে পালন করতে হবে না, আপনাকে শুধু ভক্তিযোগ নিয়ে থাকলে হবে না, কর্ম্ম করতে হবে, মনে করুন আপনার কৃতকর্ম্মই আপনাকে ভগবানের চরণতলে পৌঁছে দেবে। আপনাকে উঠতে হবে, পাষণ্ডদের হাত হতে এই দুর্ব্বলা নারীটিকে উদ্ধার করতে হবে। মনে করুন সে কার হাতে পড়েছে, তার অমূল্য রত্ন শূকরের পায়ে লুটোবে, নারীর সারধন সতীত্ব সে হারাবে, আপনি কানে শুনে—এর প্রতিকারের উপায় থাকতেও প্রতিকার করবেন না দিদিমণি? এই তো সেই দেশ দিদি, যে দেশের মেয়েরা অমূল্য সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করবার জন্যে হাসতে হাসতে জীবন ত্যাগ করে। সেও তো এই দেশেরই মেয়ে দিদি, মরতে সেও জানে—কিন্তু সে যে বড় অপ্রস্তুত অবস্থাতেই ওদের হাতে পড়েছে, আত্মরক্ষা করবার এতটুকু অবসর তাকে দেওয়া হয় নি। এখনও হয় তো—পাছে সে আত্মহত্যা করে সেই ভয়ে তাকে এমনভাবে রেখেছে যে তার হাত পা নাড়বার যো পর্য্যন্ত নেই। হয় তো—হয় তো কেন, নিশ্চয়ই আপনি গিয়ে তাকে এখনও রক্ষা করতে পারেন দিদিমণি।"

"ঠিক বলেছ রমেন—"

স্বপন উত্তেজিতভাবে উঠিয়া পড়িল, "সত্যি কথা বলেছ ভাই, এ শুধু একটী নারীরই কলঙ্ক নয়—নারীজাতির কলঙ্ক। এ কলঙ্ক মোচন করতে—নারীকে রক্ষা করতে দাঁড়াতে হবে নারীকেই। হ্যাঁ, এখনও হয়তো আমি তাকে রক্ষা করতে পারব। সমাজ এর পর দণ্ড দেয় বা ক্ষমা করে সে পরের কথা, আগে দুর্ব্বৃত্তদের হাত হতে তাকে রক্ষা করা দরকার।"

অন্ধকারেই দ্রুতপদে সে নীচে নামিয়া গেল, পিছনে পিছনে রমেনও একটা লণ্ঠন লইয়া অনুসরণ করিল।

অন্ধকার বারান্দার একটী পাশে বসিয়া পড়িয়াছিল হরিহর, নিকটে থামের গায়ে হেলান দিয়া সতীনাথ দাঁড়াইয়াছিল; নির্ব্বাক সে,—হরিহরের এই বুকজোড়া বেদনায় সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা সে তাহার হৃদয়ের মধ্যে আতি পাতি খুঁজিয়াও পায় নাই।

নিবিড় নিকষ-কালো অন্ধকার চারিদিক বেড়িয়া গম গম করিতেছিল, এই ঘন—ছিদ্রহীন অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটী সরল আলো-রেখা তাহাদের কাছে নামিয়া আসিল, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া হরিহর দেখিল, স্বপন আসিয়াছে।

বুক চিরিয়া তাহার হৃদয়ের করুণসুরটা মুখে ভাসিয়া উঠিল—"মা—"

স্বপনের পায়ের কাছে সে আছড়াইয়া পড়িল, মুখে তাহার আর একটী কথা ফুটিল না, অশ্রুজলে তাহার মুখের ভাষা ভাসাইয়া লইয়া গেল।

তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তুলিতে মিষ্ট সান্ত্বনার সুরে

স্বপন বলিল, "ওঠো বাবা, আমি সব শুনলুম, তোমায় আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না। কোথায় সে আছে, সে সন্ধান যদি পেয়ে থাক আমায় সেখানে নিয়ে চল। হ্যাঁ—যথার্থ কথা, তাকে আমিই নিয়ে আসব, নারীকে আজ নারীই উদ্ধার করবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে সতীনাথ বলিল, "আমি তা জানি দিদি, সেইজন্যেই হরিহরকে সঙ্গে করে আপনার কাছে নিয়ে এসেচি। একটী ছোট মেয়ে আমায় সে সন্ধান দিয়েছে, তাইতেই আমি জেনেছি কোথায় তাকে রাখা হয়েছে। চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

স্বপন রমেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি হরিহরকে উপরে আমার ঘরে নিয়ে যাও রমেন, আমি যত শীঘ্র পারি তাকে নিয়ে ফিরে আসব। যদি হরেনবাবু তাকে নিয়ে এসে থাকেন, আমি তাকে না নিয়ে কখনই ফিরব না।"

রমেন একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমিও সঙ্গে যাই না দিদি, কি জানি যদি কোনও দরকার পড়ে, তা হলে—"

বাধা দিয়া স্বপন শান্তকণ্ঠে বলিল, "আমার আর্থিক অনিষ্ট জগতের লোকে করলেও করতে পারে, দৈহিক অনিষ্ট করতে পারে জগতে কারও এমন ক্ষমতা নেই ভাই, ভগবান্ আমায় একটা বর্ম্ম পরিয়ে রেখেছেন তা জান কি? তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার—হরেনবাবু পিশাচ হলেও হতে পারেন, কিন্তু এও জেনো তিনি আমায় কোলে করে মানুষ করেছেন। তিনি ক্ষণিকের মোহে ভুলে আমার সর্ব্বস্ব নিলেও একদিন অনুতপ্ত তাঁকে হতেই হবে। বিশ্বাস করো ভাই—তিনি আমার শত্রু হলেও মিত্র, তিনি বিশ্বাসী—প্রভুভক্ত।"

সতীনাথের সহিত সে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সম্মুখে ছিদ্রহীন অন্ধকারের বিরাট মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া সতীনাথ বলিল, "আলোটা নিলে হতো না দিদি ?"

স্বপন বলিল, "আলো দেখলেই আমায় সকলে চিনতে পারবে। আমি কাউকে জানাতে চাইনে সতীনাথ, গোপনে কাজ সেরে গোপনেই ফিরে যাব। হরেনবাবুকে আলো দেখিয়ে সতর্ক হওয়ার অবকাশ দিলে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

দীর্ঘপথ আর ফুরায় না। আকাশভরা তারার মালা ঝিক মিক করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার অল্প আলোর আভায় পথ ঈষৎ রঞ্জিত ; পথিককে চিনিতে না পারিলেও দেখা যায়। পল্লীগ্রামের পথ সন্ধ্যা হইতেই পথিক-পরিত্যক্ত। পথের পার্শ্বে গৃহস্থের বাগান হইতে স্ফুট-শিউলির মধুর গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল ; পালিত কুকুর পথে মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, দুই একটা শৃগাল পথের এপাশ হইতে ওপাশে চকিতে ছুটিয়া গেল।

উভয়ে নিঃশব্দে ভদ্রপল্লী অতিক্রম করিয়া গেল। সতীনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে—না দিদি ?

স্বপন উত্তর দিল, "কষ্ট ? না সতীনাথ, আজ মোটেই কষ্ট বোধ হচ্ছে না। অন্যদিন হলে হয়তো এতটা পথ হাঁটতে শ্রান্তি অনুভব করতুম, আজ মোটেই শ্রান্তি আসছে না। রাত হয়ে উঠছে, নীহার পড়ছে, তাড়াতাড়ি করে চল। এতক্ষণ হয়তো সেখানে কি কাণ্ড চলছে—উঃ, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে !"

তিনমাইল দূরে আনন্দপাড়া পল্লীর মধ্যে অবস্থিত কাছারী বাড়ী, তাহারই কোন একটা কক্ষে টিপ টিপ করিয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল। স্বপন বলিল, "হরেনবাবু বোধ হয় এখানেই আছেন ?"

সতীনাথ উত্তর দিল, "খোঁজ নিয়ে জানলুম বিকেলে এসেছেন।"

মাঝের গোলাকার বড় কক্ষটার মধ্যে উত্তেজিত হরেনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, তাঁহার নিকটে বসিয়া আমলা সনৎ রায়; একটু দূরে দাঁড়াইয়া কাছারীর পেয়াদা ইব্রাহিম ও মতিলাল।

হরেনবাবু সম্মুখে টেবিলে একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিতেছিলেন, "ওই হরিহর বেটাই আসল বদমায়েস, ওর জন্যেই সব প্রজা এই রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছে, নতুন জমীদারকে মানবে না, খাজনা দেবে না বলে দৃঢ় পণ করেছে। বেটাকে জব্দ করার জন্যেই তার স্ত্রীকে কাল নিয়ে এসেছি, নইলে সে নির্দোষ মেয়েটাকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে আনি নি। সে কিছু করতে পারবে না, তার দর্প এইবার কমবে। পুলিশের ভয় করছিস্ তোরা—পুলিস আমার মুঠোর মধ্যে তা জানিস্? দারোগা সুশীলবাবুকে আমি যা বলব তাই বলবে, যে দিকে ফিরাব সেই দিকে ফিরবে। হরিহরকে বিশেষ করে জব্দ করব—এই স্ত্রীটাকে শেষকালে পথে বার করে দেব, লোকে হাসবে—তখন তার মুখ তুলবার আর ক্ষমতা থাকবে না।"

"কাকাবাবু—"

হঠাৎ স্বপন যখন ভেজানো দরজা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন হরেনবাবু একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে তাঁহার বহুক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বিস্মিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "স্বপন—?"

স্বপন তাহার স্বভাবসংযত কণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আমি।"

হরেনবাবুর ধপ্ করিয়া চেয়ার খানার উপর বসিয়া পড়িলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি—কবে এসেছ এখানে?"

স্বপন উত্তর না দিয়া পেয়াদা দুইটার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এরা কারা কাকাবাবু ?"

হরেনবাবু জড়িতকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "এরা এই কাছারীর পেয়াদা। এ সব প্রশ্নোত্তরের আগে আমি একটা প্রশ্ন করছি স্বপন—তুমি এই রাত্রে এই কাছারী বাড়ীতে একা এসেছ ?"

স্বপন স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তা যদি না বলি কাকাবাবু ?"

হরেনবাবু বলিলেন, "জোর করে জানতে চাইনে, বলা না বলা তোমার 'পরে নির্ভর করছে।"

স্বপন বলিল, "যদি বলি আমি একাই এসেছি ?"

হরেনবাবু বলিলেন, "সেটা বেশী কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়, কারণ তোমার মত অসমসাহসিকা মেয়ে সবই করতে পারে। তোমার সাহস মেয়েদের ছাড়িয়ে উঠেছে, কোন মেয়ে যে তোমার সমকক্ষতা লাভ করেছে বা করবে তা বোধ না।"

স্বপন তাঁহার এই অযাচিত প্রশংসাতে খুসি হইতে পারিল না, বরং তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমার এতটা সাহস বাড়তে দিয়েছেন আপনারাই কাকাবাবু, অনেকটা ছাড়িয়ে এসেছি—যদিও জানিনে সীমাতিক্রম ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে। বিপদের পর বিপদ এসে আমার নারীসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচকে দূর করে দিয়েছে, আমি তাই এই রাত্রে আমার বাড়ী হতে তিনমাইল দূরে এই কাছারী বাড়ীতে আসতে পেরেছি। হাসবেন না—কেন না এখনও আমার বাড়ী বলছি ; আর নয়টা দিন পরে সে বাড়ী আপনারই হবে, এই নয়টা দিন আমার বাড়ীই বলব। এখানে এই রাতে আমায় টেনে আনতে বাধ্য করলে কে—সে কি আপনারই কাজ নয় কাকাবাবু ?"

শুষ্ককণ্ঠে হরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, "আমার কাজ ?" আর একটী কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দৃঢ়স্বরে স্বপন বলিল, "হ্যাঁ, আপনার কাজ। আপনি আর সকলের চোখে ধূলো দিতে পারবেন, আমার চোখে ধূলো দিতে পারবেন না; পুলিসকে আপনি ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবেন, আমায় পারবেন না। আপনি দূরে থেকে নিজেকে গোপনে রেখে যে কাজটী করিয়েছেন, তা কি ভদ্রলোকের উপযুক্ত কাজ হয়েছে কাকাবাবু, কোনও শিক্ষিত লোকে এমন কাজ করতে পারেন কি? আপনাদের জন্যেই তো দেশের বুকে এত নারী নির্য্যাতন হচ্ছে, সে কথাটা কাগজে পড়ে আগে বিশ্বাস করি নি—আজ বিশ্বাস করছি। ধনীরা গোপনে থাকে—তাদের বেতনভোগী চাকরেরা গভীর নিশীথে স্বামীর কোল হতে পতিব্রতা সাধ্বী সতীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, সতীর সতীত্ব ছিনিমিনি খেলার বস্তু হয়। যে দেশের ধনী অর্থের অহঙ্কারে সতীর সতীত্ব ধারণা করতে অক্ষম, সে দেশের ধনী দরিদ্র সমান হয়ে যাক, বিধাতার অভিশাপ নেমে আসুক—ধনীর মাথায় বজ্রাঘাতের মতই বাজুক। কাকাবাবু, আপনাকে আমি বেশী কিছু বলতে পারিনে। আপনি আমায় কোলে করে মানুষ করেছেন, পিতৃস্নেহ আপনার কাছ হতে আমি লাভ করেছি সে কথা আমি ভুলি নি, কখনও ভুলতে পারব না। বলুন, সে মেয়েটী কোথায় আছে, তাকে আমায় ভিক্ষা দিন—আমি তাকে আপনার কাছ হতে ভিক্ষা করে নেব বলে এই রাত্রের অন্ধকারে হেঁটে এতদূরে আপনার কাছে এসেছি। আপনার স্নেহের স্বপন করযোড়ে নতজানু হয়ে আপনার কাছে এই শেষ একটী ভিক্ষা চাচ্ছে কাকাবাবু—স্বপনেরই প্রতিরূপা মেয়েটীকে রক্ষা করুন। মনে করুন কাকাবাবু—

আপনি যার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন সে নারী সেই মা, সেই মায়ের অমৃত-স্তন্যধারা আপনার মুখে গড়িয়ে পড়েছে, আপনি আপনার মাতৃরূপা নারীজাতির অমর্য্যাদা কখনও করতে পারবেন না। মনে করুন, সে আপনার বড় স্নেহের মৃন্ময়ী, পিতা হয়ে আপনি মেয়ের সম্মাননাশ করতে পারবেন না। তার স্বামীকে আপনি যত খুসি নির্য্যাতন করুন—মারুন —জেলে দিন, তার সর্ব্বনাশ করবেন না কাকাবাবু, আপনার পায়ে—"

"স্বপন—"

আর্ত্তভাবে তাহার হাত দুখানা পায়ের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া হরেনবাবু উঠিয়া পড়িলেন, "এসো মা, সে মেয়েটীকে আমি এখনই তোমায় দিচ্ছি।"

স্বপন তাঁহার পিছনে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তার 'পরে কোনও রকম অত্যাচার—"

বাধা দিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া হরেন্দ্রনাথ রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এত নীচ হরেন্দ্রনাথ নয় মা, তারও মেয়ে আছে। মেয়েটীর জন্যে মনে শান্তি পাচ্ছিলুম না, নিয়ে এসে নিজেই অনুতপ্ত হয়েছিলুম, বিবেকের কথা কাণে আসছিল কিন্তু এ ভুল সুধরাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হরেন্দ্রনাথ সকল মহাপাপে অভ্যস্ত থাকতে পারে—পারে নি কেবল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে, আর পারে নি নারীকে লাঞ্ছনা করতে।"

স্বপন বলিল, "বাকিটা কি রেখেছেন কাকাবাবু—নারীকে লাঞ্ছিত করবার? জানিনে আপনি মানবেন কিনা—কিন্তু পড়েছেন নিশ্চয়ই, পরাক্রান্ত ভুবনবিজয়ী রাজা রাবণ শুধু সীতার অঙ্গ স্পর্শ করার ফলে—তাকে হরণ করে আনার ফলে সব হরিয়েছিলেন, নারীকে অপমান

করার ফলে শুম্ভ-নিশুম্ভের পতন হলো। আপনি যত সহজে এটা এড়িয়ে যাবেন ভাবছেন, তত সহজে এড়িয়ে যাবার যো নেই, এর ফল একদিন আপনাকে ভোগ করতেই হবে যে। নারীকে লাঞ্ছিত অপমানিত করা আর কাকে বলে বলুন দেখি, এই কি তা নয়?"

হরেনবাবুর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর একটাও কথা বলিতে পারিলেন না।

একটী কক্ষের দরজায় শিকল তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, হরেনবাবু নীরবে সেই শিকলটা নামাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; ভিতরে কে আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

স্বপন অন্ধকার গৃহের মধ্যকার দৃশ্য কিছুই দেখিতে পাইল না, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল, ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় বোন, আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি নে।"

উত্তর নাই। স্বপন বুঝিল মেয়েটী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেছে।

স্বপন মিষ্টকণ্ঠে বলিল, "তোমার একটুও আর ভয় নেই, আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি, তোমার স্বামী আমার বাড়ীতে তোমার অপেক্ষা করছেন। আমাকে তুমি কখনও দেখনি কিন্তু নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। আমি স্বপন, একদিন তোমাদেরই জমিদার ছিলুম।"

শেষ কথার সুরে যেন বেদনাই ঝরিয়া পড়িল, হরেনবাবুর বুকটাকে কে যেন কঠিন হস্তে মুচড়াইয়া দিল।

"অ্যাঁ আপনি—আপনি এসেছেন—"

অভাগিনী কিশোরী স্বপনের পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল; দুইহাতে তাহার পা দুখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে শিশুর মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

স্বপনের চোখ ভরিয়া অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইল, সে মেয়েটীর হাত ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আর কান্না কিসের বোন, তোমার স্বামীর কাছে চল।"

হরেনবাবুর স্তম্ভিতভাবের দিকে তাকাইয়া সে হাত ছুখানা ললাটে ঠেকাইয়া বলিল, "আসি তবে কাকাবাবু, আপনার পায়ের ধূলো আর নিতে পারলুম না—আমার এ অপরাধ নেবেন না। আপনার এতদিনকার সব কাজ উপেক্ষার চোখেই দেখেছি, ভক্তি না এলেও জোর করে ভক্তি এনেছি; নারীর মর্য্যাদায় যে দিন হাত দিতে এসেছেন সেইদিন হতে আমার সকল শ্রদ্ধা ভক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।"

তরুণী নিভার হাত ধরিয়া—সে যেমন আসিয়াছিল তেমনই চলিয়া গেল। হরেনবাবু তখনও স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়াছিলেন।

২৪

ব্যাপারটা যত সহজে মিটিয়া যাইবে স্বপন ভাবিয়াছিল তত সহজে মিটিয়া গেল না। পরদিন সকালেই স্বপনের চলিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে রাত্রে ছয়সাত মাইল পথ হাঁটিয়া রাত্রি জাগিয়া পরদিন ভোরে স্বপন কিছুতেই শয্যা ত্যাগ করিতে পারিল না।

অনেক বেলায় সে যখন শয্যা ত্যাগ করিল, তখন তাহার সমস্ত শরীরে অসহ্য বেদনা, মাথায় দুঃসহ যন্ত্রণা।

রমেনের সহিত দেখা হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন দিদি? আমি সাহস করে আপনাকে ভোরবেলা ডাকতে পারি নি; সেই জন্যেই সকালের ট্রেণখানা ধরা গেল না।"

স্বপন বলিল, "বিকালের ট্রেণখানায় যাব এখন। তুমি ভাই সতীনাথের সঙ্গে দেখা করে, একখানা গাড়ী কি পালকীর চেষ্টা দেখো, আর দু পা হাঁটবার আমার শক্তি আজ নেই।"

রমেন বলিল, "আর একটু পরেই সতীনাথ আস্‌বে, সে বলে গেছে বেলা নটার সময়ে ঠিক আসবে। নটা বাজতে আর দেরী নেই, এখনি সে এল বলে।

ঠিক নয়টার সময়েই সতীনাথ আসিয়া পড়িল।

স্বপন বলিল, "আজ বিকেলের ট্রেণখানা ধরিয়ে দিতে হবে সতীনাথ, একখানা গাড়ী কি পাল্কী—"

বাধা দিয়া সতীনাথ বলিয়া উঠিল, "বিকেল পাঁচটার ট্রেণ—তার জন্যে এখনই আপনাকে অত তাড়াতাড়ি করতে হবে না দিদিমণি, আমি দুপুরের মধ্যে সব ঠিক করে দেব—চান তো বেলা বারটার সময়েই একখানা পাল্কী এনে আপনার দরজায় রাখব, তা হলেই আপনার হবে বোধ হয়। এখন আজ সকালের ব্যাপারটা আপনাকে শুনতেই হবে, আমি সেই কথাই আপনাকে শুনাতে এসেছি।"

রমেন উৎসুক হইয়া বলিল, "গেল রাত্রের সেইটীর কথা বুঝি ?"

সতীনাথ বলিল, "নিশ্চয়ই। দিদিমণি কাল অত করে তাকে নিয়ে এলেন, এখন তাকে সমাজ-রাক্ষসের হাত হতে বাঁচাবে কে তাই ভাবছি।"

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

সতীনাথ বলিল, "রকম প্রায় যে রকম সর্ব্বদা ঘটে থাকে তাই, তার চেয়ে একচুল এদিকও নয় ওদিকও নয়। হরিহর কাল রাত্রে মেয়েটীকে বাড়ী নিয়ে গেছে, আজ সকালেই সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেছে,

হরিহর তার স্ত্রীকে আপনার সাহায্যে উদ্ধার করে এনেছে। অবশ্য আপনি না প্রকাশ করায় হরেনবাবুর নাম প্রকাশ হয়নি, কেউ কেউ সন্দেহ করলেও সে নাম স্পষ্ট করে বলতে সাহস করেনি, কেন না সবাই তাঁকে চেনে। আমি সকালেই এখানে আসছিলুম, পথ হতে দেখতে পেলুম হরিহরের বাড়ীতে অনেক লোক জমে গেছে, তার নিরপরাধিনী বালিকা স্ত্রীটি বাড়ীর পাশে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদছে আর থর থর করে কাঁপছে। ব্যাপারটা সেখানে গিয়েই জানতে পারলুম, সমাজ হরিহরকে শাসন করেছে, এ স্ত্রী নিয়ে তার ঘর করা চলবে না। হরিহর প্রথমটা স্ত্রীর পক্ষ টেনে দু এক কথা বলতে গিয়েছিল, শেষটা সমাজের তীব্রতাড়না দেখে চুপ করে গেছে। মেয়েটী কেঁদে সকলের পায়ের কাছে লুটোপুটি খেয়েছে, কেউ তার দিকে চাইলে না—কেউ তার কথা শুনলে না। এমনি কি শেষটায় তার স্বামী পর্য্যন্ত স্বীকার করলে তার স্ত্রীর নির্দ্দোষিতার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।"

রুদ্ধকণ্ঠে রমেন বলিয়া উঠিল, "জানে না—সেও জানে না, হৃদয়হীন বর্ব্বর কোথাকার—"

স্বপন স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তুমি চুপ কর রমেন, তারপর কি হল সতীনাথ?"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সতীনাথ বলিল, "তারপর আর কি হওয়ার আশা করেন দিদি? হিন্দুসমাজ এই মেয়েটীকে গ্রহণ করবে, তার স্বামী আবার আগেকার মতই স্ত্রীকে স্ত্রীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা করবে, তাই আশা করছেন? সে আশা যদি করে থাকেন বুঝবেন ভুল করেছেন; হিন্দু-সমাজের এমন উদারতা আজও হয়নি—জানিনে, কোন দিন হবে কিনা। নরাধম দুর্ব্বৃত্তেরা স্বামীর পাশ হতে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাবে, স্বামী তখন

বাধা দিতে পারে না, পরে বীরত্বের আস্ফালন করতে জানে। এই যে এই মেয়েটী সকলের ত্যক্ত হল—সমাজ তাকে আশ্রয় দিলে না, স্বামী তাকে আশ্রয় দিলে না—এখন সে যাবে কোথায়—সে দাঁড়াবে কোথায় দিদিমণি ?”

রমেন বিকৃত কণ্ঠে বলিল, “তার দাঁড়াবার জায়গার অভাব হবে না সতীনাথ। এ দেশে হিন্দু ছাড়াও অন্য অনেক জাতি আছে, অন্য সমাজ আছে, তারাও আশ্রয় দিতে পারে।”

স্বপন হাত তুলিল, অসহিষ্ণুভাবে বলিল, “চুপ কর রমেন, আমায় সব শুনতে দাও—সব ভাবতে দাও, তারপরে যা হয় হবে।”

সতীনাথের পানে চাহিয়া সে বলিল, “সমাজ তা হলে এ মেয়েটীকে ত্যাগ করলে সতীনাথ ?”

সতীনাথ উত্তর দিল, “করলে বই কি।”

স্বপন বলিল, “তার স্বামীও ত্যাগ করলে ?”

সতীনাথ নীরবে মাথাটা কাত করিয়া উত্তর দিল।

একটু থামিয়া স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, “মেয়েটীর অপরাধ ?”

সতীনাথ মৃদু হাসিল, “ওই যে বললুম দিদিমণি, অপরাধ বড় কঠিন কেন না অপর পুরুষ তাকে স্পর্শ করেছে, তাকে নিয়ে গেছে—অন্য জায়গায় সে এক রাত কাটিয়েছে। হিন্দুর জাতটা ভারী ঠুনকো জিনিস কিনা দিদিমণি, একটু ছোঁয়া লাগলেই এ জাত তখনি চলে যায়। এ সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম নয় দিদিমণি, যা উদারই ছিল, ছোঁয়া বা বাতাস লাগলে যা ভেঙ্গে যেত না। এ ধর্ম্ম ক্রমে সঙ্কীর্ণ হতে হতে এখন এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে যে একটা সূচ পর্য্যন্ত যাওয়ার পথ নেই।”

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বপন বলিল, “যে সমাজে বাস করে

লোকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না—সেই সমাজের এতটা উৎপীড়ন যে বড় অসহ্য সতীনাথ। আমার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম তো এ নয়, সে তো আঁকা চিত্র নয়—তার যে প্রাণ আছে ভাই। স্বামী নিজের বাহুবলে স্ত্রীকে রক্ষা করতে অসমর্থ, অথচ সে যে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারবে এমন শিক্ষা—এমন সুযোগ তাকে তার জীবনের মধ্যে দেওয়া হয় নি, এতে সে কোনক্রমে দৈবানুগ্রহে নিজেকে পবিত্র রেখে ফিরে এলেও সহানুভূতি দেখানো দূরে থাক, তাকে আরও উৎপীড়ন করা। ছিঃ ছিঃ, কাকাবাবু আমায় একদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন, আমি মোহে ভুলেছিলুম—গলদ কোথায় রয়ে গেছে তা দেখিনি।”

সতীনাথ মলিন হাসিল, “ঠিক বলেছেন দিদি, গলদ যে কোথায় তা দেখেন নি। যারা জড় হয়ে রয়েছে, তারা অন্যকে উদ্ধার করবে কি, নিজেদেরই উদ্ধার হওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই এ কথা জানেন তো? দেশে ঢের শিক্ষিত ভদ্রলোক আছেন যাঁরা দেশের বাইরে অর্থাৎ কলিকাতায় বা অন্য কোথাও জোর গলায় বক্তৃতা করছেন, এ রকম মেয়েদের ত্যাগ করা হবে না, এ রকম শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কয়েক-জনকেও সেখানে দেখতে পেলুম, কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য—কথার অনুরূপ কাজ করতে কাউকেই দেখলুম না, এ নারীকে নিয়ে যে ঘর করা চল্‌তে পারে না, সকলের মুখেই এই এক কথা শুনতে পেলুম। বড় দুঃখ হল দিদি, তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি এর প্রতিবিধান করবার জন্যে।”

স্বপন যেন চমকাইয়া উঠিল, “আমি—আমি কি করব সতীনাথ?”

সতীনাথ বলিল, “কি করতে পারব বললেই তো চলবে না দিদিমণি, নারী হয়ে নারীকে রক্ষা করতে কাল গিয়েছিলেন, আজ হিন্দু হ’য়ে

হিন্দুকে রক্ষা করতে পারবেন না? হিন্দু যদি হিন্দুকে আশ্রয় না দেয়, হিন্দু ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে যে—হিন্দুর অস্তিত্ব কিছু থাকবে না। মেয়েটী হয় বিপথে যাবে, নয় বাধ্য হয়ে তাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে হবে—আপনি তাই দেখতে পারবেন দিদি? এক রাক্ষসের হাত হতে তাকে উদ্ধার করেছেন, এ রাক্ষসের হাত হতে তাকে আপনাকেই উদ্ধার করতে হবে।"

স্বপন অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়া রহিল।

রমেন ডাকিল, "দিদি—"

স্বপন মুখ ফিরাইল, শান্ত চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, আমিই তার ভার নেব, কেউ তাকে আশ্রয় না দেয় আমিই আশ্রয় দেব। ঠিক কথা বলেছ—হিন্দু হিন্দুকে রক্ষা না করলে কে তাকে রক্ষা করবে? প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম গড়িয়ে অতলে যাচ্ছে তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে—তাকে টেনে তুলতে হবে—এ রকম ভাবে তাকে যেতে দেওয়া হবে না।"

দুপুরে সতীনাথ আবার যখন ফিরিল, তখন তাহার সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা নিভা। চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল, বুক তাহার দুরু দুরু কাঁপিতেছিল। আজ তাহার এ জগতে কোথাও আশ্রয় নাই, তাহার স্বামী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, ভ্রাতার নিকট গিয়াছিল সেও তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই। সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজবাসী কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না।

কক্ষমধ্যে সে প্রবেশ করিতে পারিল না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। সতীনাথ তাহাকে এত ডাকিল, সে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না।

স্বপন তখন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল এ দেশের সংস্কারের কথা—সমাজের আড়ম্বরপূর্ণ শাসনের কথা। সংসার নিত্য নূতন মূর্ত্তিতে তাহার চোখের সম্মুখে সাজিয়া আসিতেছিল, এক বিপদের ধাক্কা সামলাইতে আর একটা বিপদ আসিতেছিল, সে যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

সতীনাথ প্রবেশ করিতেই সে তাহার পানে চাহিল, "সে আসে নি সতীনাথ?"

সতীনাথ বলিল, "এসেছে দিদি, ঘরে কিছুতেই আসতে চাচ্ছে না, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছ।"

"কেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো নিভা, ঘরে এসো—আমি ডাকছি, আমার কথা শোনো।"

কম্পিতপদে নিভা কক্ষে প্রবেশ করিল।

শান্তকণ্ঠে স্বপন বলিল, "এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন তুমি? সমাজ তোমায় ত্যাগ করেছে—স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছে, আমি তোমায় সাদরে গ্রহণ করছি। হিন্দু আমি—তাই হিন্দুকে রক্ষা করছি, নারী আমি—তাই নারীকে রক্ষা করছি। তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমায় বোনের মত ভালবাসব—আদর করব, যত্ন করব। তোমার স্বামীকে আমি নিয়ে যাব, যাতে তোমায় গ্রহণ করে তা করব। ভাবনা কেন বোন, কাঁদছ কেন? নিজের 'পরে নির্ভর করতে পারছ না—আমার 'পরে নির্ভর কর।"

সেইদিন বৈকালে বিদায়ের পূর্ব্বে মাসীমাকে ডাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে স্বপন বলিল, "তোমার কিছু করতে পারলুম না মাসীমা, আমার আর কিছু নেই যে তোমায় দেব। গলার এই হার ছড়া তোমায় দিয়ে যাচ্ছি,

সোনা এতে বেশী নেই কিন্তু যে পাথর কয়খানি আছে এর দাম অনেক হবে—তাতে তোমার কিছুকাল বেশ চলে যাবে। আর এ জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, আমার সব দোষ মাপ করো মাসীমা—মনে করো আমি বড় অভাগিনী, তাই আমার সময়েই তুমি তোমার এত কালের বাসস্থান হারিয়ে ফেললে।"

শরৎকালীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "মা, তোমার গলার হার আমি জীবন থাকতে নিতে পারব না। আমার যত কষ্টই হোক সে কষ্ট আর তত ব্যথা দিতে পারবে না, কষ্ট এখন সব সয়ে গেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে দিন কেটে যাচ্ছে—কেটে যাবেও, তোমার গলা আমি প্রাণধরে খালি করতে পারব না মা।"

স্বপনের মলিন মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে ধীরকণ্ঠে বলিল "তা বললে হবে না মাসিমা, তোমায় এ হার ছড়া নিতেই হবে। তোমার জামাইয়ের কঠিন ব্যায়রাম, মেয়ে নাতি সব অসুখে পড়ে, এদের ওষুধ পথ্য তুমি যোগাবে কি করে? আর দিন সাত আট বাদে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে—কোথায় গিয়ে এ রকম অবস্থায় দাঁড়াবে তা একবার মনে করে দেখেছ কি? আমি জানি আমার হারের এই পাথরগুলো কিনতে প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা লেগেছিল, এই টাকাটা এই সময়ে পেলে তোমার কতটা উপকার হবে সেটা ভেবে দেখ। ফিরিয়ে দিয়ো না মাসীমা, এ তোমায় নিতেই হবে।"

অগত্যা শরৎকালীকে হাত পাতিয়া তাহার গলার হার গ্রহণ করিতে হইল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া শূন্য হৃদয়ে স্বপন দেশের নিকট হইতে চিরবিদায় লইল।

২৫

হঠাৎ প্রভাতকে দেখিয়া কল্যাণী একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন! তিনি আশা করেন নাই, প্রভাত পত্রাদি না দিয়া মিরাট হইতে বরাবর কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একি, প্রভাত যে!"

প্রভাত শুষ্ক হাসিয়া দিদির পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "অনেককাল তোমাদের দেখি নি দিদি, মনটা কি রকম হয়ে গেল, তাই চলে এলুম।"

কল্যাণী ভাইকে বসাইয়া তাড়াতাড়ি একখানা হাতপাখা লইয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে করিতে বলিলেন, "একখানা টেলিগ্রাফ করলেও তো পারতিস্?"

প্রভাত বলিল, "সময় পেলুম না। তোমায় বাতাস করতে হবে না দিদি—তুমি বসো। তোমরা কেউ আজ একমাসের মধ্যে একখানা পত্র দিতে পার নি, মায়াটা এমন করে—এত সহজে যে কি করে কাটাতে পারলে আমি কেবল তাই ভাবি। এই যে তিনটী বছর গেছি, একখানা পত্রে আসবার কথা লিখতে পেরেছিলে কি?"

কল্যাণী মুখভার করিয়া বলিলেন, "অমন নেমকহারামি কথা বলিস নে প্রভাত, সব মিথ্যে কথা! তোকে কতবার আসবার জন্যে পত্র দিয়েছি—সে পত্রের মোটে উত্তরই দিস নি। তোর পত্রের ফাইল খুঁজে দেখিস দিকি—আমি লিখেছি কিনা? মিথ্যে করে একজনের ঘাড়ে দোষ চাপানো—"

হাসিয়া উঠিয়া প্রভাত বলিল, ‘‘ধর্ম্মে সইবে না, না দিদি ?”

“জানি নে বাপু, আমায় বকাস নে ও সব কথা নিয়ে—”

বলিয়া কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন, প্রভাত নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

কল্যাণীর রাগ তখনই বিলীন হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেখানে ভাল ছিলি তো প্রভাত ?”

প্রভাত বলিল, “দেখতেই পাচ্ছো। রোগা একটুও হইনি বরং মোটাই হয়েছি মনে হচ্ছে। তোমার চোখের দোষ হয়েছে দিদি, নইলে দেহের পরিবর্ত্তনটা চোখে ঠেকল না কেন ? যাওয়ার আগে যদি দেহের ওজন রেখে যেতুম, ফিরে এসে ওজন করে হাতে হাতে প্রমাণ দিতুম, কতটা আরও ভারি হয়েছি, মাংস কতটা বেড়েছে।”

কল্যাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “থাক থাক—মোটা যে কত হয়েছিস তা দেখতেই পাচ্ছি। তোর ওই মিথ্যে জারী করা শুনলে আমার সত্যিই রাগ হয় প্রভাত।”

গম্ভীর মুখে প্রভাত বলিল, “তবে আর এ সব কথা বলে কাজ নেই, সংসারিক কথাবার্ত্তা হোক। মিনু কোথায়, তাকে যে দেখতে পাচ্ছি নে ? সে ভাল আছে তো ?”

কল্যাণী বলিলেন, “এখন বেশ ভালই আছে, আর জ্বর হয়নি তার।”

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, ‘তার ঘাড়ে যে ভূতটা চেপেছিল সে নেমে গেছে তো ?”

কল্যাণী উদাসভাবে বলিলেন, “বোধ হচ্ছে তো, তারপর আবার কোন মুহূর্ত্তে ভূতটা এসে ঘাড়ে চাপবে তা তো জানি নে। থাকে তো ভাল—হঠাৎ কারও পরামর্শ পেয়ে অমনি হয়ে যায়। দিন কত স্বপনের

সঙ্গে মিশে অধঃপাতে যাচ্ছিল, স্বপনের কাছ ছাড়া করলেও কমলা তাকে মন্ত্রণা দিচ্ছিল। এখন কমলাকে তার কাছ ছাড়া করেছি—সে অনেক নরম হয়েছে। যা বলছি তাই শুনে যাচ্ছে, আর একটী কথা বলছে না। এই তো সন্তানের উচিত কাজ—বাপ মা যা বলবে তাই শুনে যাওয়া। এ না করার জন্যে তাকে কত না কষ্ট দিয়েছি, কত না পীড়ন করেছি, নিজেও তো বড় কম সইনি ভাই। সন্তানকে কাঁদিয়ে গোপনে যে মায়েরও চোখের জল পড়ে তা তো কেউ তোরা ভাবিস নি—জানিস নি। এখন একেবারে বদলে গেছে ভাই, আর সে মিনু নেই।”

প্রভাত গম্ভীর হইয়া বলিল, “তাই হোক দিদি, ভগবান্ তার সুমতি দিন—তাইই প্রার্থনা করি। হরেনবাবু কোথায়?”

কল্যাণী বলিলেন, “এই ঘণ্টাখানেক আগে কোথায় গেছেন, এখনি এলেন বলে। কেমন করে জানবেন তুই আসবি, খবর তো কিছু দিস নি।”

প্রভাতের পরিচর্য্যায় লোক নিযুক্ত করিয়া তিনি তাহার আহারের উদ্যোগে গেলেন।

মামা আসিয়াছেন শুনিয়াও মৃন্ময়ী আসিল না, তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইল না; প্রভাত নিজেই তাহার খোঁজে গেল।

এই বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—এ যে স্বপনের বাড়ী। ছোটবেলা হইতে যে এই বাড়ীতে মানুষ হইয়াছে, সে আজ জোয়ারের টানে কোথায় ভাসিয়া গেল? তাহার স্থানে আসিয়া পড়িল কে? এই বাড়ীর প্রতি স্থানে স্বপনের স্মৃতিমাখা; প্রভাত তখন বালক মাত্র যখন সে এতটুকু মেয়ে স্বপনকে এই বাড়ীতেই দেখিতে পাইয়াছিল।

স্বপন যে কক্ষে থাকিত, মৃন্ময়ীর জন্য সেই কক্ষটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কক্ষটী তেমনই সুসজ্জিত রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় না গৃহের প্রকৃত অধিকারিণী এখানে নাই, সে যেন কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে।

প্রভাত একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। এই কক্ষটার পানে চাহিয়া তাহার হৃদয় বেদনায় ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিতেছিল ; একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কতকটা ব্যথা হালকা করিয়া ফেলিয়া সে দরজার পর্দ্দা সরাইল।

মিনু একখানা চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, বোধ হয় কোন অজানিতের ধ্যানে সে মগ্না।

কাল তাহার বিবাহ—মা বাপ সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিয়াছেন। অসীম সাহসে ভর করিয়া সে কাশীতে ঠাকুরদাকে পত্র দিয়াছে—তিনি যেন—যদি তাহার স্বামী জীবিত থাকেন তাঁহাকে জানান, এবং যদি তাহার স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে আজ দ্বিপ্রহর রাত্রে গোপনে তাঁহার আসা চাই ; সে গোপনে স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া যাইবে।

সে তাহাই ভাবিতেছিল—আজ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে ; তাহার পর—তাহার পর বাধ্য হইয়া তাহাকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, নহিলে বাঁচিবার উপায় নাই। তাহার সম্মুখে জীবন-মৃত্যু হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; জীবনের পিছনে আলো —মৃত্যুর পিছনে অন্ধকার ; কে জানে সে আলো পাইবে না, অন্ধকার পাইবে ?

অন্তর তাহার গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, আলো চাই—ওগো,

আলো চাই। অন্ধকারকে আমি যে সহিতে পারি না, অন্ধকার দেখিলে আমি যে বড় ভয় পাই।

আলো পাওয়া—সে যে ভগবানের হাতে, আলো না পাইলে অন্ধকার মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে। এই মৃত্যুর রাজত্বের ওপিঠে আলো কি মিলিবে না, সেখানে কি জীবিতের সাড়া পাওয়া যাইবে না?

প্রভাত প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, "মিনু—"

মিনু হঠাৎ বড় বেশী রকমই চমকাইয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া সে শুধু চাহিয়াই রহিল, একটা কথা কহিতে পারিল না।

বড় রোগা হইয়া গিয়াছে সে, মুখখানা বড় মলিন, চোখে ভীতার্ত্ত ভাবটাই ফুটিয়া উঠিতেছে। মা তাহার যে আনন্দ বিকাশের পরিচয় দিলেন, সে আনন্দ কই?

প্রভাত অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, তাহার মাথায় সস্নেহে হাতখানা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত রোগা হয়ে গেছিস কেন মা, তোকে দেখে আর যে মোটে চেনা যাচ্ছে না!"

মৃন্ময়ীর চোখ দুইটী অকস্মাৎ জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার ঠোঁট দুখানি কাঁপিতে লাগিল, আত্মভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়াই সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

প্রভাত একখানা চেয়ার সরাইয়া আনিয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, "হ্যাঁ মা, কতকাল পরে ফিরে এলুম তোদের কাছে, সাড়া পেয়েও কি একবার দেখা করতে যেতে পারলি নে? এই তিন বছরের মধ্যেই কি তোর মামা একেবারে এত পর হয়ে গেল রে?"

মৃন্ময়ী সজল চোখ দুটি তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমায় সে খবর কেউ দেয় নি তো মামা।"

প্রভাত মলিন হাসিয়া বলিল, "এত কথাবার্ত্তা—গোলমাল কিছুই কি তোমার কানে যায় নি মা ?"

মিনু মাথা নাড়িল, "কিছু না মামা, আমি কিছু শুনতে পাইনি। নিজের ভাবনাতে এত আত্মহারা হয়ে পড়েছিলুম, তুমি যে এসেছ—বাড়ীতে এত গোলমাল, কিছুই আমার কানে যায় নি।"

প্রভাত জিজ্ঞাসা করিল, "এত ভাবনা কিসের মা ?"

মৃন্ময়ী সজলচোখ দুটি মেলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, প্রভাতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

প্রভাত বেদনাভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাকেও এত পর ভাবছিস মিনু, তোর কথা বিশ্বাস করে আমাকেও বলতে পারছিস নে ? এত সন্দিগ্ধ মন হয়েছে তোর মা ?"

দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিয়া উঠিল, "তাই বটে মামা, এতই সন্দিগ্ধ মন হয়েছে তোমার মিনুর। সন্দিগ্ধ না হয়েই বা করব কি মামা, এখানে কেউ যে বিশ্বাস রাখতে পারে নি, যাকে বিশ্বাস করেছি সেই অবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। নিজের বাপ মাকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসী ভেবেছি, তবে আর কাকে—কি করে বিশ্বাস করব মামা ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে রোদন ঝরিয়া পড়িতেছিল,—প্রভাত তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অভাগিনী তুমি, তাইতেই এ রকম কষ্ট পাচ্ছো। কিন্তু মা, তোমার চেয়েও অভাগা তোমার বাপ মা, তারা চিনেও চিনতে পারলে না, জেনেও জানতে পারলে না তোমাকে। বড় অভাগা তারা যারা সন্তানের কাছে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেও সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে নি

আমি তো মা তোর কাছে বিশ্বাস হারানোর কোন কাজ করিনি, আমার মনে হয়—বরাবর তোর বিশ্বাস রেখে এসেছি। মা বাপকে বিশ্বাস করতে পারিস নি, ছেলেকে বিশ্বাস করে দেখ ; তুই যে আমার মা মৃন্ময়ী, আমি তোর ছেলে যে ?”

“মামা—”

মৃন্ময়ী মামার কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ঝর ঝর অশ্রুধারায় কোলটাকে আর্দ্র করিয়া দিল।

প্রভাতের চোখে জল আসিল, সে অতিকষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল, “কাঁদছিস কেন মা ? জ্ঞানহারা মেয়ে তুই নোস মিনু, সব বুঝে অমন করে আত্মহারা হয়ে পড়লে কি চলে পাগলী ? তোর কোন্ কথা না আমি জানি, তোর কোন কথাই তো আমার কাছে গোপন নেই মা। সতী মেয়ে তুই, কার সাধ্য তোর এতটুকু অনিষ্ট করে ; মানুষ দূরে থাক—ভগবান নিজেও তোর অনিষ্ট করতে পারবেন না। নারীর যে শক্তিবলে সে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ঠেকাতে পারে, তোর সে শক্তি আছে, তাই জগৎকে তুই পরাস্ত করেছিস, মৃত্যুকে তুই হার মানিয়েছিস। ওঠ মা মিনু, যতটুকু পরীক্ষা তোর আবশ্যক ছিল তা শেষ হয়ে গেছে, তুই বিজয়িনী হয়েছিস। মৃত্যুকে আহ্বান করে ছিলি মা, সতীর তেজে মৃত্যু দগ্ধ হয়ে পালিয়েছে, তোর স্বামীকে কাছে এগিয়ে দিয়ে গেছে। রাত্রে সে আসবে—আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।”

মৃন্ময়ী উঠিতে পারিল না, তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

প্রভাত একটু নীরব থাকিয়া বলিল, “তোর ছেলেকে যতটা তোর

ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখেছিলি ততটা নিশ্চেষ্ট সে থাকে নি। আমি কলকাতায় আসবার আগে কাশী গিয়েছিলুম, সেখানে জ্যোতীশকে দেখতে পেয়েছি। আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, তাকে একটা হোটেলে রেখে এসেছি; কথা আছে সে রাত্রে এসে লুকিয়ে তোকে নিয়ে যশোরে চলে যাবে।"

মৃন্ময়ী তথাপিও উঠিল না, তেমনিভাবে পড়িয়া রহিল।

প্রভাত তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "আমার কাছে গোপন করবার চেষ্টা কেন করছিস মা? আমি তোর পত্র পাওয়ার পর হতে কতটা ব্যগ্র হয়ে ছিলুম আসবার জন্যে, তা তুই জানিস নি। কত করে ছুটি পেয়েছি তা তুই জানবি কি? এবারে তোর সব বন্দোবস্ত ঠিক করে যাব বলেই এসেছি। যদি জ্যোতীশের কোন সন্ধান না পেতুম, আমি যেমন করেই হোক্ তোর বিয়ে ভেঙ্গে দিতুম, তোকে জোর করে আমার কাছে নিয়ে যেতুম, মা ছেলে সুখে সেখানে থাকতুম। ভগবান জ্যোতীশকে মিলিয়ে দিলেন, তার পরিচয় পেলুম, তার শিক্ষা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারিনি। ভগবান যোগ্যে যোগ্য মিলিয়ে দেছেন; প্রার্থনা করছি তোর সংসার-জীবন যেন সুখপূর্ণ হয়।"

"প্রভাত—এখনও তুই এ ঘরে বসে আছিস বাপু, গল্প না হয় এর পরেই হবে এখন, এখনকার কাজ যা আগে তা সেরে নিয়ে—"

কথাটা সমাপ্ত করিবার আগেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার কথার সাড়া পাইবামাত্র মৃন্ময়ী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, তাহার মুখে চোখে অশ্রুজলের দাগ ছিল সেগুলা ক্ষিপ্রহস্তে মুছিয়া ফেলিল।

দরজার পর্দা দাসী সরাইয়া দিল, কল্যাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করি-

লেন। তাঁহার এক হাতে একখানা বড় ডিসে খাবার সাজানো, আর একহাতে টি-পট। দাসী টেবলের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বই খাতা প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিয়া চায়ের কাপ প্লেট সাজাইয়া দিল।

"বেশ লোক তো তুই প্রভাত, আমি তাড়াতাড়ি করে খাবার এনে খুঁজে দেখি কোথাও নেই, শেষে এ ঘরে সাড়া পেয়ে ছুটে আসি। ক দিন খাস নি, নে আগে জল খা, তারপর খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।"

প্রভাত তাঁহার হাত হইতে তাড়াতাড়ি খাবারের ডিসখানা নামাইয়া লইয়া বলিল, "মিনুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি দিদি। বড্ড রোগা হয়ে গেচে, দেখে মোটে চেনা যাচ্ছে না তাই বলছিলুম।"

কল্যাণী কন্যার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "ও তবু ভাল দেখছিস, অনেকটা তবু সামলে উঠতে পেরেছে। যে চেহারা হয়েছিল তাতে কেউই ভাবে নি ও আমার বাঁচবে।"

প্রভাতের কাছে তিনি নিজে হইতে কোনমতেই উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না আগামী কল্য মৃন্ময়ীর বিবাহ হইবে। কয়েক বার বলি বলি করিয়া বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠ এড়াইয়া আসিয়াছিল, কাজটা যে অবৈধ, হৃদয়ের কাছে তো ইহা গোপন নাই। মানুষ সত্যকে চাপা দিয়া বাহিরে মিথ্যার অকপট অভিনয় করিয়া গেলেও মনে তাহার সত্যই জাগিয়া থাকে, সে সত্যকে তো চড় মারিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখা যায় না, সে নিদ্রিতের ভাণে পড়িয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে নড়িয়া উঠে, এদিক ওদিক উঁকি দেয়। কল্যাণী মুখে যতই আস্ফালন করুন না, মনে একটু কুণ্ঠিতা হইতেছিলেন, একটু ভয় পাইতেছিলেন, যদি মিনুর স্বামী বাঁচিয়া থাকে—যদি পরে সে গোলমাল করে তাহা হইলে তিনি লুকাইবেন কোথায়?

কিন্তু এক একটা মানুষের মনের গতির বেগ অসম্বরণীয় হইয়া থাকে, রাশ ছাড়িয়া দেওয়া দুর্দ্দমনীয় অশ্বের মত এমন ছুটিয়া বেড়ায়, একেবারে শেষস্থানে উপস্থিত না হইয়া এ থামিতে পারে না। হয় তো জ্ঞান আছে, অন্যায় হইতেছে, তথাপি এ অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার শক্তি তাহার নাই। কল্যাণীর প্রকৃতি ঠিক এই রকমই ছিল এবং মনও সেইজন্য দুর্দ্দমনীয় বেগ ধরিয়া ছুটিতেছিল।

এখনও তিনি কন্যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, বিবাহটা শেষ হইয়া গেলে তিনি আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন, তাহার পর ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবার অবশ্য তাহাই ঘটিয়া যাইবে।

প্রভাতের প্রকৃতি তিনি জানিতেন। প্রথম এ কথাটা তাহার সম্মুখে তুলিবামাত্র সে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল,—এ কাজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ। কোনও ক্রমে আইনকে ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। প্রভাত ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া সে নিজে চলে, সকলকে চলিতে উপদেশও দিয়া থাকে। কল্যাণী ভাবিয়াছিলেন বিবাহের আগে কোন কথা প্রভাতকে জানানো হইবে না, বিবাহের পরে তাহাকে একখানি পত্র দিবেন এবং নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইবার অনুরোধ করিবেন। প্রভাত আকস্মিক আসিয়া পড়ায় তিনি থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রভাত বলিল, "ভাল কথা দিদি, একটা কথা মনে পড়ল। কথাটা শুনলুম সুনীল মিত্রের সেদিনকার পত্রে—অথচ তোমরা কেউ-ই আমায় সে কথা জানাও নি। মিনুর নাকি কাল বিয়ে হচ্ছে—আমায় সে কথা জানাতে নেই কি ?"

কল্যাণীর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, তিনি খানিকটা এদিক ওদিক চাহিয়া অস্ফুটে কি বলিয়া গেলেন তাহার মর্ম্ম ভেদ করা দুরূহ ব্যাপার।

প্রভাত তাঁহার শুষ্ক মুখখানার পানে তাকাইয়াছিল, গম্ভীর স্বরে বলিল, "পাছে আমি অমত করি এই ভয়ে তোমরা কেউ আমায় জানাও নি। এতে আমার অমতে আর কি হবে দিদি? তোমরা যার বিয়ে দিতে যাচ্ছো তার মত নেওয়াই হচ্ছে আসল কথা—আমার মতের মূল্য কি? তোমরা আমায় কোন কথা জানাও নি বলে আমার বড় কষ্ট হলেছিল—তার পর,—না যাক সে কথা। মিনুর বিয়েতে মত আছে জেনে সুস্থ হয়েছি। তোমরা যা করছো তা বাপ মায়ের কর্ত্তব্য কিনা সে বিচার আমি করছি নে; যাই হোক, কাল দিনটা কাটলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

কল্যাণী স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। বড় ভাবনা ছিল প্রভাত হয় তো বিরুদ্ধ মত জাহির করিয়া বসিবে, মিনু মামাকে দলে পাইয়া স্ফীত হইয়া উঠিবে; প্রভাত যে নিজে এ ব্যাপারের মধ্যে না জড়াইয়া পড়িয়া নিঃশেষে বিচারের ভারটা পর্য্যন্ত পিতামাতার হাতে তুলিয়া দিল, ইহা যথার্থ শান্তিকর হইলেও নিভৃতে গোপন হিয়ার মাঝে ব্যথার কাঁটা হানিয়া যায়।

তিনি বলিলেন, "সেই আশীর্ব্বাদ কর ভাই—যেন কাল দিনটায় আমার মান মুখ রক্ষা হয়। সত্যি চোখে দেখে বল আমরা ভাল করছি না মন্দ করছি। হ্যাঁ—মিনুর বিয়ে হয়েছিল সে কথা না হয় মেনেই নিলুম,—তেমনি প্রমাণও দিচ্ছি সে মরে গেছে। এ হিন্দু-সমাজের মেয়ে নয় যে ছোটবেলায় যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে মরে গেলেও তার স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটাতে হবে? আর তার স্মৃতিই বা

কি ? নয় বছরের মেয়ের একটা রাতের কথা তেমন কিছু মনে থাকতে পারে না, যা নিয়ে তার দীর্ঘ জীবনটা সে কাটিতে দিতে পারে। আজ কাল হিন্দুসমাজের লোকেরাও বিধবার বিয়ে দিচ্ছেন, তুই দেখতে পারিস প্রভাত—নিত্য কাগজে কত খবর বার হচ্ছে। আমরা মিনুর মা বাপ, তার অনিষ্ট করছি নে, করতে গেলে ভালই করব সেটা তুই একবার ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দে।”

স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে—মা কেমন করিয়া এই মিথ্যা কথাটা মুখে আনিতে পারিলেন ? মৃন্ময়ীর মুখখানা একবার বিকৃত হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইল।

প্রভাত তাহা লক্ষ্য করিল, সে বলিল, “সে কথা যথার্থ দিদি, মা বাপ সন্তানের অনিষ্ট কখনও করতে পারেন না। বোকা মেয়েটা যদি তা বুঝতো তা হলে নিজেই কি এতদিন এই কষ্টটা পেত, না তোমাদের এই কষ্টটা দিত ? কিন্তু একটা কথা দিদি—”

অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিলেন, “তুই চুপ কর প্রভাত, আর তোকে ওই কিন্তু-মিন্তুগুলো যোগাতে হবে না। উনি বাড়ী এসেছেন, তোকে ডাকছেন—চা খেয়ে নিয়ে ওঁর কাছে যা, আমি ততক্ষণ তোর খাবার যোগাড় দেখি।”

প্রভাত ডিসের খাবার ও চা নিঃশেষ করিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, “যা খাবার দিয়েছ দিদি, এখনি আবার যোগাড় না করলেই চলে। একেবারে রাতের দিকে সকলের সঙ্গে খাওয়া হবে এখন, তোমায় অনর্থক অতটা ব্যস্ত হতে হবে না।”

দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “স্বপনের জমিদারী আমার নামে তোমরা কিনে ফেলেছ দেখলুম।”

কল্যাণী বলিলেন, "সে কথাতো অনেক আগেই তোকে জানানো হয়েছে, সে পত্র পাস্ নি বুঝি?"

প্রভাত চিন্তিত মুখে বলিল, "না, সে পত্র আমি পাইনি। সে দিন কাগজে দেখলুম হরেনবাবু আমার নামেই সেটা কিনে ফেলেছেন। কিন্তু আমি বলছি কি দিদি, আমায় এর মধ্যে না জড়ালেই ভাল হতো না কি, আমার নামে না করে তাঁর নিজের নামে করলেই তো হতো? আজকালকার দিনে কেউ নিজের ছেলেকে বিশ্বাস করে না, তোমরা আমায় এতটা বিশ্বাস করে ফেললে?"

কল্যাণী হাসিমুখে বলিলেন, "সে রকম ছেলে হলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু ছেলের মত ছেলে হলে বিশ্বাস করতেই হয়। তুই আমার সেই ভাই প্রভাত—যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারা যায়। আমায় তুই বড় ভালবাসিস প্রভাত, মা মারা গেলে দেড় বছরের ছেলে তোকে আমি মানুষ করেছি, পেটের সন্তান আর তোতে পার্থক্য কতটুকু বল দেখি? তোর নামে জমিদারীটা কেনা হয়েছে, দু তিন বছর বাদে তিনি নিজের নামে করে নেবেন। তোর সঙ্গে সেই সব বিষয় নিয়েই ওঁর কথাবার্ত্তা হবে তাই তোকে ডাকছেন। চক্ষুলজ্জাটা আছে তো! জমিদারী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি উনি কিনে নিতেন, লোকে নিন্দে করত কি কম?"

এখনও চক্ষুলজ্জা, অথচ কথাটা না জানিতেছে, না বলিতেছে, এমন লোকই নাই। প্রভাতের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, তখনই সে হাসি সামলাইয়া লইয়া গম্ভীর মুখেই বলিল, "তা বেশ করেছেন। আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি, একটু তাড়াতাড়ি করে যাতে নামটা আমার ও সব ব্যাপার হতে এড়িয়ে দিতে পারেন, তারই চেষ্টা করব।

জমিদার বলে লোকের যে সেলাম কুড়ানো—সেটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। আচ্ছা দিদি, স্বপন তার জমিদারী বিক্রী করে কোথায় গেছে তা বোধ হয় জানো না ?"

দারুণ বিরক্তিতে কল্যাণীর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "কে জানে কোথায় গেছে সে। মাঝে একবার নাকি আনন্দপুরে গিয়েছিল, তারপর এখানে এসেছিল। সম্ভব ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীতেই আছে। ডাক্তার গুপ্ত ভবানীপ্রসাদের শিষ্য, আর তার বাপের বন্ধু ছিলেন তাতো জানো ?"

প্রভাত বলিল, "শুনেছি। ভবানীপ্রসাদ আর বোধ হয় আসেন নি ?"

কল্যাণী বলিলেন, "কেন, এলে পরে তুইও তাঁর কাছে মন্ত্র নিবি নাকি ?"

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "না, যেহেতু আমি খৃশ্চান। কেউ যে কারও ধর্ম্মমত সহজে বিসর্জ্জন দেবে সেটা আমি আদতেই পছন্দ করিনে, সেই জন্যে স্বপনের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কথা শুনে আমি প্রথমেই অসম্মতি দিয়েছিলুম সে কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। তাঁর সঙ্গে আমার গোটাকত কথা ছিল। তাঁকে চেন না দিদি, একদিন যাওয়ার সময় সে পরিচয় তোমায় দিয়ে যাব,—আজ বলব না।"

সে বাহির হইয়া গেল।

২৬

ভদ্রতার খাতিরে পূর্ব্ব দিন ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীতেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। স্বপন যে আসিবে না এবং তাহার জন্যই ডাক্তার গুপ্তের বাড়ীর কেহ আসিবেন না, তাহা কল্যাণী বেশ জানিতেন।

সমস্ত রাত্রি দারুণ উৎকণ্ঠায় তিনি চোখের পাতা বুজাইতে পারেন নাই। ভোরের আলো পূব আকাশে ঝিলিক দিয়া উঠিতেই তিনি কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন এবং ত্রস্ততার সহিত দাসদাসীদের এক একটা কাজে লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার কয়েকটী মহিলা বন্ধু গত কল্য হইতে রহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা রন্ধনের ব্যবস্থার দিকে ছিলেন।

দাসদাসীদের কাজ তাঁহার পছন্দ হয় না। গৃহাদি পরিষ্কার করিতে, এ ঘর ও ঘর ছুটাছুটি করিতে এক সময় অতি সুন্দর কাঁচের ফুলদানিটা তাঁহার পা লাগিয়া ঝনঝন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

প্রভাত হাসিয়া বলিল, "কি করলে দিদি, এটাকে এমন করে ভেঙ্গে ফেললে ?"

উপেক্ষার সহিত কল্যাণী বলিলেন, "যাক গিয়ে, এরপর ওর একটা জোড়া মিলিয়ে রাখলেই হবে।'

বেলা হইয়া উঠিল, দলে দলে মেয়েরা আসিয়া বাড়ী ভর্ত্তি করিতে লাগিল। মৃন্ময়ী তখনও উঠে নাই। অন্য দিন সে সকলের আগেই শয্যা ত্যাগ করে, আজ বেলা আটটা বাজিয়া গেল—তাহার বাল্য-সঙ্গিনীর দল দরজায় আঘাত করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল —বিদ্রূপ করিতে লাগিল, তথাপি সে উঠিল না, দরজা খুলিল না।

ব্যস্ত কল্যাণী প্রভাতকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু এখনও ওঠে নি প্রভাত ?"

প্রভাত বিবর্ণ মুখে বলিল, "কই না, তাকে ত দেখছি নে।"

কাল রজনী দ্বিপ্রহরে জ্যোতীশ আসিয়াছিল। প্রভাত পূর্ব্বেই দ্বারোয়ানের মুখবন্ধ করিয়াছিল ; আজ সকালে তাহাকে ভাড়া দিয়া ট্রেনে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছে, না হইলে উপস্থিত সব নির্য্যাতন ভোগ করিতে সে বেচারা একা। অশ্রুমুখী মৃন্ময়ী মামার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া যখন চিরবিদায় চাহিয়াছিল, চোখের জল ফেলিয়া প্রভাত বলিয়াছিল, "চিরবিদায় বল্‌ছিস কেন মা ? তোর বাপ মায়ের মন আবার ফিরবে, একমাত্র সন্তানের 'পর রাগ করে চিরকাল থাকতে পারবে না। এই ঘরে আবার ফিরে আসবি, আবার আমার সঙ্গে তোর দেখা হবে।"

কোন মতে চা খাওয়া শেষ করিয়া সে চোরের মত সকলের চক্ষু এড়াইয়া নিজের কক্ষে গিয়া পৌঁছাইল, দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া একখানা বই মুখের উপর চাপা দিয়া সে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, বাড়ীতে তখন হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে, কল্যাণী অস্থির পদে ছুটাছুটি করিতেছেন, হরেনবাবু ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিতেছেন।

"প্রভাত—"

প্রভাত ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, বইখানা সশব্দে মেঝের উপর গিয়া পড়িল, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে উত্তর দিল, "এই যে ঘরে আছি।"

হরেনবাবু দরজা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভাত, আমি এখন মুখ দেখাই কি করে ?"

তিনি প্রভাতের বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন, দুই হাতে তাহার দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এখন আমি কি করব তাই আমায় বলে দাও প্রভাত, আমি যে একেবারেই গেলুম। বাড়ীতে এই নিমন্ত্রিত মেয়েছেলেরা, আত্মীয়স্বজন সব এসেছেন, আমি কেমন করে এদের সামনে বার হব, কেমন করে মুখ দেখাব ? সে আমায় এমন করেও মজিয়ে গেল প্রভাত, আমার বুক যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল !"

আজ জ্ঞানে এই প্রথম তাঁহার চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল ; বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কোথায় গেল, কার সঙ্গে গেল, তা কিছুই জানতে পারলুম না। এই পত্রখানা তার টেবিলের ওপরে পাওয়া গেছে, পড়ে দেখ।"

প্রভাত পত্রখানা তাঁহার হাত হইতে লইল।

মিনু লিখিয়াছে—

মা আমার,

আজ এই চিরবিদায়ের প্রারম্ভে তোমায় যে কি বলব তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি নে। আমি এই চলেছি—জান্‌ছি তোমরা আমার এ অপরাধ কখনই ক্ষমা করবে না—আর আমার কখনও এখানে ফিরে আসাও হবে না, অতএব এই আমার চিরবিদায়।

তোমায় অনেক জ্বালিয়েছি মা, আজ এই যাওয়ার বেলায় যে সে কথা ভাবছি তা নয়, এ ভাবনার জের আমার বহুকাল আগে হতে চলতে সুরু হয়েছে। আমার ভাবনার আদি নেই অন্ত নেই, আমি দিনের পর দিন কেবল ভেবেই চলেছি, দিন দিন এ বেড়েছে বই এক-তিল কমে নি। একটী মাত্র মেয়ে তোমার আমি, কত তোমার আশা ছিল আমায় তোমার আদর্শানুরূপ গড়ে তুলবে—কিন্তু সবই যে ব্যর্থ

হয়ে গেল মা! অভাগিনী মেয়ে তোমার—তোমার আদর্শানুযায়ী নিজেকে গঠন করে তুলতে পারলে না, তোমার সব চেষ্টা, সব যত্ন ব্যর্থ হয়ে গেল।

দোষ আমার নয় মা, তাই বলে যে তোমার ’পরে চাপাব তাও নয়, দোষ তোমার নয় আমার নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। আমি অদৃষ্ট মানি—তুমিও যে মান না তা নয় মা। তোমার মেয়ের কাছে কোন কথা তো গোপন নেই মা, সে যে তার মায়ের পরিচয় ভাল রকমই জানে।

ঠাকুরদা যখন আমায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন, তখন আপত্তি করনি, আমায় ঠাকুরদার সঙ্গে যেতে দিলে। সত্যি কথা বলব মা, নিজের বুকে হাত দিয়ে বল তোমার মনে কি ধারণা ছিল না ত্যাগী ঠাকুরদার হাতে তখনও ধনসম্পত্তি আছে, সর্ব্বস্ব তোমাদের দিয়ে তিনি তোমাদের দয়ার দানের প্রত্যাশায় কাশীবাস করেন নি? তুমি জানো না—একটীমাত্র ছেলেকে সুশিক্ষিত করে তোলবার পর সেই ছেলে যদি বাপ ও ধর্ম্ম, এক সঙ্গে দুটিকেই ত্যাগ করে যায়—বাপের জীবনে তখন কি রকম ধিক্কার আসে। তিনি যথার্থই সব তোমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন, মন্দিরে ভিক্ষা করে, সত্রে খেয়ে তাঁর দিন কাটত।

তুমি ভেবেছিলে আমার স্নেহে জড়িয়ে তুমি বৃদ্ধের কাছে যা ছিল সব আদায় করবে, তাই তুমি একমাত্র বালিকা কন্যাকে ছেড়ে থাকার কষ্টকে কষ্ট বলে গ্রাহ্যের মধ্যে আননি। রাগ করো না মা—বড় সত্য কথা বলছি। ভেবে দেখ এ সত্য কথা কি না—তার পর আমার পত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলো। তোমার যা দোষ তা তোমায় স্পষ্ট আজ দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, এর জন্যে আমায় মাপ করো মা। সন্তান হয়ে

মায়ের দোষ ধরিয়ে দেওয়া যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ তা তুমি বলবে, কিন্তু সহ্যও যে হয় না মা, বুক ভেঙ্গে গেলে বুক ফেটে আপনিই যে কথা বার হয়ে পড়ে। কতদিন তোমায় বলতে গেছি, ধমক দিয়ে থামিয়ে দেছ ; আজ তো ধমক দিতে পারবে না মা, আজ আমি তোমার চোক রাঙানির বাইরে।

সেখানে পৌঁছিয়ে দেখতে পেলুম তাঁকে—আমার স্বামীকে। মা, ছোট মেয়ে বলে গ্রাহ্য করতে চাও না, কিন্তু ছোটই যে বড় হয় মা ; ছোট কথা বড় হয়ে তার মনেও যে জায়গা পায় মা—সে কথা আর ভোলা যায় না, সে ছবি আর মোছা যায় না। ঠাকুরদা তাঁকে এক কোলে বসিয়ে আর আমায় এক কোলে বসিয়ে—এক চোখে জল আর এক চোখে হাসি নিয়ে আমার পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "একে বিয়ে করবি পাগলি, তা হলে ঠিক আমার হরগৌরী মিলন করিয়ে দেওয়া সার্থক হয়।"

তোমরা বলবে ছোট মেয়ের মনে অনুরাগ সঞ্চার হয় না। ভালমন্দ সে কি বিবেচনা করতে পারে ? আমি বলছি, অনুরাগ হয়, আর তা এত গভীর হয় যে কিছুতেই ওঠে না, না হলে আমাদের এই বাংলা দেশে অনেক সংযতচরিত্রা বালবিধবা দেখা যেত না, তারা তাদের ব্রহ্মচর্য্য যথারীতি পালন করেও যেতে পারত না।

ঠাকুরদা শিব গড়িয়ে পূজো করতে বসতেন, চোখ বুজে ধ্যান করতেন—ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং প্রভৃতি। আমি তখন এর অর্থ জানতুম না, জানতে চাইলে তিনি আমায় সরল বাঙ্গলায় অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। ছোট মেয়ের প্রাণে অনুভূতি জন্মেছিল, ধারণা করলুম এই

তো সেই মূর্ত্তি। বার তের বছর মাত্র বয়েস তাঁর, আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতুম—এই আমার শিবরূপ স্বামী।

বিয়ে হয়ে গেল। তোমরা সে কথা শুনতে পেয়ে বাড়ী গেলে,—ঠাকুরদাকে কি অপমানটাই না করলে! আহা তিনি নীরবে শুধু ঝরঝর করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তারপর তোমরা আমায় বাড়ী নিয়ে এলে। আমি যেমন স্কুলে পড়ছিলুম তেমনি পড়তে লাগলুম, আমার সিঁথের সিঁদুর মুছে দিলে, আমার হাতের লোহা খুলে দিলে, আমার 'পরে কড়া পাহারা রাখলে। আগে যেমন করে বেড়াতুম খেলতুম, তেমনি বেড়াতে খেলতে লাগলুম, তোমরা আমারা মন হতে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলে, আমার বিয়ে কোনদিন কারও সঙ্গে হয়েছিল! কিন্তু তা কি মোছা যায় মা? তোমরা তা মুছবার জন্যে যত চেষ্টা করতে লাগলে আমার বুকের মধ্যে সে মূর্ত্তি ততই উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল, আমি সেই শান্ত সৌম্য শিবরূপ স্বামীর অসীম রূপসায়রে আপনাকে বিলীন করে ফেললুম।

বহুকাল পরে আর একবার কাশীতে গেছলুম, এক দিনের জন্যে, তিনিও তখন সেখানে এসেছেন। তিনি আমার সামনে এলেন না, একটী কথা বললেন না, ঠাকুরদার পাঠাবার অধিকার নেই জেনে অক্লেশে স্ত্রীকে রেখে চলে গেলেন। এমন সাহস হল না আমার, আমি তাঁর সঙ্গে যাই। হায় রে, তখন যদি যেতুম তা হলে আমায় এমন পীড়ন সইতে হতো না, তোমাদেরও এত জলতে হতো না।

তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবে, হ্যাঁ মা, তা কি হতে পারে কখনও? তুমি বিলাসিনী হতে পার—কিন্তু সতী তো তুমিও মা, অপর পুরুষের সঙ্গে মিশেছই কিন্তু কতটা তফাতে, তা আমি কি লক্ষ্য

করিনি? সন্তান মায়ের মূর্ত্তি বড় সহজে চিনতে পারে, মাকে সে বড় সহজে ধারণা করতে পারে। মায়ের এতটুকু ত্রুটি সে যেমন সইতে পারে; তেমনি মায়ের মহত্ত্বের তেজে তার বুকটা দশ হাত হয়ে ওঠে। আমার মা সতী, এ কথা আমি গর্ব্বভরে বলতে পারি, এ কথা মনে করতে আমার বুক কি আনন্দে ভরে ওঠে তা বলতে পারিনে।

মা আমার, তুমি যেমন আমাদের দেশীয় শাস্ত্র-পুরাণকে উড়িয়ে দিতে পার, সতীত্বকে তেমনি ভাবে উড়াতে পেরেছ কি? তুমিই কি মা এই দেশের সতী-সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার সঙ্গে নিজের তুলনা কর না, গর্ব্বভরে স্বামীর প্রেম বুকে নিয়ে অটুট দেহে হাজার পুরুষের মাঝখান দিয়ে চলে যাও না? তোমায় তখন রক্ষা করে কে, তোমার সতীত্ব নয় কি, তোমার অটুট স্বামীপ্রেম নয় কি? তবে মা, তোমার মেয়ে যে আমি—আমারও কি সে কর্ম্ম করতে নেই, সতীত্বের গর্ব্ব আমি করব না, তুমি আমায় আর একজনকে সমর্পণ করতে চাইলেই আমি তার হব? হ্যাঁ মা, তাই কি,—সতীর প্রেম কি বাজারের পণ্যদ্রব্য মাত্র?

মা, আমি তোমার আদেশ পালন করতে পারলুম না। আমার স্বামী এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে জন্মের মত চলে যাচ্ছি, আর ফিরে আসব না, আজ রাত্রের মধ্যে যদি তিনি না এসে পৌছাতেন, আমার প্রাণশূন্য দেহটাকে কাল সকালে তোমরা পেতে, আমি জীবন থাকতে অন্যের হতে পারব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। জানি তোমায় বড় কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু আমিও কি বড় কম কষ্ট পাচ্ছি মা? তুমি আমার ভবিষ্যৎ সুখ বর্ণনা করছো, ও তো সুখ নয় মা, ওই যে দুঃখ, তাই তোমার কথা শুনে আমার বুকে বড় আঘাত লাগে।

মনে করো মা আমার, তোমার মিনু মরে গেছে। অবাধ্য মেয়ে

তোমায় কেবল জ্বালিয়েই যাচ্ছি। তবু মা—মনে করো না এ আমি কষ্টকে বরণ করছি, এ আমার বড় সুখ। তোমার এ প্রাসাদে এমন সুখে বাস করার চেয়ে সেখানে—আমার স্বামীর পর্ণকুটীরে আমি সুখে থাকব। তোমার এখানে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে আমার সেখানকার সামান্য শাকান্নও ভাল।

বিদায় মা, তোমার পায়ের ধূলা মনে মনে মাথায় দিলুম। বাবাকে বলো আমার অপরাধ যেন মাপ করেন। আজ আমি তোমাদের মুখে যে কালি মাখিয়ে গোপনে গৃহ-ত্যাগ করছি,—মনে ভেব না মা, তাতে আমার কষ্ট হচ্ছে না ; তোমাদের সে মুখ মনে করে আমার প্রাণ শিউরে উঠছে, কিন্তু কি করব মা, আর যে উপায় নেই। দুটো পথ ছিল মুক্তি পাওয়ার, তোমরা আমায় মুক্তি দিলে না, তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই মুক্তিপথ খুঁজে নিতে হলো। মা আমার, বড় দাগা দিয়ে চললুম—আমায় তবু অভিশাপ দিয়ো না, আমায় আশীর্ব্বাদ কর—যত কষ্টই পাই সব যেন সয়ে যেতে পারি। এই আশীর্ব্বাদটুকু আমার এ পথে চলার সম্বল হবে মা আমার, আমার সকল দুঃখকে এর পরশ দিয়ে সুখ করে নিতে পারব, রাঙ্গ আমার সোনা হয়ে যাবে।

তোমার অভাগিনী মেয়ে

মিনু।

প্রভাত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল, হরেনবাবু তখন দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া শূন্য নয়নে কোন্ দিক পানে চাহিয়া আছেন।

পত্রখানা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রভাত উঠিতে যাইতেছিল, হরেন-

বাবুর বাহ্যজ্ঞান সেই সময় ফিরিয়া আসিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছো প্রভাত ?"

প্রভাত বলিল, "দিদিকে একবার দেখে আসি।"

মলিন হাসিয়া হরেনবাবু বলিলেন, "তাকে দেখতে গিয়ে কি হবে ? সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কেউ তাকে ডেকে দরজা খুলাতে পারবে না। উঃ, কি ভয়ানক কাজটাই ঘটে গেল! মিনুর মনে যে এইটা ছিল তাতো কোন দিনই ভাবিনি প্রভাত। সে যে নিতান্তই সরলা ছিল, একটা কথাও তার মুখ দিয়ে ফুটত না। সে বুঝেছিল তার এই কাজে সমাজে আমাদের মুখ দেখানো ভার হবে, তবুও—সব জেনে শুনেও সে এ কাজ করতে পারলে প্রভাত ?"

প্রভাত একটুখানি চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "কথাটা যদি তুললেনই, তবে আমিও আমার মতে যেটা ভালো বলে বুঝেছি, সে কথাটা বলি। সে আপনাদের দিকে চাইবে, আপনাদের মানসম্ভ্রম সমাজে অক্ষুণ্ণ থাকবে সেই রকম কাজ করবে, আপনারা তাই চান, তার কাছ হতে ঠিক তেমনিটিই আদায় করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তা হয়ে উঠল না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বোধ থাকে, আপনারা সেটা মানতে চাননি, তাই তাকে জোর করে চেপে ধরে তার কাছ হতে সুদে আসলে আপনাদের পাওনা আদায় করবার চেষ্টায় ছিলেন। সাপ গর্ত্তে যখন থাকে, তখন তার 'পর দিয়ে মাড়িয়ে লাথি মেরে গেলেও সে ফোঁস করে না, কারণ তার নিজের দেহে সে কখনও আঘাত বোধ করেনি। যে মুহূর্ত্তে গর্ত্তের মধ্যে তাকে খোঁচা মারা যায়, সে ফোঁস করে ফণা তুলে কামড়াতে আসে, ওইখানে ওইটুকুই তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। কত রকমেই না তাকে নির্য্যাতন করেছেন

ভাবুন দেখি, অপরাধ তার সে আপনাদের মেয়ে হয়ে এসে জন্মেছে, তাকে দিয়ে আপনারা এখন নিজেদের ঘোষণা করতে চান। দিদি তার মা হয়ে তার দিকে চোখ তুলে চায়নি, কেন না তার অপরাধ হিন্দুর ঘরে তার বিয়ে হয়েছে, খৃশ্চানকন্যা হলেও সে হিন্দুস্ত্রী, আর সেই হিন্দুমতে বিয়েটাই—সেই একটা রাতের প্রতিজ্ঞাই সে মনের মধ্যে অহরহঃ দোলা দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে, তাকে নিয়ত আবার জাগিয়েছে, না খেতে দিয়ে তাকে মেরে ফেলেনি। আমার তো কিছু জানতে বাকি নেই দাদা, সতীরাণী মা আমার কতদিন অনাহারে কাটিয়েছে, কত বিনিদ্র রাত তার চোখের'পর দিয়ে একটা মুহূর্ত্তকালস্থায়ী কালো পর্দ্দার মতই সরে গেছে, মার আমার চোখের জলে বালিস আর্দ্র হয়ে গেছে। এদেশের মেয়েরা যত উচ্চ শিক্ষাই পাক না কেন, বিদেশের মেয়েদের মত উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না, সেটা এদেশের জলবায়ুর গুণে। স্বামীভক্তি এ দেশের মেয়েদের মজ্জাগত জিনিস, তাই আমাদের মেয়েরা সতী নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই দেশের মেয়েরাই মরা স্বামীর চিতার পাশে হাসতে হাসতে শুয়েছে, অন্য দেশের মেয়েরা এমন অসাধারণ আত্মত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাতে পেরেছে কি? স্বামী মন্দ হোক, দুশ্চরিত্র হোক, মাতাল হোক, সেই স্বামীকে একমনে ভক্তি করে ভালবেসে আবার সৎ করতে পারে—এই দেশের মেয়ে, অন্য দেশের মেয়ে নয়। আপনি পাশ্চাত্য আলোকে অন্ধ হয়ে এই দেশের জলবাতাসে গড়ে ওঠা সতী মেয়েকে পাশ্চাত্য ভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, বিবাহিতা—যার স্বামী আছে, সেই মেয়েকে আবার অন্যের হাতে অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, একি ব্যভিচারিতা নয়? আপনি হয়তো জোর করে প্রমাণ করতে চান, সতীত্ব বলে কোন জিনিস নেই, আজকাল এই কথাটা অনেক শিক্ষিতের মুখেই শুনতে

পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও শিক্ষিতা নারীর মুখে শুনতে পেয়েছেন কি ? মিনুর হৃদয়ের সুপ্ত নারীশক্তি গর্জ্জে উঠেছিল, সে নারীত্বের অবমাননাকারী পিতামাতাকে ক্ষমা করতে পারেনি, পারবে না। সে গোপনে তার স্বামীর খোঁজ করে তাকে এনেছে, তার সঙ্গে চলে গেছে। এ কাজ সতীরই সম্ভব দাদা, আর সে সতী মেয়ে জন্মেছে এই ভারতের বুকে, এই জল-বাতাসের মধ্যে। ভুল বুঝবেন না দাদা, সে নিজেকে নিজে রক্ষা করেছে। হ্যাঁ, সমাজে আপনাদের অপদস্থ হতেই হবে, কেন না কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। সে কোনও গোলমাল করত না, আপনাদের মেয়ে হয়ে সে তেমনিই বাধ্য হয়ে থাকত, যদি না আপনারা তার নারীত্বকে লাঞ্ছিত করতে যেতেন। সে নীরবে ছিল, নীরবেই থাকত, আপনারাই তার নারীধর্ম্মে আঘাত করলেন, তার সুপ্ত শক্তি জেগে উঠল। অন্তরের নারী চেয়ে দেখলে, সে পিতামাতার কন্যা মাত্র কিন্তু অন্যের স্ত্রী। সে অন্যের পরিণীতা, তার স্বামী বর্ত্তমান থাকতেও পিতামাতা কেবলমাত্র সে যে তাঁদের মেয়ে এইটুকুর জোরে তাকে আবার অন্যের সঙ্গে পরিণীতা করতে চান। হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে মেয়েকে দান করা যায়, তার 'পরে আর কোনও স্বত্ব থাকে না। আমি বলি বড় সুন্দর এ নিয়ম, আপনি না মানতে চান আমি মানি। মেয়ে যে—সে বাপ মায়ের কথা শুনতে পারে—তা বলে স্ত্রী তো শুনবে না দাদা। যার অন্তরের স্ত্রী আর্ত্তনাদ করে উঠেছে, বড় ব্যথা পেয়েছে বলেই সে পালিয়েছে।"

হরেন বাবু মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন, আর একটা কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

প্রভাত বলিয়া চলিল, "আপনি হিন্দুর সন্তান, শিক্ষিত পুরুষ হলেও হিন্দুর শাস্ত্র জানেন না, হিন্দুর ঘরের আচার-ব্যবহারের পানে কখনও

দৃষ্টি করেন নি। চিরকাল বাইরে ছিলেন, এখনও বাইরে রয়েছেন, কিন্তু আমি বাইরের লোক হলেও এর ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, হিন্দুর আচার-ব্যবহার দেখছি, হিন্দুর শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হিন্দুর মেয়ের আচার ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করে দেখেছি। আমি একটী মেয়েকে চিনি, তাঁর চরিত্রে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম, তাঁকে মা বলে ডেকে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁরই মুখে শুনেছিলুম যখন তিনি পাঁচ বছরের মেয়ে মাত্র তখন তাঁর বিয়ে হয়, সাতবছর বয়সে তিনি বিধবা হন। এখন তাঁর বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ বছর হবে, তিনি সেই সাতবছর বয়স হতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আসছেন। একি বড় কম কথা দাদা, সাতবছরের মেয়ে বিধবা হয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আসছেন, বলুন দেখি কোন্ দেশের মেয়ে ত্যাগের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে? পাঁচ ছয় বছরের যে মেয়েটী স্বামীকে দেখেছিল তার মনে স্বামীর কথা এতটুকু জেগে নেই, তবু সে কল্পনায় স্বামীর মূর্ত্তি গড়িয়ে তার পূজা করে যাচ্ছে, আজীবন কাল করেও যাবে। সে মনে জানিয়ে রেখেছে সে দেবতার নামে উৎসর্গ করা ফুল, এ ফুলে আর পূজো হবে না, হতে পারে না। আপনার মেয়ে স্বামীর ছবি মনে জাগিয়ে রাখবে, এতে আর বিচিত্রতা কি আছে বলুন। যদি সে ছবি মনে না রাখতে পারত, যদি সে আবার বিয়ে করত, সত্যই আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ধিক্কার দিতুম, ঘৃণা করতুম, সত্যই আমি জানতুম আমাদের দেশ হতে সীতা সাবিত্রীর আদর্শ চলে গেছে, আমাদের এ দেশে বিদেশী হাওয়া বইছে, দেশ রসাতলে গেল বলে। আমি বিদেশে বিদেশীর মাঝে গিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা সগর্ব্বে বলেছি, তাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে ধিক্কার দিয়েছি, তখন আমার বুকটা গর্ব্বে ভরে উঠেছিল যে আমি

ভারতের একটী সতী মায়ের ছেলে, সতী বোনের ভাই, সতী ভাগ্নির মামা। আমরা অধঃপাতে গেছি দাদা, আমাদের মেয়েরা যায়নি। আমাদের অন্তঃপুর এখনও পবিত্র, আমাদের মেয়েরা প্রাণে প্রাণে সীতা-সাবিত্রীর শক্তি অনুভব করে। বুক তাদের স্বামীপ্রেমে পূর্ণ থাকবেই, আমরা যতই অধঃপাতে যাই না কেন—তাদের সেই অনাবিল সত্য স্বামী-প্রেম আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেই। ভুল বুঝবেন না, দিদিকেও ভুল বুঝতে দেবেন না, সরলভাবে সত্য বিশ্বাস করুন।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেনবাবু বলিলেন, "তোমার দিদিকে কি বলব ?"

প্রভাত বলিল, "সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না দাদা, আমি তাকে সব বুঝিয়ে দেব। তবে উপস্থিত এই কলঙ্কটা চাপা যাতে পড়ে, তার চেষ্টা আপনাকে করতে হবে। এ খবরটা এখনই চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আজকের দিনটা আপনাদের সইতেই হবে। আমি এখনি শশাঙ্কের কাছে যাচ্ছি আমার বন্ধু সে, তার হাতে ধরে আমি সব কথা বলব, তাকে বুঝানোও আমার কাজ। আপনি দিদিকে নিয়ে আজই সন্ধ্যের দিকে কোথাও চলে যান, কথাটা চাপা পড়ে গেলে আবার আসবেন।"

অত্যন্ত অসহায়ভাবে হরেনবাবু বলিলেন, "কোথায় যাব ?"

প্রভাত একটু ভাবিয়া বলিল, "কিছুদিন পশ্চিমের দিকে যান না হয়, পুরীতে তো আপনার বাড়ী আছে, সেখানে যান, মাস কত সেখানে থেকে আসুন, ততদিনে এখানে সব চাপা পড়ে যাবে। আমি তিনমাসের ছুটী নিয়ে এসেছি, এখানেই থাকব, আপনারা এই তিনমাসের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন, এর মধ্যে এখানকার সব গোল মিটে যাবে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেনবাবু উঠিয়া পড়িলেন। সেই দিনই তিনি কল্যাণীকে লইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত প্রভাত কলিকাতাতেই রহিয়া গেল।

২৭

সুদীর্ঘকাল পরে ভবানীপ্রসাদ একদিন কলিকাতার বক্ষে আবার পদার্পণ করিলেন।

স্বপন বহুকাল পরে তাঁহার দর্শন পাইল, অভিমানে দুঃখে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে নীরবে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

উপস্থিত সকলের সহিত কথা কহিয়া পরিতুষ্ট করিয়া ভবানীপ্রসাদ স্বপনের দিকে ফিরিলেন। এই সুদীর্ঘ পাঁচবৎসরে স্বপনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটুও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পাঁচ বৎসর আগে স্বপন তাঁহাকে যেমনটী দেখিয়াছিল আজও ঠিক তেমনিটি রহিয়াছেন।

"কি মা, তুমি আমার 'পরে রাগ করেছ তাই কথা বললে না, নীরবে পায়ের ধূলো নিয়ে একটী পাশে সরে দাঁড়ালে? তোমার সঙ্গে কথা বলতে এতক্ষণ পারিনি, আর সকলের সঙ্গে কথা বলেছি, কেন না তাদের সঙ্গে আমার বেশীক্ষণের সম্পর্ক নয়, তোমার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক শুধু সেই জন্যে। তোমায় আমি শেষের জন্যে রেখেছি মা, তুমি তৃপ্তিরূপা তাই তুমি শেষের বস্তু। এদিকে এসো, আমার কাছে বসো।"

স্বপন তাঁহার পায়ের কাছে মাটীতেই বসিয়া পড়িল, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "পায়ের কাছে মাটীতে বসলে যে মা, এই চেয়ার খানা টেনে নিয়ে আমার সামনে বসো।"

স্বপন সেখানেই ভাল হইয়া বসিয়া বলিল, "এই বেশ বসেছি জ্যেঠা-মশাই, আপনার পায়ের কাছেই আমার স্থান সে কথা আজ ভুলে যাচ্ছেন কেন ?"

তাহার মাথায় হাতখানা রাখিয়া স্নেহপূর্ণ শান্তস্বরে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ মা, অনেক দৃঢ়শক্তিসম্পন্ন পুরুষও এ রকম জায়গায় আত্মহারা হয়ে পড়ে। তুমি আত্মহারা হয়েও যেমনভাবে আপনাকে আবার সামলে নিতে পেরেছ, আর দাঁড়াতে পেরেছ, তারা তা পারে না। এ ঠিক আমার ছাত্রীর—আমার প্রিয়-শিষ্যার উপযুক্ত কাজ হয়েছে, তুমি সংসারে যথার্থ ই জয়ী হতে পেরেছ। আশীর্ব্বাদ করছি মা, সংসারের উপরেই যেন তোমার আসন থাকে, নেমে যেন এ পাঁকের মধ্যে না পড়, সংসার যেন কোনদিক হতে তোমায় জড়িয়ে না ধরতে পারে। আমি যখনই তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছি এই আশীর্ব্বাদই করেছি মা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, স্বপন সংসারে থেকেও যেন অনাসক্ত থাকে। কবি বলেছেন—

যত দিতে চাও কাজ দিয়ো—যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জাল-জঞ্জালগুলিতে—;
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র করে তোমারি চরণ-ধূলাতে,
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারজালে, তোমারে দিও না ভুলিতে।

সংসার-পথে চলতে গেলে মা—কবির এই উপদেশ-কথাটাই সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। সংসারে থেকেও মনকে অনাসক্ত নির্লিপ্ত করে রাখতে হবে, তবে সে সংসারকে যথার্থ চিনতে পেরেছে জানবে। তোমার ’পরে আমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকত, আমি ভগবানের কাছে তোমার জন্যে সর্ব্বদা প্রার্থনা করতুম ; ভগবান আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন, আমার আদর্শ ভেঙ্গে ধূলোর সাথে ধূলো হয়ে মিশিয়ে যায়নি—তা অটুটই রয়েছে।”

একটুখানি নীরব থাকিয়া স্তিমিত নেত্রে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যৎ দেখিয়া লইলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্যি কথা বলো মা, তোমার মনে কি কষ্ট হয়েছে ?”

স্বপন জিজ্ঞাসা করিল, “কিসের কষ্ট জ্যেঠা মশাই ?”

ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিলেন, “অতুল ঐশ্বর্য্য হারানোর ?”

স্বপন হাসিল। বলিল “একটুও না জ্যেঠা মশাই। সংসারে কারও কিছু থাকে না, অনিত্যকেই আমরা আপনার ভাবি। আমি আপনার উপদেশ হৃদয় দিয়ে পাঠ করেছি, বুঝেছি—‘একাকী এসেছি ভবে একা চলে যেতে হবে, সঙ্গে তো কেউ যাবে না।’ যখন জন্মেছি, তখন যেমন রিক্ত হস্তে নগ্ন গায়ে এসেছি, তেমনি রিক্ত হাতে নগ্ন গায়েই চলে যাব—পাপপুণ্যের খাতায় শুধু জমা খরচ লিখে রেখে। সামনে আমার বাপের উজ্জল দৃষ্টান্ত পেয়েছি জ্যেঠা মশাই, এত স্নেহের স্বপন তাঁর—যাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারতেন না ; যাওয়ার বেলায় তাকেও ফেলে রেখে অনায়াসে চলে গেলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের কিছু সঙ্গে গেল না জ্যেঠামশাই, পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত নয়। সংসারের জিনিষ সব সংসারেই পড়ে রইল, বাবা আমার যেমন রিক্ত হাতে এসে-

ছিলেন তেমনি রিক্ত হাতে চলে গেলেন। আমি কিসের জন্যে শোক করব, কিসের জন্যে দুঃখ করব জ্যেঠা মশাই? যে কয়টা দিন সংসারে থাকব, কোনক্রমে খাওয়া পরাটা জুটে গেলেই ফুরিয়ে গেল জ্যেঠামশাই, রাখার জন্যে—সঞ্চয় করবার জন্যে আমি কিছুই চাইনে, কোনদিন চাইবও না।”

ভবানীপ্রসাদ গম্ভীর মুখে বলিলেন, “তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলুম মা। সংসার ত্যাগ করলেই যে জ্ঞানী হওয়া যায় তা নয়, এই সংসারে থেকেই মানুষ অসীম জ্ঞানলাভ করতে পারে, সংসারকে চিনতে পারে। বড় বিপদের সময় তুমি আমায় চেয়েছিলে কিন্তু পাওনি, সেই জন্যেই আমার ’পরে তুমি অভিমান করেছ, রাগ করেছ! পাগলী মা আমার, সে সময় যদি আমি এসে দাঁড়াতুম, তুমি আমার ’পরে তোমার ভার শুদ্ধ অর্পণ করতে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি তোমার হতো না, এমনভাবে সংসারকে জানবার সুযোগও তুমি লাভ করতে পারতে না। মা আমার, ভগবানের আদেশ-বাণী আমার বুকে বেজে উঠেছিল, আমি তাই তোমায় ছেড়ে দিয়েছিলুম, সংসারের অনিত্যতা তাই তুমি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছ, সংসারের অধিবাসী যারা তাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে তাদের চিনেছ। বলবে এমন ভাবে আঘাত দিয়ে চিনাবার দরকার কি ছিল, ওইটুকুই আসল কথা মা। জ্ঞান-লব্ধ শিক্ষা এক, আর পুস্তকের শিক্ষা এক, দুটোর সঙ্গে বাহিক সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য অনেকখানি। বেদনার মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা লাভ করা যায় সে শিক্ষা চিরস্থায়ী, নড়তে চড়তে বুকের মাঝে সে কথা জেগে ওঠে, মৌখিক শিক্ষা মানুষ দুদিন বাদে ভুলে যেতেও পারে। আমার মনে বড় ক্ষোভ জাগত, যখন আমি শুনতে পেতুম মেয়েরা উঁচুদিকে

উঠতে পারে না, উঠিয়ে দিলেও গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়, এই কষ্টলব্ধ উত্থান-পতনের ফলে তারা মনুষ্যত্বের বাইরে চলে যায়, তারা নির্জ্জীব হয়ে পড়ে, তাদের কাছে আর কিছুই আশা করা যায় না। আমি শুনেছিলুম এই দেশেরই লোকের মুখে, মেয়েরা শিক্ষিতা হলে ভ্রষ্টাচারিণী হয়, সতীত্ব নামে কোনও পদার্থ তাদের থাকে না, সব রকমেই তারা ব্যভিচারিণী হয়ে ওঠে। বড় ব্যথা পেলুম মা, আমার বুক যেন ভেঙ্গে গেল। মনে ভাবলুম যাঁরা কেবল মা—তাঁদের প্রতি সন্তানের একি কটূক্তি, একি দৃষ্টিপাত! মাথার 'পরে দৃষ্টি পড়ল, দেখলুম শক্তিকে—সে মুখে মৃদু হাসি, চোখে আগুন ছুটছে। এই মায়ের শক্তিই তো সকল নারীর মধ্যে রয়েছে, নারী যে মা—সে আর কিছু নয়। অতীতের পানে ফিরে চাইতে দেখতে পেলুম, এই দেশের মেয়েরাই শিক্ষিতা হয়েছে, শিক্ষার আলোকে তাদের অন্তর বাহির দীপ্ত, শিক্ষিতা জ্ঞানবতী মায়ের শিক্ষিত জ্ঞানবান পুত্রই হয়েছে, তাই একদিন এদেশ জ্ঞানে শিল্পে বলে সাহসে এত উন্নত ছিল। নারীকে অশিক্ষিতা করে ফেলে রাখার ফলে দেশের ছেলে অশিক্ষিত, আলো তারা পায়নি, অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তারা সাহসহীন বলহীন, কেন না মায়ের কাছ হতে তারা সাহস পায়নি, শক্তি পায়নি। তারা সামনে কিছু আশ্চর্য্য জিনিস দেখে ভয় পেয়ে ছুটে মায়ের আঁচলের তলায় লুকিয়েছে, দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করে দেখেনি—তাতে ভয় করবার মত কিছু পদার্থ আছে কিনা। মা নারী, শুধু নারী নয়, শুধু মা বলে ডাকলেই যে তার নারী-জীবনের সার্থকতা লাভ হবে এমন কথা নেই, তাকে যোগ্যা মা হতে হবে যে। নারী জগতের কল্যাণময়ী, তার শিক্ষা তার অন্তরকে আলোকময় করবে, সে আলো বাইরে ছড়িয়ে যাবে, অন্ধকারকে উজ্জল করে তুলবে। মা আমার,

অতীতের পানে চেয়ে আর বর্ত্তমানকে নিয়ে তোমায় শিক্ষা দিয়েছি, প্রাচ্য প্রতীচ্যে মিল করিয়ে দিয়েছি, অতীত এসে ভবিষ্যতের হাত ধরেছে, আবাহন বিসর্জ্জনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মেয়েরা যে লেখাপড়া শিখলেই ভ্রষ্টাচারিণী হবে এ বিশ্বাস দেশের লোকের মন হতে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, তাই আজ মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে দেশের বুকে সাড়া জেগেছে। মেয়েরা একদিন যখন শিক্ষা পেত, আজ কেন পাবে না এ কথা অনেকেই মেনে নিচ্ছেন।”

ডাক্তার গুপ্ত বলিলেন, “আধুনিক শিক্ষায় অবনতি ঘটে একথা হিন্দুসমাজের অনেকেই আজও বলছেন।”

একটু হাসিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “প্রাচ্যের সঙ্গে মিল না রেখে দিলে অবনতি যে ঘটবে একথা আমিও স্বীকার করে যাচ্ছি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, সেখানকার নর নারী সমান অধিকার পেয়েছে, কেউ কাউকে পেছনে ফেলে যেতে পারছে না। কিন্তু এ শিক্ষা, এ উন্নতি একটী বস্তুর অভাবে যে ব্যর্থ হয়ে গেছে—সে জিনিসটী সংযম। শুধু পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা দিলে এ দেশবাসীও সংযম হারাবে, এ দেশের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। গোড়ায় সংযমকে ঠিক করে বেঁধে রাখতে হবে, এ সংযমশীলতার অভাবে ভগবানের অব্যর্থ অভিশাপ—ধ্বংস নেমে আসে। স্বপনকে যে শিক্ষা দিয়েছি, তার গোড়ায় ছিল সংযম, ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্য-শীলতা, তাই তার শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়নি, তার শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

ডাক্তার গুপ্ত বলিতে গেলেন, “আমাদের দেশের ছেলেদের—”

বাধা দিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “হ্যাঁ, ছেলেদের সম্বন্ধেও অনেক কথা বলবার মত আছে। আমাদের দেশের অভিভাবকেরা অন্যের দেখাদেখি পুঁথিগত শিক্ষাই দেখে যায়, মনটাকে দেহটাকে যে আগে

গড়ে নিতে হয়, তা এরা জানে না, তাই ছেলেদের এরকম স্বাস্থ্যহীন স্বেচ্ছাচারী অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। দোষ এরকম স্থলে কাদের বল দেখি ? আমি বলি ছেলের বাপমায়ের, কেন না তাঁদের কাছ হতেই সন্তান প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। বাল্যে মানুষের মন থাকে উর্ব্বর মাটীর মত, সেখানে যে বীজ ফেলা যাবে কালে তাই বড় গাছে পরিণত হবে। ছোট বেলায় যাদের হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজ বপন হয়নি, তুমি কি আশা কর বড় হয়ে তারা যথার্থ সুশিক্ষিত—যথার্থ মানুষ হতে পারবে ? এ দেশের ছেলেরা নজর রেখেছে শুধু পড়ার দিকে, কেননা তাদের অভিভাবকরা তাই চান, তাদের মানসিক গতির দিকে—তাদের স্বাস্থ্যের দিকে কয়টী অভিভাবকের দৃষ্টি আছে বল দেখি ? যথার্থ শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, এরা তার এতটুকু পাচ্ছে কি ? সেকালের প্রচলিত শিক্ষাকে এই সব পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ছেলেরা পরিহাস করে, কিন্তু সে শিক্ষায় মানুষ নিৰ্জ্জীব জড়প্রকৃতি হত না, যথার্থ মানুষই হতো, সে শিক্ষায় দেশকে উন্নতই করেছিল, অবনত করেনি। সেকালের লোকের শিক্ষার মূলে ছিল ধৰ্ম্মপরায়ণতা, সংযমশীলতা, তারা একালের ছেলেদের মত উচ্ছৃঙ্খল ধৰ্ম্মজ্ঞানশূন্য বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ছিল না। তাদের যা ছিল তা অকপট সত্য, এখনকার মত ছলনাপূর্ণ মিথ্যা নয়। আগেকার কালে ছেলেরা গুরুগৃহে শিক্ষার জন্যে যেত, ব্রহ্মচর্য্য তাদের পালন করতেই হতো, এই সংযমশীলতা শিক্ষার ফলে তাদের সাংসারিক জীবন অশেষ দুঃখের হেতু না হয়ে সুখের আকর হতো। এখন অনেক ছেলে পাঠ সাঙ্গ না হতেই বিয়ে করে, তাদের পড়া—তাদের জ্ঞান একটা বাহ্যিক আবরণ হয়ে পড়ে, অন্তরে তাদের জ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না। সে সংযমশীলতা এদের মধ্যে নেই, তাই অকাল বার্দ্ধক্য এসে এদের ধরে,

অনেক গুলি ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে তাদের কি খাওয়াবে কি পরাবে এই ভাবনাতে দিন কাটাতে আরম্ভ করে। এই সব ছেলের দেহের দিকে একবার চাও,—শীর্ণ মলিন, যেন বাতাসের আঘাত লাগলে পড়ে যাবে, চোখে মনুষ্যত্বের দীপ্তি নেই, কোন রকমে পাশটা করতে পারলেই এদের জীবনলাভের উদ্দেশ্যটা যেন সফল হয়ে যাবে! ছেলেদের ধর্ম্মময় জীবন গড়ে তুলতে ধার্ম্মিকা মা চাই, সংযম শিক্ষা দিতে সংযমী মা চাই। সেই রকম সুশিক্ষিতা স্ত্রীর দরকার যে স্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে আগে চাইবে, স্বামীকে উঁচু করে তুলবারই চেষ্টা করবে। এ দেশের বুকে পুরাকালের সেই যুগ ফিরিয়ে আনতে চাই ছেলেমেয়ের একনিষ্ঠ সাধনা, চাই শিক্ষা, চাই সংযমশীলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ। ভোগের মধ্যে দিয়ে চলে কিছু লাভ হবে না, ভোগে আসক্তিই বাড়ে মাত্র, তাই চাই ত্যাগ। সে দিন ফিরিয়ে আনতে মানুষকে নিবৃত্তির পথে চলতে হবে, আসক্তিপূর্ণ ভোগের পথে কিছু হবে না।”

জ্যোৎস্না মাঝামাঝি সময় আসিয়া পড়িয়া গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল, অগত্যা প্রসঙ্গটা সেখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি চাই দিদি?”

জ্যোৎস্না বলিল, “আপনার কিছু খেতে হবে না দাদু? রান্না সব হয়ে গেছে, মা আপনাকে আর পাঁচমিনিট দেরী করতে দেবেন না, এখনি গিয়ে খেতে হবে বললেন।”

ভবানীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, “এত তাড়াতাড়ি?”

জ্যোৎস্না বলিল,“তাড়াতাড়ি কোথায়? স্বপন নিজের হাতে আপনাকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে। সে সব তরকারী রেঁধে রেখে এসেছে, মা শুধু—”

স্বপন বলিয়া উঠিল, “আঃ, কি করিস্ জ্যোৎস্না?”

জ্যোৎস্না খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখচেন দাদু, রাঁধার নামে স্বপনদির লজ্জা দেখুন একবার, যেন কি ভীষণ একটা অপরাধ করে বসেছে এমনি ভাবটা।"

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "এতে লজ্জা কেন মা, এ তো অপরাধ নয়—এ যে পুরস্কার। তোমরা আমাদের জীবনদায়িনী, বড় ক্ষুধার সময় মুখে অন্ন তুলে দিয়ে তোমরাই আমাদের বাঁচাও। পুরাণে পড়েছ মা—শিব যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে সারা বিশ্ব চেয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখন কোথাও একটা অন্ন তাঁর অদৃষ্টে জুটল না। আত্মভোলা ঠাকুরটী তখন ঘরের পানে ফিরে দেখতে পেলেন—সামনে অন্নপূর্ণা মুর্ত্তি। ভগবতী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে অন্নদান করে শিবের ক্ষুধানাশ করলেন। একি লজ্জার কথা মা—তোমরা মা হয়ে ঘরে বই পড়বে, সেলাই করবে, পিয়ানো বাজাবে, বাইরে হাওয়া খেতে যাবে, আর বামনঠাকুর এসে আমাদের রান্নাঘরে রাঁধবে? তার কি ব্যারাম আছে তা জানিনে, সে হিন্দু কি মুসলমান তা জানিনে, সে কি রকমভাবে রাঁধে তা আমরা দেখিনে, তার হাতের তৈরি খাবার আমরা বিনা দ্বিধায় খাব, আর এই আহার্য্যের 'পরে আমাদের স্বাস্থ্য—আমাদের জীবন নির্ভর করছে? তোমরা যে মা গৃহের লক্ষ্মী, বিলাস-পুতলী তো নও। তোমরা আমাদের খাওয়ার ভার নিজেদের হাতে নেবে, আমাদের স্বাস্থ্যের 'পরে নজর রাখবে, তোমরা তো সাজানো আসবাবের মত সযত্নে নিজেদের রান্নাঘরের ধোঁয়া কালীর কাছ হতে তফাতে থাকলে চলবে না। রান্না করা এমন কিছু গুরুতর কাজ নয়, এমন কিছু লজ্জার কাজ নয়—এ যে মেয়েদের গর্ব্বের জিনিস, তাদের হাতের কাজ। আমরা যে সেকালের নিন্দা করি, অবশ্য এ স্বীকার করে নিতেই হবে সেকালের লোকেদের স্বাস্থ্য

ভাল ছিল, এমন করে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় সকলেই ভুগত না, এমন চেহারাও তাদের ছিল না, তার একটা কারণ এই—ঘরের রান্না নয় কি ? তখনকার দিনে ঘরে ঘরে বামুনঠাকুর ছিল না, মেয়েরা নিজেদের হাতে রাঁধতেন—দশজনকে পরিবেষন করে খাওয়াতেন—বল দেখি কতদূর তৃপ্তিকর ছিল এ ? উপকরণ যত সামান্যই হোক না, তবু সে কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনই তৃপ্তিকর, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী ? তাদের দেহের পানে চাইলে, পরণের কাপড় বা গামছার পানে চাইলে আর জ্ঞান থাকে না ; সর্ব্বোপরি তারা যে সব কুৎসিত ব্যারামে—”

স্বপন বলিয়া উঠিল, “হয়েছে জ্যেঠামশাই, আর বলবেন না। ডাক্তার কাকা সে দিন এই ধরণের একটা প্রবন্ধ লিখেছেন তা পড়ে বুঝেছি, ওদের মত জঘন্য জীবের হাতে খাওয়ার চেয়ে শুকিয়ে মরা ভাল। আপনি এখন উঠুন, স্নান করে এসে খাবেন চলুন। আপনি না খেলে আমাদেরও খাওয়া হবে না তা তো জানেন।”

ভবানীপ্রসাদ হাসিমুখে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, “পাগলীদের জ্বালায় একটু বসে কথা বলবার সময় নেই। এমন উপবাস কত গেছে তা তো জান না মা! হয় তো পাঁচ সাত দিন—”

জ্যোৎস্না বলিয়া উঠিল, “আবার তাই করবেন দাদু, আমাদের কাছে যে দুটো দিন থাকবেন, নিয়মমত খাইয়ে শুইয়ে তবে ছাড়ব, কি বল স্বপন ?”

স্বপন নিঃশব্দে শুধু হাসিতে লাগিল।

২৮

জ্যোৎস্নাধৌত সুন্দর যামিনী, বৈশাখের আকাশ শান্ত সুনির্ম্মল, ঝর ঝর করিয়া শান্ত স্নিগ্ধ নৈশ বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। নীচে বাগানে হাসনুহেনা গাছটায় ফুল ফুটিয়াছিল, তাহার মিষ্ট গন্ধ চাঁদের আলোয় সিক্ত হইয়া বাতাসে ভর করিয়া দ্বিতলে মুক্ত ছাদে আসিয়া পৌঁছাইতেছিল।

স্বপন চুপ করিয়া একা ছাদে বসিয়াছিল। রাত্রি তখন অনেক, বাড়ীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে। নীচে পথে এখনও দুই একখানা মোটর, দুই একখানা ঘোড়ার গাড়ী মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করিতেছিল। দিনের কলিকাতা মধ্যরাত্রিতে নীরব হইয়া আসিয়াছে।

মাথার উপর হাসিতেছে চাঁদ, জ্যোৎস্নাধারায় ছাদখানি ভাসিয়া গিয়াছে সম্মুখের গৃহে ভবানীপ্রসাদ ধ্যানে বসিয়াছেন, দরজা ভিতর হইতে রুদ্ধ, স্বপন তাঁহারই প্রতীক্ষায় ছাদে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সমস্ত দিন তাঁহার সহিত নির্জ্জনে দেখা করার অবকাশ স্বপনের মিলে নাই, জ্যোৎস্না সমস্ত দিনই তাহার কাছে থাকে, ভবানীপ্রসাদও সমস্ত দিন বাহিরের লোকে বেষ্টিত হইয়াছিলেন। এখন ভবানীপ্রসাদের দীর্ঘ অবসর, জ্যোৎস্নাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সকল দিন রাত্রে তাহার ঘুম হইত না, হয়তো সমস্ত রাত্রিই সে ছাদে পাদচারণা করিত। ডাক্তার গুপ্ত নিজে তাহাকে কোন দিনই কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করেন নাই, স্ত্রী-কন্যাকেও নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গৃহমধ্যস্থ ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে

ভবানীপ্রসাদের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"নারায়ণ।" স্বপন বুঝিল তিনি সমাধি হইতে জাগিয়াছেন, এখনি বাহিরে আসিবেন।

দরজা খুলিতেই গৃহের বৈদ্যুতিক আলো এক ঝলক বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোর সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।

বাহিরে আসিতেই ভবানীপ্রসাদের দৃষ্টি পড়িল স্বপনের উপর, তাঁহার বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, "কে ওখানে ?"

"আমি স্বপন, জ্যেঠামশাই।"

সে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

ভবানীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখনও ঘুমাও নি মা, এত রাত পর্য্যন্ত জেগে রয়েছ ?"

স্বপন বলিল, "শুয়েছিলুম জ্যেঠামশাই, ঘুম হল না। অনেক রাত এমনি ভাবে আমার বিনিদ্রভাবে কেটে যায়, অনেক রাত আমি এই ছাদের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াই।"

"বসো মা, এইখানে আমার পাশে বসো।"

ভবানীপ্রসাদ আলিসার উপর বসিয়া পড়িলেন, স্বপন তাঁহার পায়ের কাছে নীচে বসিল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "কেন মা, সারারাত তুমি ঘুমাতে পার না ? তখন তোমায় জিজ্ঞাসা করলুম, বিষয়সম্পত্তি যাওয়ায় তোমার কষ্ট হয়েছে কি ?—তুমি উত্তর করলে, কষ্ট হয়নি, তবে মা—"

স্বপন হাসিল, "জ্যেঠামশাই, যা সত্য নয় তা যাওয়ার জন্যে স্বপন একতিলও কাতর নয়। আমার যে কি দুর্ভাবনা তা তো আপনি জানেন, আপনার কাছে তো সে কথা চাপা নেই। যখন সব কথা আমার মনে হয় তখন আমার জ্ঞান থাকে না, আমি যেন পাগল হয়ে

যাই। আজ অনেক কথা আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করতে আছে জ্যেঠামশাই। আমার বুকে যে কি আগুন দিন রাত জ্বলছে তা কেউ জানে না, কাউকে জানাতেও পারিনি। আপনি বাবার গুরু, বাবাকে বড় বিপদ হতে মুক্ত করেছেন, আপনাকেই সব কথা জানাব।"

সে উদাসনেত্রে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে চোখ দুটি ফিরাইয়া আনিয়া ভবানীপ্রসাদের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বেদনাভরা সুরে বলিল, "জ্যেঠামশাই, পরিচ্ছন্নতার মধ্যে তৈরি হতো। এখনকার এই সভ্যতার যুগে উড়িষ্যাবাসী কি বিহারবাসী বামনঠাকুরের রান্না কি তেমনই পরিষ্কার আমাদের কোন কথা তো আপনার কাছে গোপন নেই, সবই তো জানেন। আমার বাপের কথা, মায়ের কথা—"

তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল, অনেক কষ্টে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, "নিজের পরিচয় দেবার মত মুখ আমার আর নেই জ্যেঠামশাই, আমি আগে যদি জানতে পারতুম—"

ভবানীপ্রসাদ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "জানতে পারলেই বা কি করতে পারতে মা? এর প্রতিবিধানের আর কোন উপায়ই নেই, এ যে অতীতের কোলে ঢলে পড়েছে। তুমি সব জানতে পেরেছ; এই রকম ভাবে জানাবার কথা আমিই তোমার বাবাকে বলেছিলুম, কেন না কারও এমন সাহস নেই যে সন্তানের সামনে মায়ের কলঙ্ককাহিনী বিবৃত করতে পারে। সন্তানের চোখে মা যে কি জিনিস তা কে না জানে মা? তোমার মা যে পাপ কাজ করেছে, তবুও মা—তবুও আমি বলছি সে যথার্থ দয়ার পাত্রী। মানুষে সকলেই কিছু সোজা সরল পথে চলতে পারে না, কোন না কোন সময় হয় তো তার ভুল হয়ে যায়, তার

পা ফস্‌কে যায় ; সেই দোষটুক ধরে রেখে তার অন্য গুণগুলি চেপে রেখে দেওয়া ভারি অন্যায়। তোমার মা এ দেশের মেয়ে—এ দেশের জল বাতাসে বর্দ্ধিত হয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েছিল, আদর্শ হারিয়ে ফেলেছিল, সংযম ধর্ম্ম সব বিসর্জ্জন দিয়েছিল, তাই তার এই নিদারুণ অধঃপতন হয়েছিল। এ দোষ তার সম্পূর্ণ নয়,—শিক্ষাদাতার, তাকে সম্পূর্ণভাবে এ পতনের জন্যে অপরাধিনী করো না মা। সে এখন নেই, আমি খবর পেয়েছি অনুতাপে জর্জ্জর হয়ে—যে দিন তোমার বাপ তাকে চলে যেতে বলেন সেই রাত্রেই সে আত্মহত্যা করেছিল, তোমার বাপ সে কথা জানতেন, কিন্তু দারুণ ঘৃণায় আর সে কথা লিখে যাননি। তার কৃতপাপের জন্যে সে নরকে গেছে, স্বর্গে কখনই যেতে পারে নি এ কথা আমি বলতে পারব না, তার পাপটুকু কেটে গেলেই সে স্বর্গ পাবে, শান্তি পাবে। ভিত্তি দৃঢ় না হলে এমনিই হয়ে থাকে মা ! তোমার ভিত্তি যদি দৃঢ় না হতো, পাশ্চাত্য স্রোতে তুমিও ভেসে যেতে। প্রথমেই তাই তোমার চোখের সামনে সতী-সাবিত্রীর আদর্শ ধরা হয়েছিল, তোমার পথ আগেই নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। আসল কথাই ওই মা—সংযমহীনতা হলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। নিজেকে সংযত রেখে সে পথে যাও না কেন, জয়ী হবেই।”

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, “জানি মা, যে মা বলে ডাকতে সন্তানের বুক পূর্ণ হয়ে যায়, সে মায়ের দোষ সে সইতে পারে না। মা আরাধ্যা দেবী, মায়ের আশীর্ব্বাদ সন্তানের অভেদ্য বর্ম্ম। সেই যে মা—তার এই পতনে সন্তান কতদূর ক্ষুব্ধ—কতদূর সন্তপ্ত হয়ে ওঠে তা কি বলতে পারি মা ? তোমার মনে যে কতটা আঘাত লেগেছে তা আমি জানছি, কিন্তু তবুও বলছি মা, সে ক্ষমার পাত্রী। মা বলে তাকে

দয়া না করতে পার, পতিতা নারী বলে দয়া করতেই হবে। মনে করো, নারী শিক্ষার দোষে পথ হারিয়ে ফেলেছে, পরের চোখে চোখ দিয়ে জগৎ দেখেছে, পরের 'পরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছে, তাই তার পতন হয়েছে। যদি সে অতটা নিজেকে হালকা না করে দিত, স্বামীর 'পরে অতটা ভর না দিত—দেখতে, কখনই তার পতন হতো না, সেও উন্নত হতে পারত, আদর্শ মা হতে পারত। মা, মা নাম উচ্চারণ করতে তোমার স্বর বন্ধ হয়ে যায়, মনে কর তোমার মা জগতের কোন নারী নয়, তুমি জগৎমায়ের সন্তান। পাপিনী নারী বলে সে অভাগিনীকে ক্ষমা করতে পারবে না কি, দয়া করতে পারবে না?"

স্বপন মুখ তুলিল, তাহার বড় বড় দুইটী চোখে জল টলটল করিতেছিল; ধীর কণ্ঠে সে বলিল, "তাই জ্যেঠামশাই, মা বলে নয়—পাপিনী নারী বলে তার জন্যে ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করব যেন তার আত্মা শান্তিলাভ করে। তারপর জ্যেঠামশাই, তার কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আমার দেবচরিত্র বাবা—তিনি—"

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "তিনি নারী-শোণিতে নিজের হাত রঞ্জিত করেছিলেন—কেমন, এই কথাই তো বলতে চাও মা? অপরিণামদর্শী যুবকের যা পরিণাম তা তোমার বাপের চরিত্রেই দেখতে পেয়েছ। পাশ্চাত্যমোহে অন্ধ হয়ে সে নিজের স্ত্রীকে লক্ষ্মীর পবিত্র আসনচ্যুত করেছিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে সেখানে গিয়েছিল, অবাধে তাকে যার তার সঙ্গে মিশবার অনুমতি দিয়েছিল, তাকে নীতি-সংযম শিক্ষা দেয়নি, কেন না শেষফল সে ভাবেনি। পরে যখন সে তার কাজের ফল দেখতে পেলে তখন তার জ্ঞান হল, কিন্তু তখন সে যে সবই হারিয়ে বসেছে। হতাশায় উন্মত্ত সে—সমগ্র নারীজাতির 'পরেই তার নিদারুণ

ঘৃণা জেগে উঠেছিল, তাতে এতটুকু ইন্ধন জুটতেই সে আর ইতস্ততঃ করেনি, নারীহত্যা করতে পেছিয়ে যায়নি। আহা, বড় কষ্ট সারাটা জীবন ধরে ভোগ করেছে সে, তার সারাজীবনব্যাপী অনুতাপেও কি সে পাপের কালি ধুয়ে যায়নি স্বপন ?"

আর্ত্তকণ্ঠে স্বপন বলিয়া উঠিল, "নিজের জন্যে কোনদিন প্রার্থনা করিনি জ্যেঠামশাই! বাবার জন্যে আমি সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করি। আমার বাবার যেটুকু পাপ ছিল জ্যেঠামশাই, সব কেটে গেছে, আমার বাবা মুক্তি পেয়েছেন।"

আবেগে তাহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ। ভবানীপ্রসাদ অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন। নীলাকাশের গায়ে দোলা খাইতে খাইতে চাঁদ-খানা তখন অনেকদূর উপরে উঠিয়াছে, তাহার আলো তখন আরও শুভ্র—আরও উজ্জ্বল। একদল নিশাচর পাখী সোঁ সোঁ করিয়া চাঁদের তল দিয়া উড়িয়া গেল, তাহাদের ছায়া ত্বরিতে রেখার ন্যায় ধরাবক্ষে ভাসিয়া দূরে চলিয়া গেল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভবানীপ্রসাদ চোখ ফিরাইয়া স্বপনের উপর রাখিলেন, স্বপন বিভোরপ্রাণে আকাশের অনন্ত অসীম সৌন্দর্য্যের পানে চাহিয়া আছে, তাহার নিষ্পলক নয়নের প্রান্ত বহিয়া শুধু অশ্রুধারা বড় বড় ফোটার আকারে ঝরিয়া ঝরিয়া শুভ্র হাতখানার উপর পড়িতেছে।

ব্যথিতকণ্ঠে ভবানীপ্রসাদ ডকিলেন, "মা—"

স্বপন তাঁহার পানে চাহিল মাত্র।

"একি মা, কাঁদছ তুমি ?"

স্বপন চোখ মুছিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "না জ্যেঠামশাই।"

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আমার কাছে ও মিথ্যে কথাটা এমন করে অসঙ্কোচে বলে ফেললে মা ?"

স্বপন মুখ ফিরাইয়া লইল, ভাঙ্গাস্বরে বলিল, "সত্যি জ্যেঠামশাই, আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথাই বলেছি। আমি কি ভাবছিলুম তা জানেন জ্যেঠামশাই ? আমি ভাবছিলুম কিছুই না, সবই মায়ামাত্র, সবই স্বপ্ন, কিন্তু তবুও তো মনকে প্রবোধ দিতে পারিনি। মায়ের জন্যে নয়, যাঁর কথা মনে করতে পারিনে তার জন্যে বুকে ব্যথা বাজে না ; কিন্তু যাঁকে আমি দেখেছি, যাঁর দেবতার মত—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই নীরব হইয়া গেল, তখনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার বলিল, "যথার্থ জ্যেঠামশাই, বাবার জন্যে আমি কিছুতেই শান্তি পাইনে। যদি বাবার পাপ না কেটে থাকে হয় তো তিনি অনন্ত যন্ত্রণা—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কণ্ঠে চেষ্টা করিয়াও সে ভাষা ফুটাইতে সক্ষম হইল না।

ভবানীপ্রসাদ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "পাগলী মেয়ে, এই না একটু আগেই বললে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন, তবু আবার এই কথা ভাবছ ? আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি বলছি তিনি স্বর্গে গেছেন ; তাঁর আত্মা নীচে নেমে আসেনি, উর্দ্ধে গেছে।"

স্বপন ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় দিল—"সেই কথাই বলুন জ্যেঠামশাই, আমায় শান্তি দিন।"

কয়েক মূহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে এই সব কথার আলোচনা করব বলেই কলকাতায় এসেছি মা, নচেৎ আসার কোন দরকার ছিল না। আমি ভেবেছিলুম, বরাবর হিমালয়ের

দিকে চলে যাব, কিন্তু বরাবর যেতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমায় এখানে আসতে হল। আমার এখন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হয়েছে মা! যতদিন দেহে শক্তি ছিল, ভগবানের আদেশে সংসারক্ষেত্রে ঘুরে কাজ করেছি। ভগবানের আদেশ লাভ করেছি, এখন আমার বিশ্রামের সময় উপস্থিত। যাওয়ার আগে আমার যে কাজ বাকি আছে তা সেরে যাব ঠিক করেছি।"

বিষণ্ণমুখে স্বপন বলিল, "আপনি চিরকালের মতই চলে যাবেন জ্যেঠামশাই, আর আসবেন না ?"

ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "না মা, আর আসব না। শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্রামের দরকার। এতদিন নিজের মুক্তির মত কাজ কিছুই করিনি মা, পরের জন্যে জীবনপাত করে খেটে গেছি, শেষ সময়টা নিজের কাজ করি গিয়ে, আবার পারের কড়ি চাই তো ? কেবল বিলিয়েই যাচ্ছি, নিজের ঝোলার সম্বল একটা কানাকড়িও নেই। খেয়াঘাটের মাঝি সন্ধ্যার আঁধারে যখন নদী পার করতে চাইবে না, তখন তাকে দেব কি বল মা ?"

স্বপন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যে আপনাকে নিয়ত পেলুম না জ্যেঠামশাই, এ ক্ষোভটা যে আমার মনে জেগে রইল। একবার আপনাকে পেয়েছিলুম সে কয়টী দিনের জন্যে মাত্র, তারপর এই পাঁচটা বছর কোন্‌খান দিয়ে কেটে গেল। এতদিন বাদে আপনাকে পেলুম মাত্র কয়দিনের জন্যে। সংসারে এসে কারও সঙ্গে মিশতে পারলুম না, সংসারে বাস করেও সংসারছাড়া জীব আমি, এ রকম নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে কি করে বাস করব জ্যেঠামশাই ? ব্যথা পেলে কাউকে বলতে নেই, কাঁদলে কেউ জিজ্ঞাসা করতে নেই,—বিপদে পড়লে

কেউ একটা সৎপরামর্শ দিতে নেই, আমি কি করে থাকব জ্যেঠামশাই, কি করে বেঁচে থাকব ?"

ভবানীপ্রসাদ গম্ভীরমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

স্বপন ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না জ্যেঠামশাই, আপনার মত আমিও ভগবানকে ডাকবো, আমার সংসারে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না।"

ভবানীপ্রসাদ তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল বাঁধন কাট্‌তে পেরেছ কি মা? তুমি নিজেকে নিজে এখনও চিনতে পারনি মা, ভুলটা যে কোথায় থেকে গেছে সেটা ধরতে পারনি। মা, অভিজ্ঞতা যেটুকু লাভ করেছি তাতে খানিকটা বুঝতে পারি, বুঝেছি তুমি জোর করে মুখে বললেও বাঁধন তোমার কাটেনি। আসার পথে পেছনের দাগ মুছে আসতে পারনি মা, দাগ রেখে এসেছ। সন্ন্যাসগ্রহণের বাধা আছে মা, আসার পথে যদি কাউকে জড়িয়ে থাকো সেই বাঁধন তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করে ফেলবে।"

স্বপন বিস্মিত চোখ দুটি ভবানীপ্রসাদের মুখের উপর রাখিল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, "তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি মা, অদৃশ্য একটা শক্তি তোমার পিছন হতে নিয়ত তোমায় আকর্ষণ করছে, এই শক্তি তোমার সন্ন্যাসধর্ম্মকে নষ্ট করে ফেলবে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে চঞ্চল হলে তার মত মহাপাপ আর নেই, সেই জন্যে বলছি মা, তোমায় সংসারে থাকতে হবে। তোমার বহুজন্ম পূর্ব্ব হতে এই শক্তি তোমার অনুসরণ করে আস্‌ছে, কোন জন্মেই সে মিলনের সার্থকতা লাভ কর্‌তে পারেনি। বহুজন্ম হতে তুমি উঠবার চেষ্টাই করছ, তাকে ছাড়িয়ে একলা পথে চলবার

চেষ্টা করছ, কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারনি, তোমার যত্ন চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। হিন্দুধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ মানে, জন্ম জন্ম কেউ যদি কারও অনুসরণ করে, একটা জন্মে সে তার অভীপ্সিতকে পাবেই, হিন্দু-শাস্ত্রকার এ কথা বলে গেছেন। মানুষ মরে যায়, ভালবাসা মরে না, সেই ভালবাসাই অন্য রূপ ধরে বাঞ্ছিতকে পাওয়ার জন্যে ফেরে। আমি দেখছি, তোমায় তাকে বিয়ে করতে হবে, বিভিন্ন পথে চলতে গেলে তুমি কখনই উঠতে পারবে না, তোমায় তার আকর্ষণে নেমে আসতে হবেই। মা, তোমায় বিবাহ করতে হবে, হ্যাঁ, এ আমারই আদেশ বলে জানো। তুমি একটী শক্তিতে যা কর্‌তে পারছ না, আর একটী শক্তির সাহায্য পেলে তা অনায়াসে অল্পক্ষণে হয়ে যাবে। মা, ভগবানের একান্ত ইচ্ছা তাই তোমায় তিনি সংসারের মধ্যে আদর্শরূপে রাখতে চান, এই সংসারের মধ্যেই তোমায় কাজ করতে হবে, তোমার কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে তিনি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সংসারের মায়ায় জড়িয়ে পড়ো না, আসক্ত হয়ো না, সংসারের প্রতি যা তোমার কর্ত্তব্য তাই শুধু পালন করে যাও। আদর্শ কন্যা ছিলে, এবার আদর্শ স্ত্রী হও, তারপর আদর্শ মা হবে, কতগুলি ছেলে মেয়ের নৈতিক জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে, যা দেখে আর দশটী মা নিজেদের ছেলে মেয়েদের সেই রকম সুশিক্ষা দেবেন। এখন শুধু মনে রেখে দিয়ো তুমি স্ত্রী, স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তাঁর সুখদুঃখের সমানাংশভাগিনী। তোমার পুতুল পূজো শেষ হয়ে গেছে মা, ধাপে ধাপে অনেক দূর উঠেছ, সত্য-সুন্দর চিন্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎ এইবার পাবে, স্বামীর মধ্যে যে দেবতাকে সীতা সাবিত্রী বেহুলা দেখতে পেয়েছিলেন সেই দেবতাকে দেখতে পাবে। এবার জীবন্ত নারায়ণকে পাবে মা, তাঁর সেবা করো, মিথ্যে

পূজো ত্যাগ কর। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সুখী হবে, আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যে হবে না।"

বিবাহ কথাটা মনে হইতেই স্বপনের দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু না, এ সঙ্কোচ দূর করিতে হইবে, গুরুর আদেশ পালন করিতে হইবে।

"যাও মা, অনেক রাত হয়েছে, এবার শোও গিয়ে।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি শুতে যাবেন না জ্যেঠামশাই ?"

ভবানীপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাছে দিনরাত সবই সমান মা। যখন ক্লান্তি আসবে, শরীর ভেঙ্গে পড়বে, তখন বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়তে হবে বই কি। যাও মা, রাত শেষ হয়ে এল।"

স্বপন যখন শয়ন করিতে গেল, দেওয়ালের ঘড়িতে তখন চারটা বাজে।

২৯

বেহারা আসিয়া খানকত পত্র কল্যাণীর সম্মুখে টেবলে রাখিয়া গেল।

হরেনবাবু তখন বাড়ী ছিলেন না। আগামী কল্য তাঁহারা দীর্ঘ প্রবাসের পরে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতেই শেষের এই দিনগুলা জলের মত কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা বড় সুকঠিন।

কন্যার গৃহত্যাগের পরে এই সুদীর্ঘ কয়েকটা মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কল্যাণী একবারও কন্যার নাম মুখে আনেন নাই।

দিকে চলে যাব, কিন্তু বরাবর যেতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমায় এখানে আসতে হল। আমার এখন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হয়েছে মা! যতদিন দেহে শক্তি ছিল, ভগবানের আদেশে সংসারক্ষেত্রে ঘুরে কাজ করেছি। ভগবানের আদেশ লাভ করেছি, এখন আমার বিশ্রামের সময় উপস্থিত। যাওয়ার আগে আমার যে কাজ বাকি আছে তা সেরে যাব ঠিক করেছি।"

বিষণ্ণমুখে স্বপন বলিল, "আপনি চিরকালের মতই চলে যাবেন জ্যেঠামশাই, আর আসবেন না ?"

ভবানীপ্রসাদ উত্তর করিলেন, "না মা, আর আসব না। শ্রান্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্রামের দরকার। এতদিন নিজের মুক্তির মত কাজ কিছুই করিনি মা, পরের জন্যে জীবনপাত করে খেটে গেছি, শেষ সময়টা নিজের কাজ করি গিয়ে, আবার পারের কড়ি চাই তো ? কেবল বিলিয়েই যাচ্ছি, নিজের ঝোলার সম্বল একটা কানাকড়িও নেই। খেয়াঘাটের মাঝি সন্ধ্যার আঁধারে যখন নদী পার করতে চাইবে না, তখন তাকে দেব কি বল মা ?"

স্বপন একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যে আপনাকে নিয়ত পেলুম না জ্যেঠামশাই, এ ক্ষোভটা যে আমার মনে জেগে রইল। একবার আপনাকে পেয়েছিলুম সে কয়টী দিনের জন্যে মাত্র, তারপর এই পাঁচটা বছর কোন্খান দিয়ে কেটে গেল। এতদিন বাদে আপনাকে পেলুম মাত্র কয়দিনের জন্যে। সংসারে এসে কারও সঙ্গে মিশতে পারলুম না, সংসারে বাস করেও সংসারছাড়া জীব আমি, এ রকম নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে কি করে বাস করব জ্যেঠামশাই ? ব্যথা পেলে কাউকে বলতে নেই, কাঁদলে কেউ জিজ্ঞাসা করতে নেই,—বিপদে পড়লে

কেউ একটা সৎপরামর্শ দিতে নেই, আমি কি করে থাকব জ্যেঠামশাই, কি করে বেঁচে থাকব ?”

ভবানীপ্রসাদ গম্ভীরমুখে কি ভাবিতে লাগিলেন।

স্বপন ব্যগ্র হইয়া বলিল, “আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না জ্যেঠামশাই, আপনার মত আমিও ভগবানকে ডাকবো, আমার সংসারে থাকতে মোটেই ভাল লাগে না।”

ভবানীপ্রসাদ তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকল বাঁধন কাটতে পেরেছ কি মা ? তুমি নিজেকে নিজে এখনও চিনতে পারনি মা, ভুলটা যে কোথায় থেকে গেছে সেটা ধরতে পারনি। মা, অভিজ্ঞতা যেটুকু লাভ করেছি তাতে খানিকটা বুঝতে পারি, বুঝেছি তুমি জোর করে মুখে বললেও বাঁধন তোমার কাটেনি। আসার পথে পেছনের দাগ মুছে আসতে পারনি মা, দাগ রেখে এসেছ। সন্ন্যাসগ্রহণের বাধা আছে মা, আসার পথে যদি কাউকে জড়িয়ে থাকো সেই বাঁধন তোমার ধর্ম্ম নষ্ট করে ফেলবে।”

স্বপন বিস্মিত চোখ দুটি ভবানীপ্রসাদের মুখের উপর রাখিল।

ভবানীপ্রসাদ বলিলেন, “তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি মা, অদৃশ্য একটা শক্তি তোমার পিছন হতে নিয়ত তোমায় আকর্ষণ করছে, এই শক্তি তোমার সন্ন্যাসধর্ম্মকে নষ্ট করে ফেলবে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে চঞ্চল হলে তার মত মহাপাপ আর নেই, সেই জন্যে বলছি মা, তোমায় সংসারে থাকতে হবে। তোমার বহুজন্ম পূর্ব্ব হতে এই শক্তি তোমার অনুসরণ করে আস্‌ছে, কোন জন্মেই সে মিলনের সার্থকতা লাভ কর্‌তে পারেনি। বহুজন্ম হতে তুমি উঠবার চেষ্টাই করছ, তাকে ছাড়িয়ে একলা পথে চলবার

মৃন্ময়ী নামে যে তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল, তাহা যেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া গিয়াছেন। পিতৃহৃদয় ধীরে ধীরে দ্রব হইয়া আসিতেছিল; অভাগিনী মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হরেনবাবুর চোখ দুটি মুহূর্তের তরেও সজল হইয়া উঠিত, তখনই পাছে কল্যাণী দেখিতে পান এই ভয়ে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অসীম সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী যে, সে স্বেচ্ছায় দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া কোথায় চলিয়া গেল কে জানে। কোথায় কোন্ জঙ্গলে সমাকীর্ণ পল্লীগ্রামের পর্ণকুটীর—সে তাহার অসীম রূপের আলোয় উজল করিয়া আছে তাই বা কে জানে? সেই পর্ণকুটীরে সে বাস করে, নিজের হাতে রন্ধন করে, বাসন মাজে, ঘর নিকায়, গোয়াল পরিষ্কার করে, সেই তাঁহার একমাত্র আদরিণী কন্যা—যে কখনও নত হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে জানিত না, সংসারের কাজ কাহাকে বলে তাহা জানিত না।

বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালার দহন ধরিত—অভাব ছিল কিসের? অভাব ছিল শান্তির। বেচারা মেয়েটীকে কি নির্য্যাতনই না সহিতে হইতেছিল, তাহা—সে কথা ভাবিতেও যে হৃদয় শতধা হইয়া যায়। তাঁহারা সুখ বলিয়া তাহাকে যাহা দিতে গিয়াছিলেন, কে তাহাকে সুখ বলে? অন্ধ যে সেও হাত বুলাইয়া পদার্থের পরিমাণ জানিয়া লয়, মনের মধ্যে তুলনা করিয়া বিচার করিয়া লয়, সে চক্ষুষ্মান—সে শিক্ষিতা—নিজের সুখ দুঃখ সে তুলনা করিয়া লইতে পারিবে না? সে সুখ নয়, সেই নারীর চরম দুঃখ, নারীত্বের অপমান লাঞ্ছনা, সে সম্মান নয়। সে নিজে নারী হইয়া নারীর সম্মান রাখিয়াছে, নারীত্ব তাহার অটুট রাখিতে সতী মেয়ে সে—দুঃখকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। লোকে ইহাকে দুঃখ ভাবিলেও এ তাহার দুঃখ নয়, ঐ তাহার পরম সুখ, পরম শান্তি।

নিজের মনে আজ সত্যকে চিনিয়াও হরেনবাবু স্ত্রীকে একটা কথা বলিতে পারিলেন না। কল্যাণী সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার, হিমালয়ের মত অচল অটল। মৃন্ময়ীর কথা একটা দিন কেহ তাঁহার মুখে শুনিতে পায় নাই, অপরিচিত কেহ জানিতে পারিত না তাঁহার সন্তান ছিল কিনা। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, তাঁহার বিকৃত মুখে উত্তর পাইত, সন্তান হয় নাই।

হরেনবাবু মনে মনে ভারি ক্ষুব্ধ—ভারি সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার সারা হৃদয়খানা জুড়িয়াছিল মৃন্ময়ীর সেই ঢলঢলে পদ্মের মত মুখখানি। মনে পড়িতেছিল ছোটবেলায় সে তাঁহার গলা কোমল দুটি ছোট হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিত, জ্ঞান হইয়া সে আর কাছে আসে নাই, পিতামাতার রূঢ় অবৈধ আচরণই তাহাকে তফাৎ করিয়া দিয়াছিল। হায় রে হায়, যক্ষের মত ধনই সামলাইতেছেন, কেবল সারা জীবন ধরিয়া সঞ্চয়ই করিয়া যাইতেছেন, এ সব তাঁহার অবর্ত্তমানে ভোগ করিবে কে? বাহিরের চক্ষু অন্ধ হইলেও অন্তরের চক্ষু তো দীপ্তিহীন হয় নাই, সে চক্ষে তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে, আর বেশী দিন পৃথিবীর মানুষ হইয়া পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইবে না। মাথার কালো চুলের উপর কাল সাদার প্রলেপ দিয়াছে, অসমসাহসিকের মনেও সে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে; পাপ পুণ্য নামে দুইটী যে স্বতন্ত্র জিনিস আছে, তাহা ধারণা করিবার শক্তি তাঁহার আসিয়াছে। এতদিন দৃষ্টি ছিল পাওয়ার দিকে, দুর্দ্দমনীয় পাওয়ার তৃষ্ণাকে কিছুতেই তিনি নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাই ছলে বলে কৌশলে প্রভুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, স্বপনকে গৃহহীন করিয়াছেন। পাওয়ার তৃষ্ণা মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। বার্দ্ধক্য

এতদিন আসিয়াও তাঁহাকে পাইতে পারে নাই, কারণ তাঁহার মনের বল খুব বেশী রকম ছিল, মনের বলে তিনি জরা বার্দ্ধক্যকেও ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আজ জরা বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে, তিনি সম্মুখের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পিছনে বাহিয়া আশা পথের পানে চাহিয়া দেখিতেছেন, সেখানে কি রাখিয়া আসিয়াছেন। হৃদয় তাঁহার শিহরিয়া উঠিতেছিল, কি করিয়া আসিয়াছেন—নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিয়াছেন যে। অতীতে এমন কিছু কাজ করেন নাই, যাহা আজ তাঁহার তপ্ত জ্বালাময় চিত্তে এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে। এ সব করিলেন কাহার জন্য, এইরূপে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া এ বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিলেন কাহার জন্য ?

কাল সমস্ত রাত্রি তিনি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট করিয়াছেন। প্রভাত হইতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। কল্যাণী তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিয়াছিলেন, স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কোন কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

সেদিনকার সংবাদপত্রখানা কল্যাণীর সম্মুখে পড়িয়াছিল, সেখানা তিনি পড়িতেছিলেন। বেহারা যে পত্রগুলা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল, সে গুলার দিকে তিনি একবার তাকাইলেন মাত্র, তাড়াতাড়ি পত্র দেখার ঔৎসুক্য তাঁহার জাগে নাই। হাতের কাগজখানা পড়িয়া শেষ করার দিকেই তাঁহার মনটা বেশী রকম ঝুঁকিয়াছিল।

হঠাৎ একটা স্থলে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তিনি মনোযোগের সহিত সেটা পড়িতে লাগিলেন। মুখখানা তাঁহার বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে হাত হইতে কাগজখানা পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

এ কি সংবাদ ইহাও কি সত্য হইতে পারে? প্রভাতের সহিত হিন্দুমতে স্বপনের বিবাহ হইবে, ত্যাগী সন্ন্যাসী পূজনীয় সচ্চিদানন্দ স্বামী স্বয়ং এ বিবাহে পৌরোহিত্য করিবেন, এই বিবাহে নারায়ণ সাক্ষ্য থাকিবেন। সহরের গণ্য মান্য হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃশ্চান—সকল জাতির প্রধানগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা সানন্দে এ বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

এ কি সত্য কথা—না কল্যাণী আর কাহার নাম পড়িতে প্রভাতের নাম পড়িয়াছেন? প্রভাত—খৃশ্চান, বিলাত-ফেরৎ সিভিলিয়ান, চিরনাস্তিক প্রভাত—সে হিন্দুমতে নারায়ণকে সাক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুকন্যা স্বপনকে বিবাহ করিবে, সে বিবাহের পুরোহিত হইবেন বিখ্যাত সচ্চিদানন্দ স্বামী, এ কি সত্য না মিথ্যা সংবাদ?

কল্যাণী সংবাদপত্রখানা আবার তুলিয়া লইলেন, আবার সেই স্থানটা পড়িলেন। না, এতো অন্য লোক নয়, এইতো প্রভাত, এইতো তাহার পরিচয় রহিয়াছে। এইতো স্বপনের নাম—ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত জমিদার জানকীনাথের একমাত্র কন্যা—" কল্যাণী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন।

গেল—সব দিকই গেল। কোন দিকে এতটুকু আশ্রয় পাইবার স্থান রাখিলে না প্রভু, একে একে সব দিকই কি ভাঙ্গিয়া দিতে হয় গো, মুখখানা কি এমনিই করিয়া মসী-কলঙ্কিত করিয়া দিতে হয়? কল্যাণী কি অপরাধে অপরাধিনী নাথ, যাহার জন্য একে একে সকলই তাঁহাকে হারাইতে হইল? সহোদর ভাই—যাহার গুণের সীমা নাই, বিদ্যার সীমা নাই, সৌন্দর্য্য যাহার অতুল, চরিত্রে যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মে যে অটুট, তাহাকে এমনই করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে কাড়িয়া লইলেন? একমাত্র কন্যা—

বড় আদরের মিনু, যে হাঁটিয়া গেলে মায়ের বুকে ব্যথা বাজিত বুঝি তাহার পায়ে ব্যথা লাগিতেছে, যাহার একদিন একটু মাথা ধরিলে মায়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, সেই মিনুকেও না এমনই করিয়া মায়ের বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া কাড়িয়া লইয়াছ প্রভু! বুক পিঠ দুইই এমন নিষ্ঠুর হাতে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলে গো, কল্যাণী কি লইয়া—কাহার মুখ চাহিয়া আর এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবেন? একে একে বড় ভালবাসার, বড় স্নেহের পাত্রগুলি সবই পর হইয়া গেল, কেহ আপনার রহিল না।

চোখ ছাপাইয়া দর দর ধারে অশ্রুধারা ছুটিল। একদিন তাঁহার সব ছিল, আজ তাঁহার কেহ নাই এই কথা ভাবিয়া—এই বড় ব্যথার আঘাত পাইয়া কল্যাণী তাঁহার জীবনে এই প্রথম মুক্তকণ্ঠে যথার্থ কাঁদিতে লাগিলেন। আজ এক ধাক্কা পাইয়া তাঁহার আর একটা গোপনতার আবরণ খসিয়া পড়িয়া গেল। আজ কয়েক মাস প্রাণান্ত চেষ্টায় উচ্ছ্বসিত নদীর কূলে কূলে যে বাঁধ বাঁধিয়া চলিয়াছিলেন, সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আজ তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

"মা গো, মিনু মা আমার—"

কল্যাণী চোখের জলে ভাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোকে যে সুখী করব ভেবে গেলুম মা, অপত্য-স্নেহে অন্ধ হয়ে ভাবিনি তো এতে তোকে এত দুঃখ দেওয়া হবে। জানি নে মা, এমনি করে তোর দুর্ভাগিনী মাকে ফেলে তুই সত্যিই চলে যেতে পারবি। সতীর সতীত্ব মনে প্রাণে অনুভব করেও তার মর্য্যাদা রাখতে পারিনি মা, নিজে অটুট থেকে তোকে নষ্ট করতে গিয়েছিলুম মা আমার, তাই তুই এমন করে জন্মের মত চলে গেলি, আর মায়ের কাছে এলি নে, আর তাকে মা বলে ডাকলি নে।"

আজ অন্তরের মা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে-ছিল, কল্যাণীর ক্ষমতা কি তাহাকে শান্ত করেন।

"মেম সাব—"

চকিতে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। হিন্দুস্থানী দাসী জানাইয়া গেল, হরেনবাবু আসিয়াছেন। কল্যাণী তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিলেন।

"কল্যাণি, শুনেছ কি কাণ্ড বেধেছে, কি গোলমাল হচ্ছে? তোমার ভাই প্রভাত—"

বলিতে বলিতে হরেনবাবু স্খলিত পদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কল্যাণীর পার্শ্বে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। কল্যাণী চোখ দুইটী তুলিয়া নির্ব্বাকে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া তেমনই বসিয়া রহিলেন।

হরেনবাবু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "চুপ করে তাকিয়ে রইলে যে? তোমার ভাই প্রভাত কি করেছে তা শুনেছ?"

কল্যাণী শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "শুনেছি।"

তাঁহার স্থির ভাব দেখিয়া হরেনবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; মাথা চুলকাইয়া একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "শুনেছ? শুনেও তবু চুপ করে আছ? এখনও চেষ্টা করলে—"

কল্যাণী বলিলেন, "বাধা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে প্রবৃত্তি আমার আর নেই।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে অন্তরের ক্ষুব্ধতা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "হয় তো চেষ্টা করতুম যদি এক বছর আগে এ কথাটা কানে আসত। প্রভাতকে আমি এমন

করে আত্মমান বিক্রয় করতে দিতুম না, স্বামীজীকে সব রকমে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সুযোগ দিতুম না, এখন আর না, আমার আর বল নেই—সাহস নেই, আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই, মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে গেছে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিলেন, সে হাসি যে কত কষ্টের—কি বেদনায় মাখা, তাহা হরেনবাবু জানিতেন, তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না।

কল্যাণী বলিলেন, "এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রভাত ভালই করেছে। আমরা যে রাজকন্যাকে পথের ভিখারিণী করে পথে ছেড়ে দিয়ে এসেছি, সে তাকে তুলে নিয়ে আবার রাজশ্রীতে মণ্ডিত করে তুলছে, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত সে করছে। আজ আমার মনে পড়ছে তার কথা, সে একদিন বলেছিল—দিদি, বাপ মায়ে যদি কারও কাছে অপরাধ করে থাকেন—সেটা তাঁরা যদি না জানতে চান, না মানতে চান, সন্তান যদি জেনে থাকে, তবে কখনও না কখনও বাপ মায়ের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তার করা উচিত, কারণ সে পাপটা তারও অংশে থাকতে পারে। প্রভাতের এ কথার তাৎপর্য্য আমি আজ যেমন বুঝতে পারছি, আগে তেমন বুঝিনি।"

কুণ্ঠিত ভাবে হরেনবাবু বলিলেন, "কি বুঝতে পেরেছ কল্যাণী?"

কল্যাণী বলিলেন, "সে আমায় শুধু তার দিদি বলে জানত না, মায়ের ছায়া সে আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল, তাই আমার জানিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করতে যাচ্ছে। আমি তাকে এই প্রায়শ্চিত্ত করার সুখ হতে বঞ্চিত করব না, এ আনন্দ তাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে দেব। একনিষ্ঠ খৃষ্টান হয়েও সে হিন্দুমতে হিন্দুকন্যাকে বিয়ে করছে, মনে কর কতখানি আত্মত্যাগ করতে হয়েছে তাকে।"

হরেনবাবু মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিলেন, আজ এ কথার একটা উত্তর দেওয়ার সাহস তাঁহার হৃদয়ে ছিল না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হরেনবাবু বলিলেন, "ইংরাজী বাংলা সব সংবাদপত্রে বিশ্ববিখ্যাত কর্ম্মী সন্ন্যাসী সচ্চিদানন্দ স্বামীর নাম পড়েছ, তিনি কে তা চিনতে পেরেছ কল্যাণী ?"

কল্যাণী চাপা সুরে উত্তর দিলেন, "চিনেছি, তিনিই ভবানীপ্রসাদ।"

হরেনবাবু বলিলেন, "আমরা আগে তাঁকে নিতান্ত তুচ্ছ বলেই জ্ঞান করে এসেছি, তা মনে পড়ে কি কল্যাণী ? তাঁর আশ্চর্য্য শক্তির কথা যা পড়েছি তা যথার্থ, সেই জন্যেই সাহস করে তাঁর সামনে আমি কোন দিন একটা কথা বলতে পারিনি।"

কল্যাণী শ্লেষের সুরে বলিলেন, "থাক, গৌরবত্ব আর ব্যক্ত করো না, যথেষ্ট হয়েছে।"

আহত হইয়া হরেনবাবু চুপ করিয়া গেলেন।

একটু পরে বলিলেন, "হিন্দুমতে হিন্দুকে বিয়ে কয়ার জন্যে প্রভাত তোমার কাছ হতে ক্ষমা পেতে পারবে কি কল্যাণী ?"

কল্যাণী মলিন মুখে মাথা নাড়িলেন।

হরেনবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, "আমাদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করছে, তবে ক্ষমা পাবে না কেন ?"

কল্যাণী বলিলেন, "সে দিক আমি দেখছি নে, যথার্থ ন্যায়ের পক্ষে এখানে আমায় দাঁড়াতে হবে, স্নেহে গলে পড়বার হলে অনেক দিন আগেই গলে যেতুম। ভগবানকে ধন্যবাদ দেই, সে রকম কোমল মন তিনি আমায় দেন নি, আমায় কঠোর মন দিয়ে তিনি জগতে পাঠিয়েছেন।"

তাঁর কণ্ঠস্বরটা শেষের দিকে কাঁপিতেছিল।

একটু নীরব থাকিয়া আর্দ্রস্বরে হরেনবাবু বলিলেন, "সে কি উচিত হয়েছে কল্যাণী, নারীর মন এত কঠোর হলে কি চলে ?"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিলেন, "কিসে উচিত হয়নি ?"

হরেনবাবু বলিলেন, "তার 'পরে যদি অত্যাচার না হতো, মিনু কি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারত ? মিনু কোনদিন অস্বীকার করেনি সে খৃষ্টান নয়, কোনদিন খৃষ্টানসমাজের নিয়ম বহির্ভূত একটা কাজ করেনি, বরং হিন্দুর সঙ্গে যে তার বিয়ে হয়েছিল সেই কথা ভেবে পাছে আমরা তাকে দূর বলে ভাবি, তাই আমাদের চেয়ে বেশী তৎপরতার সঙ্গে সে নিয়ম পালন করে যেত। সে তার নারীত্বে হস্তক্ষেপ সইতে পারেনি, তার অন্তরে সতী-মা গর্জ্জে উঠ্ল,তাই সে স্নেহের বাপ মাকে—অতুল ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করে ধিক্কার দিয়ে চলে গেল, তার স্বামী হিন্দু, তাই সেও হিন্দু, তার স্বামী যদি বিধর্ম্মী হতো, সেও তাই হতো, তাতেও আমি মরমে মরে যেতুম না কল্যাণী—আরও গর্ব্ব অনুভব করতুম, কেননা আমি সতী মেয়ের বাপ, আমি অসতী মেয়ের বাপ নই। এ গৌরব শুধু তার নয়, এ গৌরব শুধু আমার নয়, এ গর্ব্ব তোমারও তো কল্যাণী। তুমি তার গুণটাকে দোষ বলে জেনে নিয়েছ,ফেনিয়ে ফেনিয়ে দোষ বলেই তাকে অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছ, চোখের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত করে তার দিকে চাও কল্যাণী, সে দোষ গুণ হয়ে গেছে দেখতে পাবে, অন্তরে তোমার গরল অমৃত হয়ে উঠবে। আমরা যে তার শত্রুর কাজ করেছি কল্যাণী, মনে করে দেখ, হাতে করে তোমার সন্তানকে মা হয়ে তুমি যা খাওয়াতে গিয়াছিলে সে কি বিষ নয় ? কল্যাণি—কল্যাণি, একবার স্নেহের চোখে তার পানে চাও, তার নাম মুখে আনো। সন্তানের প্রতি মায়ের এ উপেক্ষা আমার বুক যে শতধা করে দিচ্ছে কল্যাণী, আমার যে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

কল্যাণীর দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি মুখখানা অন্যদিকে ফিরাইয়া জোর করিয়া দন্তে অধর চাপিয়া ছিলেন যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বাস না বাহির হইয়া পড়ে।

রুদ্ধকণ্ঠে হরেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "তারপর প্রভাতের সঙ্গে স্বপনের বিয়ে। হ্যাঁ, তোমার আগেই এতে আমি আন্তরিক অনুমোদন করেছি কল্যাণী, আমার আশীর্ব্বাদ-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে তবে তোমার কাছে এসেছি। আমি আজ খৃষ্টান, কিন্তু একদিন আমিও হিন্দু ছিলুম কল্যাণী, সে কথা আমি ভুলিনি, হিন্দুধর্ম্ম আমার মাথায় এখনও রয়েছে। হিন্দু যে—সে ব্রাহ্ম হতে পারবে, মুসলমান হতে পারবে, খৃষ্টান হতে পারবে, ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টানই বা কেন হিন্দু হতে পারবে না বল? হিন্দু আর খৃষ্টান্ এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে এমন পার্থক্য—আমি কোনদিনই দেখতে পাইনি কল্যাণী, যাতে পরস্পর পরস্পরকে রেষারেষি করে চলবে, কখনও এক হয়ে মিলতে পারবে না। একদিন ছিল যখন হিন্দুরা খৃষ্টান্ধর্ম্মকে একটা নূতন কিছু মনে করে স্বতন্ত্র হয়ে থাকত, যেন এদের সঙ্গে তাঁদের কোনও সংস্রব না থাকে, আজ তো সে দিন নেই কল্যাণী। আজ এই ধর্ম্মকে পাশাপাশি রেখে আমি বিচার করে দেখছি। এতদিন হিন্দুধর্ম্মকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি, কেননা আমি অন্তর দিয়ে এর পরিচয় লাভ করতে পারিনি। হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে নিজেকে ঘৃণিত বলে মনে করতুম, বেরিয়ে এলেও সে ঘৃণা কমেনি বরং বেড়েছিল। আজ অনেক দেখে শুনে একে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে আমার মন চায় না, বেশ করে দেখলুম এর মধ্যে অনেক বস্তু আছে। কথাটা হচ্ছে—পাওয়া আর না পাওয়া। স্বপন চোখ বুজিয়েই ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারেনি বল্লে অনেক কথা বলেছি, কিন্তু সত্য

কথা বল কল্যাণ—চোখ' বুজিয়েই কি সত্য সুন্দর মূর্ত্তিকে ধারণা করতে পারা যায়? স্বামীজি স্বপনকে উপদেশ দিয়েছেন, আগে হৃদয়কে উপযুক্ত করে ধাপে ধাপে উঠবার চেষ্টা কর, খপ করে লাফিয়ে উপরে উঠতে পারা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের পূজার্চ্চনাগুলি হচ্ছে—ঈশ্বর-পূজার সিঁড়ি, হিন্দুরা এই কথা বলে থাকে। স্বপন ধাপে ধাপে উঠেছে, পূজা করতে করতে এগিয়েছে, এখন সে একজন যথার্থ ব্রাহ্ম যে স্থানে গিয়ে পৌছান সেইখানে পৌছেচে। এখন সে দেখছে না, কোন্ পথে সে এসেছে, কি কি উপচার তার আসার পথে লেগেছে—সে এখন যথার্থ ব্রাহ্ম হয়েছে, ব্রহ্মকে চিনেছে। সাকারের মধ্যে দিয়ে ধারণা করে এখন সে সেই অসীম অরূপ অথচ রূপের সাগরকেই সামনে পেয়েছে, এখন তাকে হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টান সব বলতে পারা যায়, আর সেও তা মেনে নেবে। অসীমকে পেয়ে কোন ত্যাগই তাকে যেমন কষ্ট দিতে পারেনি, এই পাওয়ার তৃপ্তিও তাকে তেমন আনন্দ দিতে পারেনি, এখনও সে তেমনি চির অনাসক্ত, চির নির্ব্বিকার রয়েছে। আমরা দেখছি হিন্দুধর্ম্মের বাইরের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক, তার কুসংস্কার প্রথা, এর ভেতরে যে যথার্থই সত্য জেগে আছে তা তো আমরা কোন দিনই দেখিনি কল্যাণী। প্রভাত স্বপনকে দেখেছে, সে তাকে চিনেছে, তাই সে হিন্দুমতে না-হিন্দু না-ব্রাহ্ম স্বপনকে বিয়ে করছে। স্বামীজি নিজে তাদের বিয়ের পুরোহিত হবেন, তাঁর মুখের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে বিয়ের সভা পবিত্র হয়ে যাবে। অন্যায় বলবে? না কল্যাণ, এ অন্যায় নয়; এ সত্য—এ যথার্থ। প্রভাত ধন্য হয়েছে, প্রভাত স্বামীজির কাছে দীক্ষা পেয়েছে।

কল্যাণী আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া চোখের জল

চাপিবার জন্যই অন্যত্র চলিয়া গেলেন। হরেনবাবু বুঝিলেন, কল্যাণী উচ্ছ্বসিত অশ্রু তাঁহার সম্মুখে গোপন করিবার জন্যই সরিয়া গেলেন।

মিনিট পনের পরে কল্যাণী আবার যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখ বেশ প্রশান্ত, হাসিমাখা।

হরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েতে যাবে না কল্যাণী ?"

কল্যাণী উত্তর দিলেন, "না।"

হরেনবাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

কল্যাণী বলিলেন, "আমি খৃষ্টান, অন্য হিন্দুর বিবাহস্থলে আমি বন্ধু-ভাবে উপস্থিত থাকতে পারি, এখানে উপস্থিত থাকলে লোকে—আমাদের সমাজের সকলে বলবে, আমিই উদ্যোগী হয়ে আমার ভাইয়ের হিন্দুমতে বিয়ে দিচ্ছি, সব রকমে নীচু হয়েছি—এ বিষয়ে আর আমায় নীচু কর না, আর আমার মুখ হাসিয়ো না। এর পর আমার ভাই আমারই থাকবে, আমার ভাইবউ আমারই থাকবে, বিয়ের সময়টা আমি উপস্থিত থাকতে পারব না, সমাজকে এমনভাবে হাসতে দেব না। আমার দিকে চাও, আমায় রক্ষা কর, তুমি যেয়ো না। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর তুমি আমি দুজনেই যাব তাদের আশীর্ব্বাদ করতে, আমাদের আশীর্ব্বাদ না পেলে তারা কেউ সুখী হবে না। আর—আমার আরও কর্ত্তব্য আছে, নিজের ভুল যখন সুধরাতে বসেছি সব ভুলই সুধরাতে হবে। মিনুকে—আমার অভাগিনী মেয়েকে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, অশ্রুজল আর গোপন রহিল না, স্বামীর সমক্ষেই প্রকাশ হইয়া গেল। সে অশ্রুজল তিনি মুছিলেন না, আজ ব্যক্ততার আনন্দ এই রোদনের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল।

হরেনবাবু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাকে আনতে গেলে সে যদি না আসে কল্যাণ ?"

চোখ মুছিতে মুছিতে কল্যাণী বলিলেন, "আসবে—আমি গেলে সে নিশ্চয় আসবে। বল, অনুমতি দাও—আমি তাকে দেখতে যাব কি ? বাপ মায়ের সে অপরাধ সে ক্ষমা করবে, কোন সন্তানই বাপ মায়ের অপরাধ মনে করে রাখতে পারে না, আমি গেলে সে আসবে, বল, তোমার আদেশের অপেক্ষা—"

আর্দ্রকণ্ঠে হরেনবাবু বলিলেন, "যেয়ো কল্যাণী, কাল এখান হতে তুমি চলে যেয়ো, আমি অনুমতি দিচ্ছি।"

কল্যাণী বলিলেন, "আর একটা ভীষণ অপরাধ করেছি, বাপের কোল হতে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে তাঁর বুকে বড় বেদনা দিয়েছি, সে অপরাধের মার্জ্জনা চাইবার অনুমতি দেবে কি ?"

হরেনবাবু বুঝিলেন, কাহার কথা হইতেছে, তাঁহার হৃদয় মথিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল—"অনুমতি দিলুম কল্যাণী।"

"তবে স্বামী আমার, যাত্রার অয়োজন কর, কাল তোমায় নিয়ে আগে আমি কাশী যাব, বাবার হাতে তোমায় দেব, তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। অবশ্যই তিনি আমায় ক্ষমা করবেন। মহাপুরুষ তিনি, আমার মত হীন নারীর 'পরে রাগ করে থাকতে পারবেন না।"

হরেনবাবুর দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

স্বামীগৃহে অসীম কষ্টের মধ্যেও মৃন্ময়ীর দিন সুখেই কাটিতেছিল। শ্বাশুড়ীর স্নেহযত্ন তাহাকে কোন দিনই মায়ের অভাব জানিতে দেয় নাই। কল্যাণীর কাছে আদরের নামে অত্যাচারই লাভ করিয়াছে কল্যাণীর কাছে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ ছিল, মৃন্ময়ীর কাছে তাহা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঠেকিত। সেই বাঁধনের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত, এখানে কোন বাঁধনই ছিল না, মুক্ত স্বাধীন জীবনে সে আনন্দ লাভ করিতেছিল।

স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা সে লাভ করিয়াছিল, নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিত। স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেমই তাহাকে সাংসারিক কষ্ট অনুভব করিতে দেয় নাই।

ইহার উপর সে এখানে তাহার সঙ্গিনী কমলাকে পাইয়াছিল। কমলার মাতুলালয় এখানে ছিল, অভাগিনীর অন্য কোনও আশ্রয় না থাকায় সে মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছিল।

জ্যোতীশ যশোহরে কোন আফিসে মাসিক ত্রিশটাকা বেতনে কাজ করিত। এ দিকে জমি জমা হইতে যে ফসল পাওয়া যাইত, তাহাতে এই ক্ষুদ্র সংসারটী বেশ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত। মৃন্ময়ীর গৃহকর্ম্মে কমলা সাহায্য করিতে আসিত, মৃন্ময়ী তাহাকে করিতে দিত না।

প্রথমটায় তাহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত, কিন্তু দু' চার দিন পরে সে সবই সহিয়া গেল। যে মৃন্ময়ী হাঁটিয়া গেলে কল্যাণী বুকে ব্যথা পাইতেন, সেই মৃন্ময়ী এখন সামান্য গৃহস্থবধূ মাত্র, স্বামীগৃহে রন্ধন, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ অক্লেশে নিজে হাতে করিয়া যায়।

জ্যোতীশের মা বধূর কষ্ট অনুভব করিয়া দাসী রাখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মৃন্ময়ী তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় নাই। স্বামীর এই কষ্টার্জ্জিত সামান্য আয়, কোন রকমে তাহাদের চলিয়া যায়, ইহার উপর আর একটী পোষ্য বাড়াইতে সে নারাজ ছিল। প্রস্তাবটী উত্থাপিত হইলে সে অত্যন্ত মৃদুস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিল।

মা তাহার কথা শুনিয়া অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এত কাজ কি পারবে মা? রাজার মেয়ে তুমি, দশটা ঝি চাকরে তোমার কাজ করেছে, গরীবের ঘরে নিজে এসে উঠেছ মা লক্ষ্মী, গরীবের ঘরে শাক ভাতে মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট হয়েছ, কিন্তু এত কাজ মা—"

তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলিল, "হ্যাঁ মা, আমি এ কাজ পারব। এই তো কয়টা দিন করেছি, প্রথম দু চার দিন কষ্ট হলেও এখন আর একটু কষ্ট হয় না। এ এত কি বেশী কাজ মা, তিনজনের মত রান্না, সামান্য কয়েকখানা বাসনমাজা, এ আর পারব না? আপনাদের সেবা তবে আমি কি করতে পারলুম যদি না কাজই করতে দিলেন? আপনার পায়ে পড়ি মা, এ কাজগুলো আমার হাত হতে নেবেন না, তা হলে আমায় সুখী করার নামে দুঃখীই করা হবে মাত্র।"

মা আর কথা কহিতে পারিলেন না, দুইহাতে বধূর সুন্দর মুখখানা টানিয়া আনিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার চোখের জলে বধূর মুখখানা ভাসিয়া গেল।

জ্যোতীশও প্রথমটা চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মিনুর জেদ দেখিয়া, চোখের জল দেখিয়া সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সে দিন শনিবার, জ্যোতীশ দশটার আগে আহার সমাপ্তে যশোহরে

চলিয়া গিয়াছে। মায়ের বধূর আহার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ী বাসনগুলা কুড়াইয়া লইতেছিল, ঘাটে বাসন মাজিতে যাইবে।

মা বলিলেন, "এখন থাক্ না মা, বেলা একটু পড়লে ঘাটে যেয়ো। এই বৈশাখের কাঠফাটা রোদে না হয় নাই গেলে বাসন মাজতে মা।"

মৃন্ময়ী বলিল, "বাসনগুলো শুকিয়ে উঠবে মা, ঝাঁ করে বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসছি। এই কয়খানা বাসন বই তো না।"

তাড়াতাড়ি সে বাসন লইয়া বাহির হইল। পথের ও পাশে পুষ্করিণী। বৈকালের দিকে ঘাটে গেলে অনেকের সহিত দেখা হইয়া যায়; তাহার পরিচয় সকলেই জানে, তাই তাহার মত মেয়ে যে বাসন মাজে—ঘরের সব কাজ স্বহস্তে করে, ইহা লইয়া তাহার সম্মুখেই মেয়েরা সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেন, অনেকে তাহার চাকুরে স্বামী ও তাঁহার মাতার কৃপণতার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সম্মুখেই নিন্দা করেন। এই সব কথা সে এড়াইতে চায় বলিয়াই এই দুপুরে রৌদ্রে ঘাটের সব কাজ সারিয়া লয়। যে স্বামীকে সে দেবতা বলিয়া জানে, যে শ্বাশুড়ীকে সে দেবী বলিয়া জানে, তাঁহাদের নিন্দা তাহাকে বড় বেদনা দিত।

পথ দিয়া একখানা গরুর গাড়ী প্রচুর ধূলা উড়াইয়া ধীর মন্থর গতিতে আসিতেছিল। মৃন্ময়ী মাথার কাপড়টা চোখ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া পথটুকু পার হইয়া গেল।

প্রখর রৌদ্রের তেজে সানের ঘাট তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে, পা দেওয়া যায় না। সে কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া মৃন্ময়ী জলে নামিয়া পড়িল। বাসনগুলা জলে ভিজাইয়া দিয়া সে মুখে চোখে সেই তপ্তজলই ছিটাইয়া দিয়া বাসন মাজিতে বসিল।

"মিনু—"

এ কার আহ্বান, এই দুপুরে রৌদ্রে তপ্তঘাটে কে তাহার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে ? মৃন্ময়ী চমকাইয়া মুখ তুলিল, তাকাইয়া দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার মা কল্যাণী।

এ কি স্বপ্ন না সত্য ? মৃন্ময়ী নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, সে বার বার চোখ মুছিল, বার বার চাহিল—হাঁ, এই তো তাহার মা, তাহার গর্ভধারিণী। এ তাহার সেই বিলাসিনী মা নয়—আজ তাহার মা মাতৃরূপেই দেখা দিয়াছেন।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই কল্যাণী তাহাকে দুইহাত জড়াইয়া ব্যগ্রভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, দর দর ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া কন্যার মাথার উপরে পড়িতে লাগিল। কল্যাণী মেয়ের বুকে মুখ লুকাইয়া আজ পরম শান্তিলাভ করিল, তাহার জমাট বাঁধা বুকের ব্যথা গলিয়া অশ্রু আকারে মায়ের বুকে পড়িতে লাগিল।

নিজের অঞ্চলে কন্যার মুখ মুছাইয়া দিয়া অতৃপ্ত চোখে তাহার পানে চাহিয়া কল্যাণী আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "মিনু, অনেক কষ্টে তোর খোঁজ পেয়ে এসেছি মা। হ্যাঁ মা, ভুল করে একটা কাজ করতে গিয়েছিলুম, তাইতেই কি এত বড় দণ্ডটা দিতে হয়, একটা খোঁজও কি আর দিতে নেই ? আমার বুকটা কি এমনি করেই আঘাত দিয়ে গুঁড়িয়ে ধূলো করে দিতে হয় মা পাষাণী ? ওরে পাষাণী, একবার কি ভাবলি নে আমি তোর মা, তোকে কত করে মানুষ করেছি, আমার বুকের রক্ত দুধ করে তোকে খাইয়েছি, একবার কি ভাবলি নে আমার বুক একেবারে শ্মশান করে দিয়ে এলি ? আমার স্নেহ তুই ছাড়া আর কেউ উপভোগ করতে নেই সে কথাটা ভাবতেও ভুলে গেছলি ?"

মৃন্ময়ীর রুদ্ধকণ্ঠে একটী মাত্র শব্দ ফুটিল, "মা—"

দুইহাতে সে মাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিল।

"ওঠ মা, মুখখানা তোল একবার। আজ কতদিন তোকে দেখতে পাইনি মা, মিথ্যে অভিমান নিয়ে বসেছিলুম তোকে মাপ করব না। কিন্তু মায়ের অভিমান কি থাকতে পারে রে? সন্তান বাপ মায়ের 'পরে রাগ করে থাকতে পারে, মায়ে তা পারে না। দু' দিন যেতে আমার রাগ রইল না, আমার অভিমান রইল না, মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠেছে রে—সন্তানকে তার চাই-ই। আমার দর্প—আমার গর্ব্ব ভগবান্ সব দূর করে দিয়েছেন, আমি আমার জীবনে যত ভুল করেছি সব সংশোধন করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। আজ আমি নিঃস্বা মা, তোর মায়ের আছিস তুই, আছেন স্বামী, আর কিছু নেই মা, আর কিছু চাই না। তোর কাছে বড় অপরাধ করেছিলুম মা, তার জন্যে—"

ব্যগ্রকণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিয়া উঠিল, "ও কথা বলো না মা, ও যে আমার মহাপাপ হবে। তুমি যে আমার মা, আমার ভাল ভেবেই তুমি আমার বিয়ে দিতে গিয়েছিলে, আমার অহিত করবার ইচ্ছে তো কখনই করনি মা। আমি ভয়ে তোমায় খবর দিতে পারিনি মা, ভেবেছিলুম তুমি বাবা কেউ আমায় ক্ষমা করনি। একদিন ক্ষমা করতেই হবে তা আমি জানতুম। মা, তোমার জন্যে আমি প্রত্যেক দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যেন তোমার সত্যজ্ঞান হয়, আমার বাবা যেন সৎ হতে পারেন। মা, সত্যজ্ঞান তোমার হয়েছে, তাই আমি তোমায় পেয়েছি, ভগবানের কাছে আমি শত সহস্রবার মাথা নোয়াচ্ছি। এই রোদে তোমার খালি পা ঝলসে গেল, মাথা পুড়ে গেল যে মা, চল, আমার বাসনমাজা হয়েছে—বাড়ী যাই।"

তাড়াতাড়ি সে বাসন কয়খানা ধুইয়া লইয়া মাকে লইয়া চলিল, একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমাদের কিন্তু মা খড়ের ঘর—"

রুদ্ধকণ্ঠে কল্যাণী বলিলেন, "তাই ভাল মা, তাই সতীর কাছে রাজ-প্রাসাদ। সতী যদি স্বামীর পাশে স্থান পায়, লোকালয়শূন্য বনও তার কাছে শ্রেয়ঃ মনে হয়।"

মৃন্ময়ীর শ্বাশুড়ী মহাসমাদরে বৈবাহিকাকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিবেন ভাবিয়া তিনি বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া কল্যাণী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমার জন্যে আপনাকে এতটুকু ব্যস্ত হতে হবে না দিদি। আমার মেয়ে যে জায়গা নিজে ইচ্ছে করে বেছে নিয়েছে, সে জায়গা আমার কাছেও স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। আমার একটী প্রার্থনা আছে আপনার কাছে দিদি।"

সম্ভ্রান্ত বৈবাহিকার বিনয়ে জ্যোতীশের মা কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন, "অমন করে কথা বলবেন না বেহান, প্রার্থনা না বলে আদেশ বলুন।"

কল্যাণী বলিলেন, "না দিদি, আমি মেয়ের মা, আমায় মাথা নীচু করে থাকতেই হবে, এতদূর সাহস আমার নেই যে আপনাকে আদেশ করতে যাব। আমার প্রার্থনা—আমি দিন কয়েকের জন্যে মিনুকে আর জ্যোতীশকে কাশী নিয়ে যেতে চাই। আমার শ্বশুরের—বড় ইচ্ছে একবার আমাদের সামনে এই দুটির মিলন দেখতে পান। তারপর দিদি—জ্যোতীশের কাজের আমি ঠিক করে দেব, আমার স্বামী যে কাজ করতেন জ্যোতীশ সেই কাজ করবে। আমার জামাই এত কষ্ট করে সামান্য চাকরী করবে সে আমার অসহ্য। আপনার অনুমতি যদি পাই—"

আনন্দে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন, কল্যাণীর হাত দুখানা দুইহাতের মধ্যে লইয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ

হৌক বেহান। জ্যোতীশ আপনার জামাই নয়—ছেলে, তার এই প্রত্যেকদিন যাওয়া আসা খাওয়ার কষ্ট দেখে আমায় বুক বেদনায় ছিঁড়ে পড়ে, আপনি তার ভার নিন, আমি তাকে আপনার হাতে দিলুম। আমার লক্ষীমায়ের কষ্ট আমি সইতে পারিনে। মা আমায় একখানা কাজে হাত দিতে দেবে না, একে একে আমার সকল কাজ কেড়ে নিয়ে আমায় জড় করে বসিয়ে রেখেছে। আমার মায়ের কষ্ট যাক, আমি ওদের দেখে সুখী হই।"

কল্যাণীর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না।

৩১

বিবাহে হরেন্দ্রনাথ আসিবেন বলিয়া পূর্ব্বে এক পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের দিন তাঁহারা কেহ আসিলেন না। এ বিবাহে সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোক আসিয়াছিল, স্বামী সচ্চিদানন্দ নিজে বিবাহের পুরোহিত হইয়া পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন।

প্রভাত জানিতেছিল, কল্যাণী ক্ষমা করিবেন না। তিনি গোঁড়া খৃষ্টান, খৃষ্টানধর্ম্ম ছাড়া আর সকল ধর্ম্মই তাঁহার মতে হেয়—ঘৃণ্যকর। ইহারই জন্য যে স্বপনকে একদিন তিনি ভালবাসিতেন, তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন, ইহারই জন্য প্রভাত তাঁহার বড় স্নেহের সহোদর ভাই হইয়াও স্নেহ হারাইয়া ফেলিল।

বিবাহ শেষে ভবানীপ্রসাদ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে হরেন্দ্রনাথ ও কল্যাণী কন্যা জামাতাসহ আসিয়া পৌছিলেন।

প্রভাতের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, সে সজল নয়নে হরেনবাবু

ও কল্যাণীকে প্রণাম করিল, মিনুকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় স্নেহচুম্বন দিল, জ্যোতীশকে বুকে লইয়া প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। আজ যথার্থই তাহার বড় আনন্দের দিন, সে মাতৃপিতৃসম দিদি ও দাদার প্রাণপূর্ণ আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে।

স্বপনকে বুকে টানিয়া লইয়া সজলনেত্রে কল্যাণী বলিলেন, "স্বপন, তোমাদের বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি বলে ক্ষুণ্ণ হয়ো না। অনেক ভেবে—যদিও মন আমার আসার জন্যে হাহাকার করছিল, তবুও আমি আসিনি। আমি সব হারিয়ে ফেলেছিলুম, ফাঁকা গোঁড়ামি নিয়ে ভুলেছিলুম, সে গোঁড়ামীর খোলস ফেলে দিয়ে দেখলুম আমার যা তা আমারই আছে কেউ দূরে যায় নি। আমি বড় আঘাত পেয়ে সচেতন হয়েছি, নিজের ভুল বুঝেছি, যার যা তাকে এখন তাই ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার শ্বশুরের বুক খালি করে ছেলে কেড়ে নিয়ে তাঁকে একেবারেই সন্ন্যাসী সাজিয়েছিলুম, তাঁর ছেলে বউ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি। মিনুর মা কেড়ে নিয়ে তাকে একেবারে শূন্য করে ফেলেছিলুম, তার মাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তোমার অতুল বৈভব কেড়ে নিয়ে তোমায় নিঃস্বা গৃহহীনা করেছিলুম, তোমার সব ফিরিয়ে দিতে এনেছি মা। আমি যার কাছে যে ভুল করেছি, সে আমায় সেই ভুল সুধরাবার পথ দিয়েছে, আমি আশা করছি তুমিও দেবে। এই নাও মা, এই কাগজখানা নাও, আজ হতে তোমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী তুমিই, আমরা মুক্ত।"

স্বপনের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কেন মা, আবার আমার ঘাড়ে কেন এ জোয়াল চাপাতে এলেন? আমি বেশ ছিলুম, সুখে আমার দিন কেটে যাচ্ছিল, আবার—"

কল্যাণী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, এ তোমায় নিতেই হবে। এ জোয়াল

ভগবানের দেওয়া, কারও ক্ষমতা নেই তাঁর দেওয়া দান অগ্রাহ্য করতে পারে। আমরা দুজন এখন কাশীতে বাবার কাছে যাব, তারপর ইচ্ছা করছি পুরীতে সমুদ্রের ধারে থেকে জীবন কাটিয়ে দেব। আমার যা তাও তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, সেই সম্পত্তি হতে আমায় মাসে একশ করে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো। আমার মিনু আর জ্যোতীশকে তোমায় দিচ্ছি, তোমার কাকা যে কাজ করতেন সেই কাজে জ্যোতীশকে লাগিয়ে রেখো এই আমার অনুরোধ। মিনুর সন্তান হলে আমার সম্পত্তি তাকে দিয়ো, ততদিন তুমি আর প্রভাত রক্ষণাবেক্ষণ করবে।"

"এ আপনার আদেশ কাকিমা, আমি পালন করব।"

কল্যাণী ও হরেন্দ্রনাথ কন্যা-জামাতাকে সেখানে রাখিয়া ভবানীপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া চলিয়া গেলেন।

ভবানীপ্রসাদ চিরবিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্বপনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, "মা, এতদিন এই দায়িত্ব মাথায় নিয়েছিলুম; যেখানেই থাকতুম অন্তরে আকর্ষণ অনুভব করতুম, তুমি আমায় ডাকছ। এবার আমার সকল কর্ম্ম ফুরানোর সঙ্গে সঙ্গে সকল দায়িত্বের অবসান হওয়ার সঙ্গে এ দায়িত্বেরও অবসান হয়ে গেল। তোমার সামনে আজ আমি দেবতা প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেলুম, একমনে সেবা কর, বাসনা মিটিয়ে পূজা কর, হিন্দুনারীর মর্য্যাদা রেখো
লেখাপড়া শিক্ষা করলেই হয় না মা, উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে হয়, সংযম
দরকার; সংযম মূলে যদি না থাকে, সে শিক্ষা মানুষকে উন্নত
পারে না, দিন দিন অবনতির পথে নিয়ে যায়। তোমার
ছিল, ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল তাই উন্নত হতে পেরেছ, যে বীজ রোপ
তাই এখন বড় গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত...কে দেশের

বিরোধী, মনে করেন এতে তারা ধর্ম্মনিষ্ঠা হারাবে, সংযম হারিয়ে ে
কিন্তু সব হারালে না কি মুখের কথা মা ? মেয়েদের মূলে যদি স
ধর্ম্মনিষ্ঠা রেখে—প্রাচ্য প্রতীচ্যে মিল করিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাতে মেয়েরা নিজস্ব বস্তু হারাবে না, কোমলতা স্বধর্ম্মানুরাগিতা সতীত্ব প্রভৃতি যা কিছু তাদের নিজের তা তাদেরই থাকবে। সেই স্ত্রীর স্বামীকে যোগ্য হতেই হবে, সে মায়ের ছেলেকে উন্নত হতেই হবে। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলবার সাহায্য করতে পারে না, সেই শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো মা, সেই শিক্ষাই স্বেচ্ছাচারিতা আনবে, সেই শিক্ষা আমাদের সত্য ধর্ম্মকে, আমাদের সমাজকে হয়তো ধূলার সাথে ধূলা করে মিশিয়ে দেবে। আজ যাওয়ার বেলায় আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি মা, বাংলার মেয়ে বাংলার মেয়েই থাক, বাংলার প্রচলিত ব্রতপূজার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাক, নিজের দেশের কিছুকে তারা ঘৃণা না করে নিজেদের জিনিস বলেই যেন আদর করে নেয়। আমি একটী মেয়েকে গঠন করে দিলুম, দেশের এই একটী মেয়ের আদর্শে লক্ষ মেয়ে গড়ে উঠুক, দেশের ছেলে তাদের গড়ে উঠতে সাহায্য করুক। সময়ে আবশ্যক হলে ভাই যেন প্রকাশ্যে বোনের সাহায্য পায়, স্বামী যেন পাশে তার স্ত্রীকে পায়। নারীর কার্য্যক্ষেত্র সংসারে গৃহস্থালীর মধ্যে ভবিষ্যৎ
আমি ন্তানের আদর্শ জননী হওয়ার জন্যে তাকে গঠন করা, তাকে যথার্থ
নাও, আজ হওয়ার মত শিক্ষা দেওয়া—এ নারীর নিজের কাজ। তা বলে
স্বপনের সব ভুলে সেই কাজেই থাকতে হবে, স্বামী নিজের দরকারের
আবার আমার পাশে পাবে না, তা তো হতে পারবে না মা। আদ্যাশক্তি
ছিলুম, সুখে আমা ক্ষ্মীরূপে সংসারের কাজ করেছেন, স্বামীসেবার এতটুকু
কল্যাণী বলিলেন, পাইনি, সন্তানকে উপযুক্ত আদর্শ মায়ের মত লালন